কবিতার বিচিত্র কথা

ও

রবীন্দ্র-সমকালীন বাংলা কবিতার ধারা

হরপ্রসাদ মিত্র

কথামালা প্রকাশনী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

এই লেখকের অন্যান্য বই

সাহিত্য-পরিক্রমা * বাংলা কাব্যে প্রাক্-রবীন্দ্র * সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি (১ম ও ২য়) * সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ * সাহিত্যের নানাকথা * সাহিত্য পাঠের ভূমিকা (যন্ত্রস্থ) * তিমিরা-ভিসার (কবিতা-সংগ্রহ) * মধ্য-রাতের সূর্য (ছোটোদের বড়ো গল্প)।

সম্পাদনা : কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের নতুন খাতা ও অন্যান্য কবিতা

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীহৈমন্তী সেন

মুদ্রাকর
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
৯৯/১এল্, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

বর্তমান সংস্করণের স্বত্বাধিকারী—
শ্রীবীরেশ্বর বসু
কথামালা প্রকাশনী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

আট টাকা

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক ইত্যাদি		অশুদ্ধ	সংশোধিত
৭	১ম অনুচ্ছেদের শেষ	ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ
১৬	৩য় পংক্তিতে	পদ্যের রীতিতেও	গদ্যের রীতিতেও
১৭	১২শ টীকার ৩য় পংক্তি	thc	the
৫৪	পদ্যাংশের ১ম পংক্তিতে	নিরাশিষ	নিরাশিস্
৬০	২৫শ টীকার ২য় পংক্তিতে	Connecton	Connection
৭৭	পদ্যাংশের পরে ৪র্থ পংক্তিতে	অর্থ স্বরূপ	অর্থস্বরূপ
৭৯	১ম পদ্যাংশের পরে ২য় পংক্তিতে	রূপ মায়া	রূপমায়া
৮২	২য় কবিতাংশে	ব্রম্ম	ব্রম্ম্
৮৫	৩য় পংক্তিতে	ব্রম্ম	ব্রম্ম্
৯৭	২১শ পংক্তিতে	যচ্ছে	যাচ্ছে
৯৮	২য় কবিতাংশে	চড়য়ের	চড়ুয়ের
১০২	৫ম টীকাতে	Hc	He
১১৩	৪র্থ পংক্তিতে	কবলায়িত	কবলিত
১১৭	১ম অনুচ্ছেদের শেষে টীকা-সংকেত ৪ পড়তে হবে।		
১১৭	৩য় অনু, ১০ম পংক্তিতে	প্রজাপতি	প্রজাপতিঃ
১১৯	গদ্যাংশের ৬ষ্ঠ পংক্তিতে	'পেলো'	'পোলো'
১২১	কবিতাংশের ২য় পংক্তিতে 'সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে কুল'—এবং ৩য় পংক্তিতে কেবল 'ঝিঙে ফুল' পড়তে [illegible]বে।		
১৪৬	২য় অনুচ্ছেদে	বিস্মত	বিস্মৃত
১৫৩	১২শ পংক্তিতে	পরিব্যপ্তি	পরিব্যাপ্তি
১৫৯	৮ম পংক্তিতে	বুদ্বদের	বুদ্বুদের
১৬৪	২য় অনু, ৭ম পংক্তিতে	উহ্য	উহ্য
১৯৪	২০শ পংক্তিতে	জাত যাব না	জাত যায় না
২০০	শেষ অনুচ্ছেদের ৩য় পংক্তিতে	১৮২৩	১৮৩৩
২১০	২য় অনুচ্ছেদের শেষদিকে	'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা,	'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা'
২১১	কবিতাংশে	মধূপে মধূপে	মধুপে মধুপে
২২০	১ম পংক্তিতে	চুকায়ে কবির সুখে	চুকায়ে করিব সুখে
২৩০	কবিতাংশে	বিহঙ্গিণী	বিহঙ্গিনী
২৩২	২য় অনু, ১১শ পংক্তিতে	এাগয়ে	এগিয়ে
২৩২	„ ১৩শ „	রাতি	রীতি
২৩৪	১ম পংক্তিতে	শুদ্ধ	শুষ্ক
২৩৪	শেষ পংক্তিতে	অমুর্বরতা	অনুর্বরতা,

পৃষ্ঠাঙ্ক ইত্যাদি		অশুদ্ধ	সংশোধিত
২৩৫	২১শ পংক্তিতে	মহিলা কবির	মহিলা-কবিদের
২৫৪	শেষ পংক্তিতে	যতান্দ্রনাথ	যতীন্দ্রনাথ
২৮০	৯ম পংক্তিতে	ক্লাসিক	ক্ল্যাসিক্যাল
২৮৩	১ম অস্থ, শেষ পংক্তিতে	স্পৃহ	স্পৃহা
৩১০	১ম অনুচ্ছেদের শেষ দিকে	কবিযশঃ-প্রার্থী	কবিযশঃপ্রার্থী
৩১২	৫ম পংক্তিতে	নাম মনে করে	নাম করে
৩১৫	১ম উদ্ধৃতির পরে গদ্যাংশের শেষ পংক্তিতে	'বাঁচা চাই',	'বাঁচা চাই'
৩১৭	শেষ অনুচ্ছেদের ৯ম পংক্তিতে	হয়েছ	হয়েছে
৩২৩	৯ম পংক্তিতে	বন্ধুকে বলেছ	বন্ধুকে বলেছে
৩২৩	শেষ অনুচ্ছেদের ২য় পংক্তিতে	স্পষ্ট হয়ে উঠছে	স্পষ্ট হয়ে উঠেছে
৩২৩	শেষ পংক্তিতে	সমুদ্র-দেখার	সমুদ্র দেখার
৩২৫	৪র্থ পংক্তিতে	মহারাত্রি'	'মহারাত্রি'
৩২৫	২য় অনুচ্ছেদের ৪র্থ পংক্তিতে	উচ্ছ্বাসে-ভরা	উচ্ছ্বাসে ভরা
৩২৬	শেষ „ ৫ম „	'অগ্নিবীণা',	'অগ্নিবীণা'
৩৩৩	১ম উদ্ধৃতির পরে অনুচ্ছেদের ১ম পংক্তিতে	বিশ্ব প্রকৃতির	বিশ্বপ্রকৃতির
৩৩৩	ঐ ১১শ পংক্তিতে	অনুবাদ কবিতা	অনুবাদ-কবিতা
৩৩৪	শেষ অনুচ্ছেদের ৯ম পংক্তিতে	তিনি,	তিনি
৩৩৯	১ম পংক্তিতে	দুইটি	দুটি
৩৩৯	শেষ অনুচ্ছেদের ২য় „	পণ্ডিত জনোচিত	পণ্ডিতজনোচিত

৩৪০ পৃষ্ঠার শেষাংশে মোহিতলালের মন্তব্যের ২য় বাক্যটিতে 'তেমনি' শব্দটি ভুল জায়গায় বসেছে ; সংশোধিত পাঠ :—'একদিকে তাহা যেমন একটা অতিশয় বিশিষ্ট, কবি-দৃষ্টির সহায়···তেমনই অতিরিক্ত মন্ময়তার···' ইত্যাদি।

৩৪১	শেষ উদ্ধৃতির ২য় পংক্তিতে	পঞ্চ শরের	পঞ্চশরের
৩৫১	শেষ পংক্তিতে	'নববর্ষের জল্পনা'	'নববর্ষের জল্পনা'-য়
৩৫২	১ম পদ্যাংশের পরে ৩য় পংক্তিতে	স্বত্বাধিকার কিন্তু	স্বত্বাধিকার নেই। কিন্তু···
৩৫৪	শেষ পংক্তিতে	কথায়,	কথায়
৩৫৫	শেষ পংক্তিতে	তোহা	তোলা

ভূমিকা

অশেষ সাহিত্যামোদী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ ঘোষালের তাগিদে এবং কবিপ্রাণ প্রকাশক শ্রীবীরেশ্বর বসুর আনুকূল্যে 'কবিতার বিচিত্র কথা' প্রকাশিত হলো। শ্রীসুরেন্দ্র প্রেসের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপার ব্যাপারে ব্যক্তিগত মনোযোগ দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রমাপদ চৌধুরী, তিনজনেই আমার সম্বন্ধে প্রীতিপরায়ণ। রবীন্দ্রযুগের বাংলা কবিতার ধারা সম্বন্ধে কিছু লেখবার অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা আমাকে বার-বার উৎসাহিত করেছেন। এ-বইয়ের সমস্ত ত্রুটির দায়িত্ব লেখকের; যদি কিছু গুণ থাকে, সে সবই আমার গুণগ্রাহী প্রশ্রয়দাতাদের প্রাপ্য। আমার পত্নী শ্রীমতী মণ্টুরানী মিত্রের অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতিরেকে বইখানির প্রকাশে বিলম্ব ঘট্‌তো। আমাদের উভয়েরই স্নেহভাজন শ্রীমতী হৈমন্তী সেনের আঁকা প্রচ্ছদের জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যে বাংলা কবিতার আগেকার আদর্শ বদলে গেছে। তাঁর সমকালীন কাব্যপ্রবাহের রুচি এবং আদর্শগত যাবতীয় বিচিত্রতা তাঁরই নামে চিহ্নিত হলেও তাঁর আশি-বছরের জীবনবিস্তারের মধ্যে অগণিত যেসব কবির কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে, তাঁদের সম্বন্ধে পৃথক একখানি বই দরকার; তাতে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে যতো কম বলা যায়, ততোই কাম্য। সেই প্রয়োজনের কথা মনে রেখে আমার সাধ্য অনুসারে তরঙ্গবহুল সেই প্রবাহটি দেখবার চেষ্টা করেছি। কবিতার বিচারে রসানুভূতির পথই আমার আদর্শ; তাই ছন্দের গণিত, প্রসঙ্গের ইতিহাস, বাক্যের ব্যাকরণ ইত্যাদি অবান্তর বিষয়ে আমার নজর থাকলেও অতি-সমীক্ষা এড়িয়ে গেছি। ১৯১০-এ বা তারও পরে যেসব কবি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে এখনো বিস্তারিত আলোচনার সময় আসেনি বলেই তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'চার জনের কথা খুবই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। একালের প্রবীণদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার, অন্নদাশঙ্কর এবং অজিত দত্ত আমার বিশেষ প্রিয় কবি হলেও এ গ্রন্থের লক্ষ্যের কথা মনে রেখে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়-দের আলোচনাতেই বেশি জায়গা দিতে হয়েছে। প্রধানত ১৯৪০-৪১ পর্যন্তই

আমার লক্ষ্যের পরিধি। আলোচনার সূত্রে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বেড়া ডিঙ্গিয়ে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এগিয়েছি। তেমনি অন্য প্রান্তে মধুসূদনকেও স্মরণ করেছি। রবীন্দ্র-যুগের কাব্যপ্রবাহের আদি-সীমানায় মধুসূদনের বৈভব,—অন্তে, 'পরিচয়', 'কবিতা', 'নিরুক্ত'-গোষ্ঠী একদিকে,—অন্যদিকে 'ভারতী' এবং 'মানসী ও মর্মবাণী'র ভূতপূর্ব খ্যাতিমানদের ক্ষীণ অনুরাগ! এ আলোচনার এই সীমা-স্বীকৃতির কথা বলে রাখা গেল। শেষ অধ্যায়ে কবিদের জন্মকাল অনুসারে না সাজিয়ে ধর্তব্য মর্জিগুলিরই সূত্র রক্ষা করে গেছি। বইয়ের শেষে শুদ্ধিপত্র দেওয়া হয়েছে, সেটি অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

আমার এ আলোচনা রবীন্দ্র-সমকালীন বাংলা কবিতার ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিকের সঞ্চয় আশা করলে পাঠক হতাশ হবেন। কুণ্ঠার সঙ্গে এই অতিরিক্ত কথাটুকুও জানিয়ে রাখা গেল। আলোচ্য কালপর্বের মধ্যে পশ্চিমের সাহিত্যে শিল্পপ্রকরণের যেসব আধুনিক আন্দোলন ঘটেছে, বাংলা কবিতায় তাদের প্রতিধ্বনি তীব্র নয়। আমাদের পরিবর্তন প্রধানত বিষয়গত। ১৯৩৫-এর কাছাকাছি সময় থেকে 'ইমেজিজ্‌ম' প্রভৃতি কাব্যাদর্শের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ইংরেজি সাহিত্যে সে আন্দোলন তখন গতপ্রায়। Hulme, Flint, Pound-এর প্রবর্তনায় ইংরেজি কাব্যে তার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯০৯ থেকে ১৯১২-১৩ সালের মধ্যে। এজরা পাউণ্ড, এমি লোয়েল প্রভৃতি চিত্রকল্পবাদী কবির আলোচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথই সেদিকে আমাদের অবহিত করে গেছেন। বাংলা কবিতায় আধুনিকতম প্রবীণ শক্তিমান যাঁরা, তাঁরা এখন বদ্‌লেয়ার, মালার্মে, ভালেরি প্রভৃতির অন্তর্মুখিতা ও আত্মচেতনতার ভক্ত,—সেই সঙ্গে টি-এস্‌ এলিয়টের ঐতিহ্যবিশ্বাসে এবং দার্শনিকতায় আস্থাবান। এঁদেরই পাশাপাশি আছেন অন্যকালের প্রবীণরা। এঁদের সকলের দিকেই নজর রাখতে হয়েছে।

পরিশেষে 'শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস'-এর বন্ধুবর শ্রীসরোজকুমার দাসকে তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

৫৩, বরদা দে স্ট্রীট,
শ্রীরামপুর

হ. মি.

শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ ও তদীয়পত্নী শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ,

করকমলেষু

বিষয়-সূচী

কবিতা, অকবিতা

বহুকালের অভ্যাস ছাড়তে মন কিন্তু-মিন্তু করে। সংসারের নানা কাজে, প্রতিদিনের নানান্ অনুষ্ঠানে অভ্যাসের ওপর নির্ভর আছে বলেই বেঁচে থাকার দায়িত্ব কিছুটা মসৃণ হয়েছে। সংসারে সাবালক মানুষের কাছে একথা অজানা নয়। সাহিত্য-চিন্তার ক্ষেত্রেও অভ্যাসের পথটাই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। শাস্ত্র-বচনের পিল্‌পে সাজিয়ে-সাজিয়ে কবিতার দেহতত্ত্ব ও প্রাণ-রহস্যের আলোচনা ক্রমশ প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। কবিতা কি রকম জিনিস? কাকে কবিতা বলা চলবে?—এ ধরনের ভাবনা উঁকি দিলেই মন যেন তার বিশেষ প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার [reflex action] গুণে, কতকটা নির্ভাবনার পথ ধরে, অবলীলাক্রমে জবাব দিয়ে থাকে—রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। তারপর, না-হয় প্রশ্ন শুধোনো গেল—রস কাকে বলে? তারও পাল্টা জবাব আছে—যা আস্বাদিত হয় তারই নাম রস। এই অভ্যাসের পথ ধরেই কবিতার রূপ-রীতির আলোচনায় নামা গেল। তারপর, চল্‌তে চল্‌তে তত্ত্ববুদ্ধির পালে লাগুক আস্বাদনের হাওয়া! ভ্রমণটি যেন নিরানন্দ পর্যটন না হয়,—এই তো ভ্রাম্যমানের একান্ত মনোবাঞ্ছা!

সাহিত্যের পথে, মনের এই আস্বাদন-ক্ষমতাটাই বড়ো কথা। অনুভূতিশীল মানুষের মন ভাষার সাহায্যে নিরন্তর তার ভাবের কথা প্রকাশ করে চলেছে। জ্ঞানের কথা যথাযথ যত্ন নিয়ে একবার বল্‌লেই নির্দিষ্ট একটা বাহন পাওয়া যায়। কিন্তু ভাবের কথা

বার-বার বল্‌তে হয়। অর্থের নির্দিষ্ট সীমা অস্বীকার করাটাই তার চিরকালের স্বভাব। অর্থাৎ ভাব চায় ব্যঞ্জনা। আস্বাদন-দক্ষ কাব্য-রসিকের কাছে ব্যঞ্জনার তত্ত্ব সবিস্তার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ভাষার মধ্য দিয়ে বিশেষ ব্যক্তির মনোভাব যখন সমবেদনাময় অন্যান্য মনে সহজে ছড়িয়ে গিয়ে ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে, তখনই বুঝতে হবে ভাষার বিশেষ আস্বাদন-বাহকতার পরিচয় পাওয়া গেল। কবিতার মধ্যে আছে ভাষার এই বিশেষত্ব।

এই পূর্বকথা মেনে নিয়ে অতঃপর বিশেষভাবে কবিতার স্বরূপ এবং শ্রেণী বিভাগের আলোচনায় নামা যেতে পারে।

চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে আমাদের বর্তমান রবীন্দ্র-যুগ অবধি বাংলা কবিতার দীর্ঘ প্রবাহের দিকে দৃষ্টি রাখলে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, সে হলো বিষয়ের বৈচিত্র্য,—তার চাল-চলনের বিচিত্রতা এবং প্রকারগত বিভিন্নতা। গীতিকাব্য, মহাকাব্য,—নীতি-কবিতা, নিসর্গ-কবিতা,—প্রেমের কবিতা, দেশাত্মবোধের কবিতা ইত্যাদি কতো যে শাখা-উপশাখা আছে, তার আর অন্ত নেই। একটু নজর দিলেই আরো দেখা যায় যে এই অশেষ প্রকারভেদ অবলম্বন করে কবিতার যে মহাদেশটি ছড়িয়ে আছে, তাতে বন্ধুরতাও কম নেই। জনশ্রুতির জোরে 'কবিতা' নামে এমন অনেক কিছু দাঁড়িয়ে গেছে, যাকে কবিতা বলতে আপত্তি করাটাই সুস্থ মনের প্রত্যাশিত কর্তব্য। চাষের জমিতে ফসলের সঙ্গে-সঙ্গে যেমন আগাছা গজিয়ে ওঠে, প্রথার প্রশ্রয়ে কিংবা লোক-বিভ্রান্তির ফলে আমাদের কাব্য-মহাদেশে তেমনি দেখা দিয়েছে অভ্যাস-লালিত অ-কবিতার অরণ্য। তারা আমাদের কাব্য-বিচার-বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে তুল্‌ছে। কথাটা প্রমাণ করবার জন্যেই কিঞ্চিৎ নমুনা পরিবেবণ করা চাই। পুরোনো আমলের প্রসিদ্ধ কাব্য থেকে এইরকম অ-কবিতার একটু নমুনা দেওয়া গেল—

শুনহ সকল বীর অপূর্ব কথন।
যেমতে ঘটিল এই কবিতা রচন॥

খাসপুর পরগণা নামে মনোহর।
বড়িষ্যা তাহার এক তপ বিশ্বাম্বর॥

তথায় গেলাম ভাদ্রমাসে সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলাঘরে॥

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন॥ [১]

কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল'-রচনার এই ইতিহাস আর যাই হোক, এ বৃত্তান্ত যে কাব্যরসে সমৃদ্ধ নয়, সেকথা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গুণগ্রাহী অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনও স্বীকার করেছেন। [২] নাথ-সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শূন্যপুরাণ ইত্যাদি মধ্যযুগের তথাকথিত নানান্ প্রসিদ্ধ রচনার মধ্যে এই ধরনের অ-কবিতার ছড়াছড়ি কার না চোখে পড়েছে? মুকুন্দরাম, বিজয় গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ ইত্যাদি স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাঁদের কাব্য-রচনার মধ্যে এরকম বহু অংশ রেখে গেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনার মধ্যেও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আঠারোর শতকে ভক্ত রামপ্রসাদ সেনের মতো মানুষ তদানীন্তন প্রথা-র প্রভাবে পড়ে 'বিদ্যাসুন্দর' লিখেছিলেন। তাতে সুন্দর যেখানে বর্ধমানের বাজারে প্রবেশ করেছেন সেখানকার বর্ণনা এইরকম—

বণিজি দোকানি কত শত শত ঠাঁই।
মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই॥

বনাত মখমল পটু ভূষণাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা॥

মালদই নলাটি চিকণ সরবন্দ ।
আর আর কত কব আমীর পছন্দ ॥
বিলাতী বহুত চিজ বেস কিম্মতের ।
খরিদার নাহি পরে, পড়ে আছে ঢের ॥[৩]

বাজারের পণ্য সামগ্রীর তালিকা হিসেবে এ বর্ণনার দাম আছে বৈকি! তবু একেও অ-কবিতা বলতে দ্বিধা হবে না। অবশ্য 'বিদ্যাসুন্দর-ই' রামপ্রসাদের খ্যাতির কারণ নয়। সকলেই জানেন, তিনি আধ্যাত্মিক গান লিখেছিলেন। সেইসব লেখার মধ্যে ভক্তেরা ভক্তির প্রেরণা পেয়েছেন,—ভাবুক মানুষ তা থেকে ভাবের উৎসাহ পেয়েছেন। কিন্তু সংস্কারমুক্ত, আন্তরিক কাব্যানুরাগীর মনে সে সব রচনার কাব্যমূল্য যে সর্বত্র সমান নয়,—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অনেক কথাই যে কথা-চাতুর্য মাত্র, জনমতের বিরুদ্ধে হলেও সত্যের খাতিরে সেকথা মানতে কুণ্ঠা হবে কেন ?

এবার বাজী ভোর হোলো ।
মন কি খেলা খেলাবে বলো ॥
সতুরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল ।
এবার বোড়ের ঘরে ভর কোরে
মন্ত্রীটি বিপাকে মোলো ॥
দুটা অশ্ব, দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটালো ।[৪]

—এই বাজী ভোর হবার বৃত্তান্ত মানুষের মনের কোন্ অঞ্চলে কী রকম কিস্তিমাৎ করেছে, সে প্রসঙ্গের বিশদ বিশ্লেষণ সত্যিই অপ্রাসঙ্গিক। পাঁচ জনে বলে থাকেন বলেই আরো দশ জনে এসব উক্তিকে 'কবিতা' নামে অভিহিত করতে এগিয়ে যান। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, এর নাম কবিতা নয়। সাহস সঞ্চয় করে বলা যেতে পারে, এও অ-কবিতা! সাধারণ বিবেচনা-শক্তির ওপর নির্ভর

করেই বলা যায় যে, রামপ্রসাদের ঐ রচনাকে কবিতা বলে মেনে নিলে প্রাচীনতর চর্যাপদ থেকে আধুনিক ভাবানুবাদের যে নমুনাটুকু অতঃপর দেওয়া হচ্ছে, সেটিও কবিতার গৌরব দাবী করবে—

হালো ডোম্বি, পুছি আমি স্বরূপে তোমায়।
আসা যাওয়া কর তুমি কাহার নৌকায়॥
তন্ত্রী ও চাঙ্গাড়ি পাত্র ডোম্বী ত্যাগ করে।
নটের পেটিকা আমি ছাড়ি তব তরে॥
তুমি ডোম্বি, আমি কাপালিক [তব তুল্য]।
তব তরে লইয়াছি আমি হাড়মাল্য॥
সরোবর ভাঙ্গি ডোম্বি, খাও যে মৃণাল।
তোমারে মারিব ডোম্বি, লইব পরাণ॥[৩]

কৃষ্ণাচার্য নামে বৌদ্ধ-সহজিয়া সাধক বহুকাল আগে অবিদ্যারূপ তন্ত্রী এবং চাঙ্গাড়িরূপ বিষয়াভাস পরিত্যাগকারিণী মহাসুখরূপিণী ডোম্বীর সংকেত প্রয়োগ করে 'নির্বাণদেবী'-র স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। রামপ্রসাদও সেইরকম পাশা কিংবা দাবা খেলার রূপক ব্যবহার করে কখনো-কখনো তাঁর সাধ্য ও সাধনার কথা বুঝিয়েছেন। পদ্যে প্রকাশিত হলেই কি সব কথা কবিতা হয়? শুভঙ্করীর ছড়া-কে কোনো সুস্থ মানুষ কি কবিতা বলবেন? মিল্-বহুল পদ্য-ছন্দে অনেক অ-কবিতা আমাদের হাওয়ায় ভাসছে। কবিতার শাখা-উপশাখার কথা ভাববার আগে পূর্বাহ্ণে সেইসব স্বচ্ছন্দবিহারী অ-কবিতার বিভ্রম দূর করা দরকার।

আবার এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, কবিতার গৌরব দাবী করে ময়ূরপুচ্ছাবৃত দাঁড়কাকের মতো যে বিপুল অ-কবিতাবলী আমাদের সর্বত্র প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তারা সকল ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্য-বাহনেই বাহিত নয়। আধুনিক কালে গদ্যের বিশেষ

ভঙ্গিকে কবিতার বাহন হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে, এ-কথা কে না জানেন? যুগের খেয়াল যাঁরা অন্ধভাবে মেনে চলেন, সেইসব অশক্তের কলমে তথাকথিত গদ্য-কবিতার প্রলাপ প্রশ্রয় পেয়েছে। সে লক্ষণের নমুনা তোল্‌বার দরকার নেই। সকলের জানা কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। আগের যুগে কবি[illegible]দের যেমন শ্লেষ-যমক-অনুপ্রাসের খেয়াল পেয়ে বসেছিল, [illegible]গে তেমনি নতুন যুগরুচি অপরিণামদর্শী স্বল্পক্ষম কবিদের বোধ-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই বলে, সার্থক গদ্যকবিতা কিন্তু উপহাস্য নয়।

যথার্থ কবিমনের বাণীময় আত্মপ্রকাশের নাম কবিতা। পুঁথি-বদ্ধ বিদ্যা কিংবা পরের হাতের টাকা যেমন কাজে লা[illegible] না, পরের নকল করে তেমনি মৌলিক সৃষ্টির মহিমা দাবী করা [illegible]স্যকর। উনিশের শতকে 'নীতি-কুসুমাঞ্জলি'-র মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যো[illegible]ধ্যায় এই কথাটাই পদ্যে বেঁধে দিয়েছিলেন—

> গ্রন্থগত বিদ্যা, পরহস্তগত ধন।
> নহে বিদ্যা, নহে ধন হলে প্রয়োজন।[৩]

রঙ্গলালের ঐ পদ্যটি নীতিমূলক; ওকে 'কুসুমাঞ্জলি' বল[illegible]তও আপত্তি হবার কথা নয়; কিন্তু ঐ নমুনাটি তবু কবিতার নমুন[illegible]। বৈরাগ্যবারিধি থেকে রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকের শ্র[illegible]ভূষণ নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যে রাজাকে শুনিয়েছিলেন—

> রাজকোষ পূর্ণ হয়ে তবু শূন্যমাত্র,
> যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
> পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা,
> পাত্র হাতে ধন সেই রাজকোষ পাকা।

আমরা যাকে নীতিকবিতা বলি, সেও একরকম কার্যসিদ্ধির পদ্য। শ্রুতিভূষণের অপরাধ এই ছিল যে, তিনি কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির

উদ্দেশ্য নিয়ে বার্ধক্যভয়গ্রস্ত রাজাকে ধনসম্পদ পাত্রান্তরিত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঠিক ওর বিপরীত পরামর্শ আছে রঙ্গলালের নীতিকুসুমাঞ্জলির মধ্যে—

> ধনেতেই অকুলীন, কুলীন-কুমার
> ধনেতেই পায় লোকে আপদে নিস্তার॥
> ধন চেয়ে এ সংসারে বন্ধু কেহ নয়।
> তাই ভাই কর কর ধনের সঞ্চয়।[৭]

বৃহত্তর মানব-সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের দিকে চোখ রেখে এই দুটি পদ্যের মূল্য নির্ণয় করতে হলে দুটিকেই নাকচ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রথমটিতে পাত্রমিত্রের হাতে টাকাকড়ি তুলে দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রাজা-কে; দ্বিতীয়টিতে টাকা-ই যে সংসারে মানুষের শ্রেষ্ঠ সহায় এই বস্তুতান্ত্রিক একচক্ষুবৃত্তির উৎসাহ জোগানো হয়েছে। এরকম ধারণা সকল অবস্থায় সকলের গ্রাহ্য নয়। রামকৃষ্ণের মতো 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বল্‌বার মনোভাবটা সংসারী মানুষের পক্ষে আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় পাগ্‌লামি মাত্র। আবার, চোখ বুজে টাকার পাহাড় বানিয়ে তোল্‌বার শপথ নেওয়াটাও দুর্বুদ্ধি। ধনসম্পদের বিষয়ে সর্বজনীন সুনীতির আদর্শ এ-দুটির কোনোটিতেই নেই। আর, কবিতার গৌরব ওদের একটিও দাবী করতে পারে না।

তাহলে 'কবিতা'-র আসল কথাটা কী?

কবিতা উপার্জন নয়, উপলব্ধি![৮] কবিকে যদি কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় তাহলে তিনি কি বলবেন? তিনি বলবেন—

"আমার রচনার মধ্যে প্রাণ বলে উঠেছে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয় এই আমি-আছির জয়, জয় এই আনন্দময় আমি-আছির জয়!"[৯]

এই আমি-র তত্ত্ব বা অহংতত্ত্বটি শান্ত মনে ভেবে দেখা দরকার। সাহিত্যে এই 'আমি-আছি'র ভাবাটাই একমাত্র ভাষা। বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদির সঙ্গে এইখানেই সাহিত্য-ধর্মের প্রভেদ চোখে পড়ে। এক মনীষী লিখে গেছেন—

> সাহিত্যের কথা বলতে বসে ভাষার বিজ্ঞান-সম্মত চাহিদা বা প্রয়োগের কথা তাহলে দূরে সরিয়ে রাখা যাক্। সাহিত্য হলো ভাষার ব্যক্তিগত ব্যবহার। ব্যাপারটা সত্যিই যে তাই, সে কথা আরো বোঝা যায় যখন এক লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের ভাষাগত মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।[১০]

বল্‌তে-বল্‌তে তিনি ক্রমশ স্টাইলের প্রসঙ্গে এসে পৌঁছেচেন। স্টাইলের কথাসূত্রে তিনি লিখেছেন—

> ভাবনা আর ভাষা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে যুক্ত। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশকলা একই সামগ্রীর দুই দিক; স্টাইল হলো ভাষার মধ্যে ভাবনার আত্মসঞ্চার। এই কথাটাই আমি বলতে বসেছি, এবং একেই বলা যায় সাহিত্য। শুধু বস্তুসম্ভার নয়,—বস্তুর বাক্‌সংকেত মাত্রও নয়; অন্য পক্ষে কেবল শব্দসমাবেশও নয়,—সাহিত্য হলো ভাষার আধারে অভিব্যক্ত ব্যক্তি-বিশেষের ভাবনা।[১১]

কিন্তু, এ মীমাংসাও চূড়ান্ত মনে করা অসম্ভব। শ্রুতিসূত্রগণের ভাবনাও তো তাঁরই স্বকীয় ভাবনা। তবু, তাকে কবিতা বলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি হলো কেন? কারণ, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবনা-টা বড়ো সংকীর্ণ গণ্ডীতে বাঁধা পড়েছে। তাতে অন্য পাঁচজনের

প্রতি সমাদরের ডাক কোটেনি। তার সবটাই শ্রুতিভূষণ-নামক লোভী মানুষটির লোভের সংবাদে পরিপূর্ণ। সেটি পদ্যে বাঁধা ব্যক্তিগত চিত্তবিকারের খবর মাত্র। এবং খবরটি যেন ভাষার আল্‌নাতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। দরকার হলে ও-খবর অন্য আলনাতেও একই ভাবে টাঙানো যেতে পারে। একটু নমুনা দেখা যাক্—

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল

রজনীকান্ত সেনের এই উক্তিটি একটু বদ্‌লে নিলে তিলমাত্র ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ—

নদী নাহি করে পান কভু নিজ জল

কিংবা—

নিজ জল নদী কভু নাহি করে পান

—ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে মূল উক্তিটির মর্মার্থের কোনো গণনীয় হ্রাস-বৃদ্ধি অনুভব করা যায় না।

অপর পক্ষে, এরকম পরিবর্তন যথার্থ ভালো ক[illegible]ার পক্ষে নিঃসন্দেহে মারাত্মক।

আর এক কাব্যতত্ত্বজ্ঞ লিখেছেন—

> ইচ্ছে হলে একটাকে বল্‌তে পা[illegible] আন্তর বস্তু, আর, অন্যটাকে তার প্রকাশ-রূপ, কিন্তু মনে রেখে [illegible]ুটির মধ্যে সত্যিকার কোনো ভেদ নেই—অর্থাৎ 'বস্তু' আর বস্তুর 'প্রকাশ' বল্‌লে যে ভেদের ধারণা মনে জাগা উচিত, সেই ধারণাসম্মতভাবে, পরস্পর পৃথক দুটি উপাদানের স্বাতন্ত্র্যের কথা টিঁক্‌বে না। পরস্পরের আনুগত্য করা বা একটির সঙ্গে অন্যটির মিলিত হওয়া তাদের কাজ নয়,—কারণ, তারা তো আদৌ পৃথক নয়। পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা একই পদার্থের তারা ভিন্ন দিক মাত্র, এবং এই অর্থে তারা একাত্মক। এই একাত্মকতা আপতিক ব্যাপার নয়,—

যাবতীয় শিল্প-সৃষ্টির মূল বিশেষত্ব হিসেবে কবিতার অন্তরতম এই সত্যও প্রসঙ্গ এবং প্রকাশকলার একাত্মকতায় আশ্রিত।[১২]

অ-কবিতা পদ্যেও প্রকাশিত হতে পারে, পদ্যের রীতিতেও অসম্ভব নয়। কিন্তু কবিতার মধ্যে চাই কবির ব্যক্তিসত্তার স্বাক্ষর,—তাঁর এমন আনন্দ বা এমন বেদনা যা কেবল নির্দিষ্ট অর্থমাত্র নয়,—যা ব্যঞ্জনাময় ভাবের সঞ্চার,—এবং ভালো কবিতার প্রকাশ আর প্রসঙ্গ আলাদা করে দেখবার জিনিস নয়। বোধ-বুদ্ধির একাকার একাত্মকতার মধ্য দিয়ে যে সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে 'তার পূর্ণ পরিচয় কি ব্যাখ্যান বা বিশ্লেষণের দ্বারা বোঝানো যাবে? কবিশেখর তাকেই বলেছিলেন—'আনন্দময়-আছি'-র সত্য!

১। রায়মঙ্গল—কৃষ্ণরাম দাস, ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত [১৩৬৩]; পৃঃ ২-৩।

২। ঐ, ডক্টর সুকুমার সেন-রচিত গ্রন্থ-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

৩। রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর'-কাব্যে 'বাজারবর্ণন' দ্রষ্টব্য।

৪। রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী দ্রষ্টব্য।

৫। মণীন্দ্রমোহন বসু-রচিত ভাবানুবাদ [১০ সংখ্যক চর্যাপদের শেষাংশ]।

৬। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'নীতিকুসুমাঞ্জলি'-র ১৮ সংখ্যক্ রচনা।

৭। ঐ, ১৩ সংখ্যক্ রচনা।

৮। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'-নাটকের 'সূচনা'-অংশে রাজা ও কবিশেখরের এই সংলাপ স্মরণীয়:

—"ওহে কবি, তত্ত্ব না থাক্‌লে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস চলবে না।

—সে কথা সত্য মহারাজ! আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায় উপলব্ধি করতে চায় না! ওরা বুদ্ধিমান!"

৯। ঐ, কবিশেখরের উক্তি।

১০। "Let us, then, put aside the scientific use of words when we are to speak of language and literature. Literature is the personal use or exercise of language. That this is so is further proved from the fact that one author uses it so differently from another."—John Henry Cardinal Newman-এর "The Idea of a University" দ্রষ্টব্য।

১১। "Thought and speech are inseparable from each other. Matter and expression are parts of one ; style is a thinking out into language. This is what I have been laying down and this is literature ; not things, not the verbal symbol of things ; not on the other hand, mere words, but thougts exprest in language."—ঐ।

১২। "Call them substance and form if you please, these are not the reciprocally exclusive substance and form to which the two contentions must refer. They do not 'agree', for they are not apart : they are one thing from different points of view, and in that sense identical. And this identity of content and form, you will say, is no accident ; it is of the essence of poetry in so far as it is poetry, and of all art in so far as it is art."—Dr. A. C. Bradley-র 'Oxford Lectures on Poetry' গ্রন্থের 'Poetry for Poetry's sake' প্রবন্ধটি স্মরণীয়।

কবিতার আকাশ, পৃথিবীর মাটি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ত্রিবেণী'-বইখানির শেষ কবিতাটির নাম 'অবসান'। তাতে কবিদের সাধনা সম্বন্ধে অকাট্য এক সত্যের ইশারা আছে। শুধু কবিতা সম্বন্ধেই বা কেন? মানুষের সব পথের, সব চলারই সেই হলো শেষ কথা—

করেছি কর্তব্য যাহা, সেইটুকুই আমার যাহা জমা
করেছি অন্যায় যাহা সেইটুকুই খরচ দিও বাদ।
তোমাদিগে যেটুকু দিয়েছি দুঃখ, কোরো ভাই ক্ষমা
তোমাদিগে যেটুকু দিয়েছি সুখ কোরো আশীর্বাদ।

কবিরা নিজের-নিজের সাধ্য অনুসারে সাধনা করেন, আর, ভাগ্য অনুসারে স্বীকৃত হন। ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুগন্ধরের প্রসঙ্গেও একথা অচল নয়। আন্তরিক প্রয়াস এবং অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধি জীবনে সর্বত্র ঠিক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নয়। কবিতার ব্যাঁপারে তো নয়ই। কারণ, প্রাণপণ চেষ্টা করেও কবিতাটা ভালো হলো না—এ অভিজ্ঞতা যে মিথ্যে নয়, সে বিষয়ে কবিরা নিজেরাই সাক্ষী দেবেন। কবিতার সার্থকতা শুধু যে কবিখ্যাতি-সাধকের প্রয়াসের ওপরেই নির্ভরশীল, সেকথা স্বীকার করা দুঃসাধ্য তো বটেই—বোধ হয়, অসম্ভব। প্রয়াস চাই, প্রেরণা চাই,—প্রেরণা থেকে প্রয়াসে পৌঁছোবার অনুকূল শুভ লগ্নও দরকার। বাংলা কবিতায় বস্তুজগতের স্বীকৃতি কতোদূর সার্থক হয়েছে, সেকথা ভাবতে গেলেও লগ্নের কথা মান্‌তে হবে। লগ্ন কখন আসে? ১৯১৩ সালের ২৪-এ ফেব্রুয়ারি তারিখের একখানি চিঠিতে একজন নামকরা সাহিত্যিক সেকথা লিখেছিলেন—

নিজের কল্পনাকে সত্যিকার করায়ত্ত করা অতি কঠিন কাজ নয় কি? আমার তো সর্বদা মনে হয় যে, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তি যেন আমার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হবে বলেই নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হয় আমাকে! কী নিদারুণ সেই অনুভূতি! শিল্পী হতে হলে সেই রকম তীব্র এবং অকুণ্ঠ ধর্মভাবে আত্মসমর্পণ করা চাই।[১]

এক লহমার নজরে বোঝা যায় যে, এই চিঠিতে শিল্পীর মহৎ দারিদ্র্যেরই ইশারা ফুটেছিল। জগতের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে এ ধরনের মন্তব্য মোটেই বিরল নয়। শেলি বলেছিলেন—কাব্য সত্যিই এক স্বর্গীয় ব্যাপার। অগ্নিপুরাণ বলেছেন—কবিতার সংসারে কবিই প্রজাপতি। মম্মট ভট্ট বলেছেন—কবির সৃষ্টি প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টির চেয়ে বড়ো। কবিতার স্রষ্টাকে অপরিসীম প্রযত্নের পথ ধরেই চলতে হয়।

যাই হোক, কবির স্থান স্রষ্টা প্রজাপতির চেয়ে ছোটো যে নয়, সে ধারণা কোন্ গুণে স্বীকার্য? যে কবিতা পাঠকের কানে এবং প্রাণে ভালো লাগে তাকেই আমরা ভালো বলে থাকি। পাঠক যে ভাষা মোটেই বোঝেন না সে রকম অদ্ভুত ভাষার পক্ষপাতী কেবল সেই সব শিল্পীর পক্ষেই হওয়া সম্ভব,—যশের দিকে যাঁদের আদৌ নজর নেই। অর্থাৎ যথার্থ প্রকাশের দিকে বীতরাগ হয়ে যাঁরা অদ্ভুত ভাষা-রীতি প্রয়োগ করেন, তাঁরা কবি নন; তাঁদের সমীহ করবার দরকার নেই। তবে ভালো কবিতাও অনেক পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। সে-রকম দুর্বোধ্যতার জন্যে পাঠককে অবশ্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অনুভূতি, বা আনন্দই কাব্যের প্রধান কারণ এবং লক্ষ্য। প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাবার ভাষাকে আমরা কাব্য বলি না। তবে, প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাবার ভাষার মতো ভাষাতেও,—অর্থাৎ ঠিক হুবহু সে ভাষা না হোক, প্রায় সেইরকম ভাষাতেও কবিতার সৃষ্টি যে অসম্ভব নয়, সেকথা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

অতীতে একদিকে কাব্য, আর অন্যদিকে প্রতিদিনের সংসার, এই দুটি ছিলো পরস্পরের সম্পর্কহীন পৃথক দুই জগৎ। মধুসূদনের পরে বিহারীলালে,—বিহারীলালের পরে আরো কিছুদিন মোটামুটি এই বিশ্বাসই চলে এসেছে। অবশ্য নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' বা হেমচন্দ্রের খণ্ড-কবিতালী থেকে প্রতিদিনের চেনা ব্যবহারিকতার উল্লেখ শুনিয়ে দেওয়া তার্কিকের দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু সেসব লেখাতেও এ-দুয়ের সত্যিকার সমন্বয় বা একাত্মতার ঝোঁক নেই। প্রয়োজন আর আনন্দের অঙ্গাঙ্গিভাবের ভাবনার দিকে,—টাকা-আনা-পয়সার এই স্থূল সংসারের প্রাত্যহিকতাকে পাশ কাটিয়ে নয়,—এরই মধ্যে বাস করে, এই স্থূলে-সূক্ষ্মে, ললিতে-কঠোরে বহুমিশ্র জীবনের অন্তর্নিহিত কাব্য-সম্ভাবনার ওপর বাংলার কবিদের যথার্থ নজর পড়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লেখা শুরু করেন, তখনো এ বিশ্বাস ছিল প্রতিষ্ঠাহীন। তাঁর কলমেই প্রথম এই নতুন দৃষ্টির অভ্যুদয়ের দাগ পড়লো। তবে, ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। মধ্যযুগ এবং রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে আঠারোর শতকের মাঝামাঝি সময়টা বিবেচ্য।

এসব কথার বিস্তার দরকার। কিন্তু সে কাজে এগিয়ে যাবার

আগে সকলের স্বীকার্য এই সাধারণ সিদ্ধান্তটিই নিঃসংশয়ভাবে মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক যুগেরই স্বকীয় এক-একরকম বিশ্বাস থাকে। কবিতার যুগানুভূতি এবং যুগবিচার সম্পর্কে কথাটা এখানে স্মরণীয়। আমাদের মধ্যযুগের কবিতাতেও যথেষ্ট বাস্তবতা ছিল, সে তুলনায় কবিত্বই বরং কম ছিল। ভারতচন্দ্রের লেখাতেও বাক্‌চাতুর্য, মিলের চমক, বস্তুচিন্তার প্রচুরত্ব ইত্যাদির তুলনায় ভাবমগ্নতার লক্ষণ বিরল। আবার, মধুসূদন ছিলেন বিষয়ের গাম্ভীর্য-সন্ধানী। তাঁর 'মেঘনাদ-বধকাব্য' প্রভৃতি যাবতীয় কবিতার বই 'অভিজাত' বিষয় অবলম্বনে লেখা। কেবল তাঁর চতুর্দশপদী-গুলিতেই কাছের কথা জায়গা পেয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রান্নার প্রসঙ্গ দেখা গেছে। মঙ্গলকাব্যে আরো বিস্তারিত তালিকা আছে। পদ্যে লেখা শ্রীচৈতন্যের জীবনী-গ্রন্থগুলির মধ্যেও সে প্রসঙ্গের উপেক্ষা নেই! কিন্তু সে সবই যেন অন্য দৃষ্টির দান,—অন্য সংস্কারের স্বাক্ষর। মধ্যযুগের জীবনীকাব্যে, মঙ্গলকাব্যে, অথবা উনিশ শতকের মহাকাব্যে-খণ্ডকাব্যে যে রকম উল্লেখ দেখা যায়, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিগোষ্ঠীর বস্তুস্বীকৃতির পার্থক্য আছে। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে ডিঙ্গা-ডুবির ফলে চন্দ্রধরের দুর্দশার ছবিতে দেখা গেছে—

> ব্রহ্মা দিজে শুনিয়া চান্দোর কচন।
> ভাঙ্গা গামছার অর্ধেক দিল ততক্ষণ
> জথা তথা ব্রাহ্মণ না হয় তবে দানী।
> ভাবিয়া চিন্তিয়া দিল কড়াটেকের কানী।
> উভা করি তবে পিন্ধে সাধু কাছা টানি।

বস্ত্রহীন চন্দ্রধরের দুর্দশা বর্ণনার দায়িত্ব নিয়ে নারায়ণ দেব এখানে যথাসাধ্য বস্তুবর্ণনা করেছেন। গল্পের দিকেই তাঁর সর্বাধিক মনোযোগ,

—কারণ, প্রধানতঃ গল্পই তিনি বলতে বসেছেন। সেই গল্পের ধারাতেই চন্দ্রধরের দুর্দশা দেখা দিয়েছে এবং কবি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কল্পনার সাহায্যে যা বর্ণনা করেছেন তাতে ব্যক্তিবিশেষের দুর্দশাটুকুই ফুটেছে,—সেই সূত্র ধরে কোনো সীমাহারা, সর্বজনীন দীর্ঘশ্বাস প্রকাশের অভিপ্রায় ঘটেনি। বস্তুজগতের সীমা, আর, অনন্তের সূচনা—এই দুই-ই যেন পরস্পরের সুনির্দিষ্ট পার্থক্যে ব্যবহিত থেকেছে।

দাশরথি রায় ছিলেন আরো পরের কালের মানুষ। প্রতিদিনের মানবস্বভাব সম্বন্ধে তাঁর কোনো রকম অভিজ্ঞতা ছিলনা, বলা যায়না। ছোটো ছোটো মিল দিয়ে সুশ্রব্য পদ্যে তিনি তাঁর এই ধরনের অনেক অভিজ্ঞতা বেঁধে গেছেন। সে রকম একটি অংশ এখানে তুলে দেখা যাক্—

খলের স্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি।
লোভীর স্বভাব, চিরকাল পরদ্রব্যে দৃষ্টি ॥
মানীর স্বভাব, নিজ দুঃখের কথা পরে কন না।
অভিমানী লোকের স্বভাব, তুচ্ছ কথায় কান্না ॥
নারীর স্বভাব, গুপ্ত কথা পেটে রাখা দায়।
ডাইনের স্বভাব, ছেলে দেখলে ঘনদৃষ্টে চায় ॥
দাতার স্বভাব হয় বাক্য নাহি মুখে।
হিংসুকের স্বভাব, পর-সুখে মরে মনোদুখে ॥

—এইভাবে কৃপণ, বালক, বাতুল, বৈদ্য ইত্যাদি নানাভাবের কথা বলেছেন দাশু রায়। কিন্তু একেও কবিতায় বস্তুস্বীকৃতির দৃষ্টান্ত বলা চলবে না। কারণ এ তো কেবল তথ্যের তালিকা। তথ্য যে-গুণে কবিতা হয়, এখানে সে গুণ কোথায়? এ তো কেবল বস্তু-বর্ণনাময় পদ্য।

জগতে দুঃখ, দারিদ্র্য, হিংসা, কার্পণ্য ইত্যাদির অতিরিক্ত আরো

অনেক কথা আছে এবং কাব্যে জীবনের সব কথাই জায়গা পেতে পারে। মধুসূদনের কাব্য থেকে এবার নারীর প্রসাধনের একটি ছবি দেখা যাক্—

এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।

যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণ,
হীরক-মুকুতা-মণি-খচিত; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম কস্তুরী;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসন।

লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্রবালা; রসানে মার্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।

—এখানে নারীর প্রসাধনই দেখা গেল বটে, কিন্তু সাধারণ নারী নন ইনি। নগেন্দ্রবালা দুর্গার প্রসাধনের ছবি এঁকেছেন মধুসূদন। স্বর্গীয় ব্যাপারের প্রতি আগ্রহ তখনো নিঃশেষ হয় নি,—একথা না বলে এই সূত্রে বরং অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, আরো কাছের সৌন্দর্যে তখনো আমাদের চোখ পড়েনি।

মুকুন্দরামকে যেমন "দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণছায়া আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত,"—ক্ষেমানন্দ যেমন বলেছেন,—"মাগো তুমি মম মন্ত্র দিলা কানে। সেই মহামন্ত্রবলে পূর্ব আরাধনা ফলে কবিতা নিঃসরে তেকারণে,"—ভারতচন্দ্রকে যেমন "স্বপনে কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া,"—মধুসূদনকেও তেমনি কবিতার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন অন্যা মায়া, অন্যতর বিশ্বাস! সে তুলনায় চণ্ডীদাসের

পদাবলীতে বরং নিকট বস্তুলোকের সঙ্গে কবির ভাবের ঘনিষ্ঠতা বেশি। যেমন—

কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরিতি করে
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে।

—চণ্ডীদাসের এই ক'টি কথাতে কাছের সংসারের চেনা প্রসঙ্গ অবশ্যই ধরা বেশি পড়েছে। এবং মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির লেখাতে বস্তু-বর্ণনা এর চেয়ে বেশি পরিমাণে ঘটলেও এ-উক্তির অন্তর্নিহিত কবিতা-গুণের তুলনা যে সেসব ক্ষেত্রে সত্যিই বিরল, সেকথাও বিবেচ্য। মুকুন্দরাম থেকেই অতঃপর একটি দৃষ্টান্ত তোলা যাক্—

সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হৈলা বীর দশ গণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি॥
একত্র হইলে অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।
চাল খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি॥

মুকুন্দরামের কাব্যে মুরারি শীলের এই চালাকির ভাষা চমৎকার বটে,—এ বর্ণনা বাস্তব-গুণান্বিত বলতেও বাধা হবার কথা নয়, কিন্তু এতে স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতিশায়ী কবিতার ইন্দ্রলোকের ইশারা নেই। তবে, আর একরকম আবেদন আছে বটে।

এই সঙ্গে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বস্তু-দৃষ্টির তুলনা করলে সেক্ষেত্রেও কবিকল্পনাগত তেমন কোনো পার্থক্যের কথা মনে

হবেনা। হেমচন্দ্র শুধু ভাষাতেই আধুনিকতর। উনিশ শতকের ইংরেজ-শাসনে বাস করে কলকাতার ইংরেজি-শিক্ষিত একজন বাঙালীর পক্ষে নিজের দেশ-কালের যেসব খবর এড়িয়ে যাওয়া-নিতান্তই অসম্ভব ছিলো, হেমচন্দ্রের খণ্ড-কবিতাবলীতে প্রধানতঃ সেইসব বাস্তব খবরই জায়গা জুড়েছে। কিন্তু কবির গভীর দৃষ্টি পড়েনি,—কবিজনোচিত কল্পনার কাজ দেখা দেয়নি।

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের তদানীন্তন যুবরাজ এসেছিলেন কলকাতা দেখতে। সেই উপলক্ষে হেমচন্দ্র তাঁর 'ভারতভিক্ষা'-তে লিখেছিলেন—

> অপূর্ব সুন্দর মোহন সাজ
> সাজে কলিকাতা পরিল আজ
> দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ গায়
> রঞ্জিত বসন চারু শোভায় ;
> দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-কোলে
> তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;
> ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্রকায়
> ঝক্ ঝক্ ঝলে কলস তায় ;

—এই বর্ণনার মূলে যে মর্জি তাঁকে কলম ধরিয়েচে, সেটা কখনোই মনের গভীর তলের জিনিস নয়। ঈশ্বর গুপ্তের লেখাতেও ওরকম বহিরঙ্গ বর্ণনার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। উৎসব-সাজে সজ্জিত কলকাতার বাড়িতে-বাড়িতে মঙ্গলকলসের উল্লেখ-সূত্রে যে সাদৃশ্যের ভাবনা তাঁর মনে জেগেছিল, সে হলো—"কোটি তারা যেন একত্রে উঠে।" রাতের ছবিতে তিনি মাত্র এই এঁকেছিলেন—

> উঠিছে আতসবাজী আকাশে
> সব তারা যেন গগনে ভাসে।

কবিতা যে মানুষের মনের ঢেউ এবং ভাবনার শিহরণ,—রোমাঞ্চ এবং আবিষ্কার,—কবিতার আশ্চর্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিদিনের বস্তুজগৎ যে পুনরাবিষ্কৃত হয়ে থাকে, সে সত্য সেকালের এইসব খণ্ড-কবিতার মধ্যে কখনোই ধরা দেয়নি। হেমচন্দ্রের মনে সেরকম কোনো বিশ্বাসই জন্মগ্রহণ করেনি। মুকুন্দরামের দু'একটি জায়গায় বস্তুলোক থেকে অনুভূতিলোকে এগিয়ে যাবার পথ খোলা ছিল বটে, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও যথার্থ কবিকল্পনার কুণ্ঠাহীন আলো পড়েনি। চণ্ডীদাস যেমন কুলবতী রমণীর পরকীয়া প্রেমের কথা বলতে গিয়ে তুষের আগুনে পোড়বার পুরোনো এবং বহু পরিচিত সাদৃশ্য ভেবেছিলেন, মুকুন্দরাম তেমনি ফুল্লরার দুঃখের ছবি এঁকেছিলেন নিষাদ-জীবনের সনাতন কয়েকটি দারিদ্র্যলক্ষণের তালিকা ব্যবহার করে। যেমন—

মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
আচ্ছাদন নাঁহি অঙ্গে স্নান বৃষ্টিনীরে॥

—ফুল্লরার এই দুঃখের ছবি হেমচন্দ্রের সুখের কলকাতার চেয়ে সার্থক বটে, কিন্তু ব্যাধপত্নীর নিত্যকৃত্যের দুঃখ যে-সব বস্তু-উপাদানের মধ্য দিয়ে এই ছবিতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে, সেই মাংসের পসরা,—আচ্ছাদনহীন অঙ্গ,—বৃষ্টি-নীরে স্নান,—সেই [illegible]তেই ঘরে ঘরে মাংস ফেরি করবার দুরদৃষ্ট ইত্যাদি সবই হলো দৈন্যের চিরাচরিত কবিপ্রসিদ্ধি। কবিতার পাত্রে অনেক চেনা জিনিসের নমুনা তোলা হয়েছিল। শান্ত মনে ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, হেমচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দরামের পার্থক্য শুধু উপকরণের বিন্যাসে,—উপকরণের সৃষ্টিতে নয়। যুবরাজের কলকাতায় আগমন হেমচন্দ্রের মনে আদৌ কোনো কবিত্বের ঢেউ তোলেনি। তিনি শুধু পদ্যবন্ধে মুখস্ত ছবি আওড়ে ছিলেন। পদ্যের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে একটি

ব্যক্তিগত কৃত্যই তিনি পালন করেছিলেন। সে তাঁর অনুভূতির তাগিদে নয়। অনুভূতির রঙ লাগেনি বলেই তাঁর বস্তুসম্ভার কেবল পরিচিত এবং বিবর্ণ। আর, অনুভূতির রঙ লেগেছিল বলেই মুকুন্দরামের বস্তুসম্ভার পরিচিত হয়েও রসোদ্রেকে সক্ষম। বোধের আপেক্ষিক সততার ফলে পয়ারের সনাতন মন্থর বাহনে এমন কিছু-কিছু বস্তু-পরিচয় তিনি বাহিত হতে দিয়েছিলেন, যেগুলি পরস্পরের দ্বারা সমর্থিত হয়ে ফুল্লরা সম্বন্ধে এক করুণ অনুভূতির সংকেত হয়ে উঠেছে। এই সংকেতের সামর্থ্যেই কবিতার সার্থকতা। তাই, মুকুন্দরামকে কবি বলে মেনে নিতে মনে কোনো সন্দেহ জাগেনা। যদিও তাঁর বস্তুদৃষ্টি আর, আধুনিকতর কবিদের বস্তুচৈতন্য এক বা অভিন্ন নয়। বিষয়টি আরো কিছু পরিস্ফুট করা দরকার।

আমাদের এই বহুকালের সমাজজীবনের বহু যুগান্তর অতিক্রান্তির পরেও ব্যাধের চেহারা বিশেষ বদলায়নি। নিরক্ষর গরীব মানুষের জীবনে সাজপোষাক বা হাবভাবের পরিবর্তন সহজে ঘটে না। শিক্ষার ফলে মানুষের কৌতূহল বাড়ে,—সংসারের প্রসার বেড়ে যায়। বিত্তের অভাবের সঙ্গে শিক্ষার অভাব যুক্ত হলে মানুষ যে নিশ্চল হয়ে যায়, একথা মূঢ় ধনীব্যক্তি ছাড়া আর কেই বা অস্বীকার করবেন? আমাদের দেশের প্রবাদে বলেছে—

কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই
কড়ি হলে কৃষ্ণ পাই

কড়ি হলেই যে কৃষ্ণ মিলবে, সে রকম কোনো নিশ্চয়তা নেই বটে। কিন্তু মোদ্দা কথাটা এই যে, সব দেশের সব সমাজেই কিছু কিছু অংশ অন্যান্য অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিশ্চল থেকে যায়। সেই সব নিশ্চল স্তরের রূপ দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থাকে। যেমন ভারতবর্ষের চাষী, দাঁড়ী, মুটে-মজুরের স্তর। ইংরেজ আসার আগে

এরা যে অবস্থায় ছিল, ইংরেজ চলে যাবার পরে আজও অবশ্য ঠিক সেই অবস্থাতেই পড়ে নেই। বহু পরিবর্তন ঘটেছে বৈ কি। কিন্তু সেই মন্দগতি পরিবর্তনের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, গরীব সমাজের চেহারা অনেকদিন এক-রকমই আছে। আমাদের দেশে কায়িক শ্রমেই যাদের রুজি-রোজগারের নির্ভর, যারা নিরক্ষর,—ডোম, মাঝি, ব্যাধ প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিধারী সেই সব 'মূঢ়, মূক, ম্লান মুখের' দল অনেক কাল একই অবস্থায় রয়ে গেছে। কাজে-কাজেই সুন্দর মুখের কবিপ্রসিদ্ধিগত সাদৃশ্য যেমন চাঁদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে,—কবিরা দুঃখের ছবিতে তেমনি ঐসব অনতিপরিবর্তিত দুঃখের রূপ বর্ণনা করেছেন। এরকম ক্ষেত্রে উপাদানের ভেদ প্রায় চোখেই পড়েনা। মুকুন্দরাম ব্যাধের ছবিতে যেমন মাংস-বস্তুটির উল্লেখ করেছেন, তাঁর অনেক কাল আগে চর্যার লেখককে তেমনি ব্যাধের প্রসঙ্গে অপরিহার্য সেই মাংসের কথাই বলতে হয়েছে। ব্যাধ বললেই মাংসের উল্লেখ এসে পড়ে। জাল বা ফাঁদের কথা মনে হয়। এসব বস্তু ব্যাধের সামান্য-ধারণাকেই প্রকাশ করে থাকে। ব্যাধের সাধারণ সংজ্ঞার সঙ্গেই এসব লক্ষণ জড়িত। বিশেষ ব্যাধের বিশেষ ব্যক্তি-পরিচয় নেই এদের মধ্যে।

"মাআজাল পসরি রে বধেলি মাআ হরিণী"

—মায়াজাল অপসারিত করে মায়া হরিণীকে বধ করেছি—একথা কবিতা নয়। ব্যাধের বৃত্তি যেসব বস্তুকে অবলম্বন করে মানুষের যুগ-যুগান্তব্যাপী ধারণার বিষয় হয়ে উঠেছে, এখানে সে ধরনের কিছু কিছু তথ্যই কেবল পরিবেষণ করা হয়েছে। চর্যাপদের পদকর্তা তত্ত্বব্যাখ্যানের কাজে নেমে তাঁর কাজের সুবিধার জন্য জিজ্ঞাসুকে ব্যাধের বৃত্তির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। মুকুন্দরাম সেই নিশ্চল ব্যাধ-বৃত্তির দিকেই আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে

আনুষঙ্গিক আরো কিছু তথ্য দিয়েছেন। কবির সঙ্গে তত্ত্বব্যাখ্যাতার স্বভাবের মৌলিক ভেদ যেখানে, কেবল সেইখানেই উভয়ের মধ্যে যা-কিছু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। তথ্যের বিন্যাসে,—উপকরণের পরিবেষণ-রীতিতে,—অনুষ্ঠান-আচরণ-আবরণ-আভরণ ইত্যাদি সাজাবার মর্জিতে প্রভেদ আছে। একজন এক ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মকথক; অন্যজন অন্য ধর্মবিশ্বাসের গল্পকার। গল্পকারকে গল্পের রসের খাতিরে যেটুকু বাড়তি বস্তু-সমাবেশের ঝোঁক মেনে নিতে হয়,—আবেগ জমাবার জন্য বস্তুচিত্রে তাঁর যেটুকু অভিনিবেশ অবশ্য মাননীয়,—মুকুন্দরাম সেইটুকুই মেনেছেন। ততোধিক বস্তুচেতন হতে হলে ততোধিক বস্তুবোধের তাড়না দরকার!

পলাশীর যুদ্ধের আগে আমাদের কবিদের মনে সে তাড়না ছিলো না, পরেও সে তাড়না রাতারাতি এসে পড়েনি। বাইরের জগৎ তখনো বাইরেই ছিল।

রামপ্রসাদ সেন সেই পলাশীর আমলের মানুষ। তিনি বলে গেছেন—

> ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো
> কাজ কি রে তোর সে রোশনাইয়ে
> তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে
> দেও না জলুষ নিশি দিনে।

পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের নশ্বরতা আমাদের মনের অন্তর্লীন গহন মনে তলিয়ে গিয়ে একরকম জাতিগত অধ্যাত্ম-স্বভাবে পর্যবসিত হয়েছিল। সে তো অনেক কালের সত্য। তপোবন থেকেই

ভারতীয় সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছে,—রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আজ একথা কোন্ বাঙালী না জানেন? তপোবনে নিরাসক্তভাবে সত্য উপলব্ধির আদর্শ পূজা পেয়েছে। তারই মধ্যে আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ ঘটে গেছে। তারপর আরো কতো শতাব্দী ধরে রক্তমাংসের স্থূল ভারতবর্ষে,—স্থূল বাংলা দেশে,—প্রাত্যহিক বস্তুসম্পর্কময় জীবনে কতো পাঠান-মোগলের ঝড় বয়ে গেল। স্বভাব-আধ্যাত্মিক বাঙালী কবিরা সেসব উত্থান-পতন দেখেছেন, সেসব কথা লিখেছেন,—কিন্তু তাঁদের মনে নিজের-নিজের কালের পৃথক-পৃথক বস্তুবোধ জাগেনি। সমাজে টাকা-পয়সার অসমতা, ঐশ্বর্যের বৈষম্য, বড়োলোকের সুখ আর গরীব লোকের দুঃখ ইত্যাদি ব্যাপারের তুলনাবোধ মধ্যযুগের বাংলা কবিতাতেও কম নেই। যখন—

পৌষে প্রবল শীত সুখী সর্বজন…

তৈল তুলা তনুনপাত তাম্বুল তপন—

—*তখন* ফুল্লরার কপালে 'হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা'। এসব বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিবেশ বা বস্তুর ভারে বা বাধাতে কবিদের 'মনোময় মাণিক্য' চাপা পড়েনি। মধ্যযুগের সমস্ত বৈষম্য এবং দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে সেকালের সমস্ত কবিরই একরকম আধ্যাত্মিক আনন্দ ছিল। শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিদির মতো তাঁরা তাঁদের পতিপরমগুরু জীবনের কাছ থেকে প্রচুর প্রহার পেয়েও আনন্দবাদের সতীত্বের সংস্কার ভোলেন নি! পলাশীর কাছাকাছি সময়ে যখন মধ্যযুগের অবসান ঘটেছে, সে-যুগের শেষ প্রতিনিধি রামপ্রসাদ সেন তখনো গেয়েছেন—

এই সংসার ধোঁকার টাটি।

ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥

তপোবনের অনাসক্তিবাদে অভ্যস্ত, আধ্যাত্মিক সংস্কারগ্রস্ত মনেরও

কাছে একথা 'প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং'। কিন্তু এদেশে আধ্যাত্মিকতার হিমালয় তখন দিনে-দিনে ভেঙ্গে পড়ছে। শ্রীচৈতন্যের শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে শৈথিল্য সে সময়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। মমতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, প্রেম ইত্যাদি বহুব্রত শব্দের স্বাদ হারিয়ে যাচ্ছিলো সমাজজীবন থেকে। পরমভক্ত রামপ্রসাদের মর্মোচ্ছ্বাস তাই তখন সকলের পক্ষে বিনাবাক্যে গ্রাহ্য হয়নি। সাহিত্যে কথা-কাটাকাটির উৎপাত তখন বেশ রুচিকর হয়ে উঠেছিল। সেই 'ফ্যাশানের' তাড়নাতেই বোধ হয় আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের জবাবে লিখেছিলেন—

যদি ধোঁকাই জান

তবে কেন তিন-তিনবার কেঁচেছ ঘুঁটি ?

ভক্ত রামপ্রসাদ পর-পর তিনবার বিয়ে করেছিলেন। আজু গোঁসাই সেই ব্যক্তিগত বৃত্তান্তের দিকেই তাঁর বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন।

আজ এতোকাল পরে সেসব কথার উল্লেখের দরকার নেই। গোঁসাই এবং প্রসাদ উভয়েই লোকান্তরিত হয়েছেন। এই উল্লেখের গ্লানি তাঁদের স্পর্শ করবেনা। পুরোনো ঘটনা থেকে আমাদের সেই অতীত যুগসন্ধির তদানীন্তন নতুন মর্জিটাই এখানে দেখা গেল। পলাশীর কাছাকাছি সময়ে সেই নতুন মর্জির জন্ম হয়। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরামের সত্তায় তা ছিল না। পলাশীর প্রায় একশো বছর পরের কবি হেমচন্দ্রই বা সে মনোভঙ্গির কতটুকু পেয়েছিলেন ? হেমচন্দ্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলালের মধ্যেও সেই নতুনতর বস্তু-সত্যের বোধ অনুপস্থিত ছিল বললে অন্যায় হবে না। আজু গোঁসাই-এর ইঙ্গিতটা এই ছিল যে,—জীবন আনন্দের ধারা,

সেটাতো শোনা কথা ; মা মা বলে কাঁদছি, বলছি যে 'ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত',—আবার যে কারণেই হোক, সন্ন্যাসীকেও পর পর তিনটি বিয়ের দুরদৃষ্ট মেনে নিতে হচ্ছে ! এ যে ভারি অসংগত ব্যাপার !

বিপরীত মননের সমবায়ে গঠিত এই যে আমাদের মিশ্র জীবনসত্য, এ সত্যের ওপর প্রথম জোর পড়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। এই সত্যবোধকে তিনি পুনরায় মিলিয়ে দিয়েছেন তপোবনলব্ধ সনাতন ভারতীয় আনন্দবাদের ধারাতে। আর 'রবীন্দ্রোত্তর'-নামে যাঁরা বিশেষিত, বস্তু-সত্যের অভিজ্ঞতায় তাঁরা সংশয় থেকে ক্রমশ জড়বাদের দিকে এগিয়েছেন। 'সন্ধ্যাসংগীতে', 'খেয়া'তে 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'তে রবীন্দ্রনাথের যে বিষাদবোধ দেখা গেছে, তার প্রকৃতি হলো আধ্যাত্মিক। তাঁর দৃষ্টি ছিলো খোলা আকাশের দিকে, আনন্দের দিকে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'ও—

আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া। [২]

রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে ছিলেন সঙ্গীহীন এবং আকাশ-প্রিয়। তারপর জীবনে অনেকবার অনেক রকম জনতা তিনি দেখেছেন। কাউকে পরিত্যাগ করেন নি। সংসার করেছেন, ইস্কুল চালিয়েছেন—সভা-সমিতি, নাচ-গান, মৃত্যুশোক, দেশের হাতে লাঞ্ছনা-ভোগ, দেশের হাত থেকেই এবং বিশ্বের হাত থেকেও পুরস্কার লাভ—এ সবই তাঁর জীবনে ঘটেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথাটা এই যে, রবীন্দ্রনাথ অভিজাত এবং সীমাতীত। নদীমাতৃক বাংলা দেশে তিনি ছিলেন মনের মহাসমুদ্র ! তাই তাঁর কথা স্বতন্ত্র ! সমুদ্র যে আকাশের ছায়া ধরে, সে আকাশ অব্যাহত। তাই তিনি ইংরেজ আমলের বাঙালী কবি হয়েও চিরকালের আকাশবাদী,—আনন্দবাদী !

সেকরম আনন্দবাদ কোনো আজু গোঁসাই-এর ঠাট্টাতে আহত হয়না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে,—মোটামুটি 'পূরবী' [১৯২৫] থেকে 'শেষ লেখা'র [১৯৪১] মধ্যে বাংলা দেশে একাধিক যে তরুণ কবিদলের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা যেন আজু গোঁসাই-এরই মানস-শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের মত মনঃসম্পদের তাঁরা অধিকারী নন। রবীন্দ্রনাথের মতন ভোগের অধিকার কিংবা আত্মার ঔজ্জ্বল্য তাঁরা যে পাননি, সেকথা স্বতঃসিদ্ধ। হয়তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে তাঁরা মনে-মনে যে আকাশের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছেন, অথবা কখনো কোনো আশ্চর্য আকাশ দেখে তাঁদের মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যেসব লাইন গুন্-গুন্ গান হয়ে বেজেছে, তাঁদের 'দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি'-বহুল প্রাত্যহিক পরিবেশের চাপেই সেইসব আকাশ এবং গান, গান এবং আকাশ দিনে-দিনে নিঃশেষ হয়ে গেছে! ক্ষুধার খাদ্য না পেলে স্থূল শরীরটা যেমন যন্ত্রণা ভোগ করে, মনেরও তেমনি কিছু কিছু যন্ত্রণা আছে। বিদ্রূপের ভাষায়, ভাঙনের ঝোঁকে, অবিশ্বাসের কালি দিয়ে মন সেই যন্ত্রণার কথা লিখে রেখে যায়। অবিশ্বাস আর অন্ধকারের মেয়াদ ফুরোলে আবার আরো নতুনের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে বলতে হয়—

করেছি কর্তব্য যাহা, সেইটুকুই
আমার যাহা জমা
করেছি অন্যায় যাহা সেইটুকুই
খরচ দিও বাদ।

কবিরাও রক্ত-মাংসের মানুষ। তাঁদের ও ন্যায়-অন্যায় ঘটে বৈ কি! কাব্যের রাজ্যেও আইন আছে। ছন্দ, মিল, অলংকার, ভাষা ইত্যাদির বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে অনেক পুঁথি লেখা হয়েছে। সেসব আইনের ওপরে আরো বড় আইনের শাসন আছে। শিল্পীরা

বারবার সেই আত্মশাসনের আইনের কথা বলে গেছেন—ঈশ্বরের সত্যদৃষ্টির নিরঞ্জন আলো চাই, উত্তাপ চাই,—কবির মন শুদ্ধ হোক, শুদ্ধ হোক! আকাশ থাক—মাটিও থাক।

১। D. H. Lawrence-এর একখানি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি :—

'Isn't it hard, hard work to come to real grips with one's imagination—throw everything over-board? I always feel as if I stood naked for the fire of Almighty God to go through me—and it's rather an awful feeling. One has to be so terribly religious to be an artist.'

২। সন্ধ্যাসংগীত-এর 'সৃষ্টি' থেকে উদ্ধৃতি।

আনন্দের ব্যাকরণ

কামারপুকুরের একটি ব্যক্তিগত স্মৃতি উল্লেখ করে রামকৃষ্ণদেব একবার বলেছিলেন—হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের একটি পুকুর, আর একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জলপান করলে। জলটি স্ফটিকের মত। দেখালে যে সেই সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা;—যে সরিয়ে জল খায়, সে পায়।[১]

মহৎ কবিতার মধ্যে মানুষের সেইরকম গূঢ় আনন্দ-সামর্থ্যের খবর পাওয়া যায়। জগৎ-ব্যাপারে মধ্যে স্ফটিকের মতো জলও আছে, পানাও আছে। জলের প্রত্যাশীকে পানা সরাবার দায়িত্ব নিতে হয়। আমাদের চৈতন্যকে কাছে বেঁধে রাখবার গিঁঠও আছে,—দূরে এগিয়ে দেবার মুক্তিও আছে। এই সংসারে, স্থূল শরীরের মধ্যে চৈতন্য বাঁধা পড়েছে। কিন্তু, কবিতা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মোক্ষও নয়,—বিষয়-সঙ্কটের পরিত্রাতাও নয়। কবিতা-পাঠের ফলে দারিদ্র্যও দূর হয় না,—রোগেরও নিবারণ ঘটে না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা মনে পড়ে। তিনি লিখে গেছেন—

> ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়;
> সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়।
> তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়;
> প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হইলে ভবনাশ পায়॥
> দারিদ্র্যনাশ-ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয়;
> ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥[২]

অর্থাৎ ধনপ্রাপ্তির ফলে যেমন সুখভোগ হয়ে থাকে, এবং

সে-অবস্থায় দুঃখ দূর করবার জন্য আর যেমন পৃথক কোনো চেষ্টার দরকার হয় না,—তেমনি ভক্তি-সাধনার ফলে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম দেখা দেয়,—তখন সংসার আপনিই বিনষ্ট হয়। সংসারের গ্লানি বা ভবযন্ত্রণা নাশ করা প্রেমের মুখ্য কাজ নয়,—ওটি হলো প্রেমের আনুষঙ্গিক ফল।

তেমনি, কবিতার মধ্য দিয়েই আমাদের স্থূল অহংটিকে অতিক্রম করবার আনুষঙ্গিক সম্ভাবনা আছে।

কবিতার সত্য খুঁজতে গিয়ে এইভাবে 'আনন্দময় আছি'-র তত্ত্বে পৌঁছোতে হয়। পৃথিবীর মাটি থেকে যত কিছু আনন্দ (অর্থাৎ গভীর অনুভূতি,) পাওয়া যায়, সে সবই যে কবিতার বিষয় হতে পারে, তাও বলা হয়েছে। এইবার সেই আনন্দ প্রকাশের কলা-কৌশল বা ব্যাকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক।

মানুষের মন বিচিত্রের যাওয়া-আসার পান্থশালা। কবিতার শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে সেই বিচিত্রতা আমাদের উপলব্ধির গোচর হয়। সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়, সম্পদ-দীনতা, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, জীবন-মৃত্যু, ইত্যাদি যাবতীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে কবিতার ধারা এগিয়ে চলেছে। চলেছে অলক্ষ্য থেকে অলক্ষ্যে! এক-একটি মনের বিশেষ-অনুভূতির ঢেউ সর্বজননীন অনুভূতির রস-সমুদ্রে লীন হচ্ছে।

যে-কোনো উৎস থেকেই হোক্, প্রতিদিনের বিষয়বুদ্ধিজীবী অহং-পুরুষটির মধ্যে গভীর নাড়া লাগা চাই। তবেই, মন-প্রাণ-আত্মার মধ্যে বিপুল সুদূরের চেতনা জেগে উঠ্‌তে পারে। মহৎ কবিতা সেই রকম চৈতন্যের দান। চৈতন্যের এ অবস্থা একমাত্র ভাষা-ছন্দ অলংকারময় কবিতার মধ্য দিয়েই যে প্রকাশিত হবে, তারও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ভক্তিসাধক হয়তো তেমন অবস্থায়

শুধু চুপ করে চোখের জল ফেলবেন। সেক্ষেত্রে, চোখের জল-টুকুই অনিবার্য প্রকাশ। শব্দ বা শব্দসমাবেশের মধ্য দিয়ে, এবং ছন্দ, অলংকার ইত্যাদির সাহায্যে, নির্দিষ্ট কোনো শিল্প-প্রক্রিয়ার অধীনস্থ হওয়া সে-রকম চৈতন্যের অবশ্যপালনীয় কৃত্য নয়। যিনি কাব্যশিল্পে উৎসাহী, তাঁর পক্ষেই কবিতার পথে পরিক্রমা প্রাসঙ্গিক। ভেতরের প্রেরণা থেকে বাইরের প্রকাশ পর্যন্ত একটা দূরত্ব আছে বটে, কিন্তু সে ব্যবধান ঠিক স্থান-কালের নিত্য-অভ্যস্ত সহজদৃশ্য ব্যবধান নয়। আকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চোখে লাগে আলোর ছটা। তলিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে, আকাশ থেকে মাটিতে পৌঁছুতে বিদ্যুৎ-দীপ্তিকে খানিকটা পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু সে পথের দূরত্ব যেন বিদ্যুতের রশ্মি-ক্ষেপের দ্রুততার দ্বারা অন্তর্হিত। মনে যখন গভীর নাড়া লাগে, তখন গভীর বাণী জেগে ওঠে তেমনি বিদ্যুদ্বেগে। তারপর, শিল্পের ব্যাকরণবিদ্‌ হয়তো সেই স্বতঃস্ফূর্ত বাণী-রূপের পরিমার্জনে হাত দেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটি অভিজ্ঞতার কথা এই সূত্রে মনে পড়তে পারে। রামলোচন ঠাকুরের পত্নী অলকাসুন্দরীকে তিনি দিদিমা বলতেন। দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন আঠারো বছর, অলকাসুন্দরীর তখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্রনাথের কাছে সংসার শূন্য হয়ে গেল। তখনকার আত্মকথা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

আমি সুবিধা পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটি খুব নির্জন। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধিস্তম্ভ আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না; পার্থিব ও স্বর্গীয়, সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশান-

তুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্যের কিরণ-রেখা সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। সেই সময় আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটি বাহির হইল,—'হবে, কি হবে দিবা আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।'[৩]

এইটিই তাঁর প্রথম গান। কবিতা হিসেবে বিচার করলে ঐ উক্তিকে উচ্চাঙ্গের রস-সমৃদ্ধ তেমন কোনো সৃষ্টি বলে মনে হয় না, ঠিক কথা। তবু, এও যে মনের আলোড়নের ফল, তাতে সন্দেহ নেই। কাব্য-শিল্পের ব্যাকরণ জানা থাকলে স্বতঃস্ফূর্ত এই ভাষা-রূপকে তিনি প্রকৃত কবিতায় রূপান্তরিত করতে পারতেন। দেবেন্দ্রনাথ জ্ঞান-অজ্ঞানের যাবতীয় বৈপরীত্যের অনুভূতি ফোটাতে চেয়েছিলেন আলোর রূপক ব্যবহার করে : দিনের আলো অনেক কিছু দেখাচ্ছে বটে,—কিন্তু অনন্তের বোধ না জাগলে সবই যে বৃথা,—সবই যে অন্ধকার! এই ছিলো দেবেন্দ্রনাথের বক্তব্য। কথাটা আরো গভীর গান এবং আরো বেশি কবিতা হয়ে উঠতে পারে যদি কেউ অনুরূপ অবস্থায় গুন্ গুন্ করে বলেন—

আমার অন্ধ প্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে![৪]

ঐ একটি কলির মধ্য দিয়ে অনেক কথা সহজে বলা হয়ে গেছে। পূর্বপ্রসঙ্গ মনে রেখে তার্কিক হয়তো জিগেস করবেন—দেবেন্দ্রনাথ 'জ্ঞান' বলতে কি বুঝেছিলেন? হয়তো প্রশ্ন উঠবে রবীন্দ্রনাথের গানের কলিতে 'অন্ধ প্রদীপ' উক্তিটার অর্থ কি? কবিতার গুণগ্রাহীকে বলে দিতে হবে না যে, এই ধরনের প্রশ্নমালা কবিতাবোধের রাজ্যে নিরর্থক। বুকের ভেতরকার অবস্থা এই কটি মাত্র শব্দ-সাজাবার কৌশলের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যাতীতভাবে সার্থক প্রকাশ লাভ করেছে।

প্রবীণ, প্রতিষ্ঠিত কবিদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্তর থেকে একেবারে নবীনতম কবির আধুনিকতম জীবনানুভূতির প্রসঙ্গ অবধি

সর্বত্রই কবিতার সিদ্ধি এমনি বিস্ময়কর ব্যাপার! দৃষ্টান্ত হিসেবে এইবার একজন আধুনিক বাঙালী লেখকের আর এক রকম অনুভূতির নমুনা দেওয়া গেল—

রেফ্রিজেটরে কোয়াসা ছাড়ানো কমলা আহা
যেন বা কোমল ব্যক্তির মতো, স্পর্শ তার
এক্ষুনি যেন ফিস্ ফিস্ করে অনেক কথা
ডেকে ডেকে কানে কানে চুপি চুপি বলবে ;
রেফ্রিজেটরে চামড়া ছাড়ানো মাংস হাড়,
টমেটো চারটে, আপেল লাল্‌চে চেহারা তার,
দুটো শাদা শাদা কৌতুকভরা হাঁসের ডিম
যেন টেরা চোখে এক গাল হাসি হাসবে।[৫]

রেফ্রিজারেটারের ওপর কবিতা লেখবার দৃষ্টান্তটা খুব মৌলিক বা অভিনব মনে করবার কারণ নেই। মানুষ নিজের সমকালীন জগতের কথা বলতে ভালোবাসে। ঈশ্বর গুপ্ত রেলগাড়ির বিষয়ে পদ্য লিখেছিলেন,—মধুসূদনের চতুর্দশপদীগুলির মধ্যে 'সাগরে তরী' কবিতাটিও অনেকের চোখে পড়েছে। তেমনি একালের কবি লিখেছেন একালের বিজ্ঞানের কথা। রেফ্রিজারেটার ভালো না মন্দ জিনিস, মায়া না মতিভ্রম,—এসব প্রশ্ন হাস্যকর। এই রচনা পড়ে মনশ্চক্ষুর সাহায্যে শুধু এইটুকু দেখা গেল যে, তাতে অপেক্ষা করছে ঠাণ্ডা কমলালেবু, 'চামড়া-ছাড়ানো মাংস', চারটে পাকা টোম্যাটো, দুটো হাঁসের ডিম।

একটি ছবি ছাড়া এই রচনায় গুরুতর কোনো নীতিবাক্যও নেই, অধ্যাত্মচিন্তাও নেই। সেই ছবিটি কবির অকৃত্রিম আনন্দের বার্তাবহ। এবং বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন বলেই তিনি তাঁর দেখা উপকরণগুলি ভাষায় বলতে গিয়ে অনিবার্য এক ছন্দের সঞ্চার রুখতে পারেন নি।

৩

সকলেই স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'আমার অন্ধ প্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে' উক্তিটি মিথ্যে মনে হয় না। আবার এই আধুনিক কবির রেফ্রিজারেটারের কবিতাও বস্তু-সত্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষার আদর্শ পরিহার করেনি।

পর-পর এই দুটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে বোঝা গেল যে, কবিতা আনন্দ [অর্থাৎ গভীর অনুভূতি] থেকেই জন্ম গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়ত, সেই আনন্দ ভাষার মধ্যে তরঙ্গ সঞ্চার করে থাকে। সেই তরঙ্গ-ঘটনার চলিত নামটিই হলো 'ছন্দ'। তৃতীয়ত, কবিতা মানুষের বস্তু-পরিবেশের সঙ্গেও নিঃসম্পর্ক নয়। ভালো কবিতা পড়লে একথা মনে হয় না যে, কবি মিছে কথা বলছেন। আরো নমুনা দেখলে ক্রমশ এই ধারণাই বলবতী হয় যে, ভালো কবিতা সব সময়েই সত্যার্থী বা সত্যকাম। মিছে কথার ব্যসন যথার্থ কবির ধাতে সয় না। এই মন্তব্য থেকে কবিতার 'সত্য' সম্বন্ধে আরো গভীর প্রশ্ন জেগে ওঠা স্বাভাবিক। সে প্রশ্ন উপেক্ষা করা মূঢ়তা। তবে, সেটা বরং আরো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখা যাবে। আপাতত সত্যের সাক্ষাৎ অর্থটাই মনে রাখলে কাজে চলবে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে ও শব্দের প্রথম যে প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে সেইটাই ধর্তব্য। তিনি লিখেছেন 'সত্য' মানে 'প্রকৃত'।

এইবার মন্তব্যটি আরো সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে হয়তো বলা যেতে পারে—ভাষায় সচ্ছন্দ সত্যানুভূতির প্রকাশই কবিতা।

কিন্তু এও সিদ্ধান্ত নয়। কারণ, সত্যও আছে, অনুভূতিও আছে, ছন্দও আছে,—অথচ গভীর কবিতার স্বাদ জাগে নি, এমন দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়। যেমন—

নিদাঘ হইল গত সরস বরষাগত,
নবীন নীরদ-জালে নভোদেহ ঢাকিল ;

ঢালে জল মেঘদল,   ধরাতল সুশীতল
চাতক-পিপাসানল, নির্বাপিত হইল।[৬]

কিংবা—

তামসী হইল শেষ দিনেশ উদয়,
পরমেশ-গুণ গায় বিহঙ্গ নিচয়!
সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ ছলে,
মহেশ মহিমা ব্যক্ত করে মহীতলে।[৭]

এ-ধরনের ছন্দোবদ্ধ উক্তি শুনে মন সত্য খবরই পায় বটে, কিন্তু সে সত্য তো আনন্দের সত্য নয়!

আনন্দ যে অন্য রকম মর্জি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কবিতা সেই মর্জির প্রক্ষেপ, কবি সেই মর্জিরই নামান্তর। একজন বিখ্যাত সাহিত্যজিজ্ঞাসু প্রায় এই কথাই বলে গেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, আদর্শ কবি তাঁর বিশেষ শক্তির গুণে মানুষের সমস্ত সত্তাকে সক্রিয় করে তোলেন। কবিদের সেই শক্তির তিনি নাম দিয়েছিলেন—'কল্পনাশক্তি'। ভাবের সঙ্গে চিত্র এবং সংগীতের, এবং নানা সদৃশ ও বিপরীত বোধের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ঘটিয়ে কবির কল্পনা এক আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে তোলে। তাতে দেখা দেয়—অসাধারণ চিত্তব্যাকুলতা এবং অসাধারণ শৃঙ্খলার সমন্বয়—'a more than usual state of emotion with more than usual order'।[৮]

এই শৃঙ্খলার আইনই কবির আনন্দের ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণের বলে ভাব, ছবি, গান, স্মৃতি,—পাণ্ডিত্য, তর্ক,—রাগ, দ্বেষ, ভালোবাসা ইত্যাদি যাবতীয় সদৃশ এবং বিসদৃশ ব্যাপার পরস্পর মিলে মিশে কতো যে কবিতা হয়ে উঠছে! রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—

সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব আত্মহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।

পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ।
আলোক যেমন অলক্ষ্য কোন্ সুদূর কেন্দ্র হতে
অবিশ্রান্ত স্রোতে
নানা রূপের বিচিত্র সীমায়
ব্যক্ত হতে থাকে নিত্য নানা ভঙ্গে নানা রঙ্গিমায়
তেমনি যে এই সত্তার উচ্ছ্বাস
চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস।[৯]

এই উচ্ছ্বাসময় মর্জিটি যে কেমন, সেকথা আরো ভেবে দেখা দরকার।

১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৬—ইংরেজি হিসেবে সে হলো ১৯২৯ সাল। শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবীশের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের ঐ তারিখের একখানি চিঠিতে ঐ দিনের আবহাওয়ার খবর ছিল—'যদি চ আজ ভাদ্রমাসের মধ্যাহ্নের অসহ্য গরম তবু সর্বত্রই শরৎকালের মাধুর্য অজস্র, এইটাই যদি পরিপূর্ণ মনে ভোগ করে নিতে পারি তবে সেটাকে ফাঁকি বলতে পারব না—যদিও এর পরবর্তী ফাল্গুন মাসের সৌন্দর্য অন্য জাতের তবুও সেই বসন্তের দোহাই পেড়ে এই শরতের দানে খুঁৎ ধরে তার থেকে বৃথা নিজেকে বঞ্চিত করা কেন?'

কবিদের মর্জি যে কেমন অবস্থা, সেকথা ভাবতে হলে এই চিঠি দিয়েই ভাবনা শুরু করা যায়। সেই সঙ্গে আর একখানি চিঠির কথা মনে পড়ে। W. B. Yeats লিখেছিলেন Laura Riding-এর কাছে,—অন্য এক মহিলার কাছে সেই চিঠির প্রসঙ্গে কবি য়েট্স্ নিজেই জানিয়েছিলেন—

> লরা রাইডিং-কে আমি চিঠিতে জানিয়েছি যে, তার দলের কবিরা বড়ো বেশি চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী এবং সত্যবাতিকগ্রস্ত,—

জানিয়েছি যে কবিরা আসলে মিথ্যাবাদী হলেও সুপ্রিয় ; আর, কবিতার দেবী যাঁরা, তাঁরা ফুর্তিবাজ যুবজনেরই আলিঙ্গনে ধরা দিতে ভালোবাসেন।[১০]

কবিতার যাঁরা অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁরা ফুর্তিবাজ যুবজনেরই আলিঙ্গন-প্রত্যাশিনী। বেশি চিন্তা, বেশি যুক্তি, সত্যের দিকে অটুট গোঁড়ামি —এসব অত্যাচার তাঁদের ধাতে সয় না। ইংরেজিতে এরকম আরো অনেক উক্তি আছে। কিন্তু আপাতত ইংরেজি সুভাষণের কথা থাক্। বাংলা কবিতার প্রথম সাড়ে নশো বছর অর্থাৎ, খ্রীষ্টাব্দের ৯০০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত এইসব উৎপাতকে উৎপাত বলে স্বীকার করবার চৈতন্যই ছিলোনা। বৈষ্ণব কবিতায় যথেষ্ট কবিত্ব থাকলেও কবিতা সে রাজ্যেও ঠিক অনিমিত্ত স্বাধীন ব্যাপার ছিলো না। তত্ত্বের প্রসাধন হিসেবেই সেকালে কবিতার আদর দেখা গেছে। কোনো সুন্দরীর তেরছ চাহনিতে কোনো ফুর্তিবাজ যুবকের মন-কেমন-করবার কথা নয়, মহাজন-পদাবলীর যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা একবাক্যে বলেছেন যে, তাতে কেবল ভক্ত বৈষ্ণবদের ভক্তিমানসেরই প্রকাশ ঘটেছে। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকার যে নিত্যলীলা চল্‌ছে, মহাজন-পদাবলীতে নাকি সেই লীলারই আস্বাদন! রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রশ্নটি ছিল এই—

> 'সত্য করে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
> রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?'[১১]

তাহলে কি এই কথাই বলতে হবে যে, নানান্ দেশের নানান্ জগদ্বরেণ্য কবি হাল্‌কা মনে সত্যের বিরোধী কথাই কেবল বলে গেছেন? না, তা নয়। দিনরাত 'সত্য' 'সত্য' করে ব্যস্ত হয়ে সত্য-হারা চিন্তাশীলরা মিছেই নিজেদের শান্তি হারিয়ে থাকেন। বিশেষ কথা, বিশেষ রূপ বা বিশেষ তত্ত্ববোধ যখন বিশেষ কবিচৈতন্যের লালনে সার্থক আশ্রয় পায়, তখন তাকেই বলি কবিতা। সেই মর্জিটাই মূল কথা। কবির মনে যেটা খাঁটি ঠেকে, সেটাই সত্য। তাঁর মর্জিটাই সত্য-দর্শনের ইন্দ্রিয়! আর, মর্জি তো এক-রকম নয়। মানুষে-মানুষে মর্জি-ভেদ তো আছেই, এমন কি একজন মানুষেরও চিরকাল একই মর্জি থাকে না। এবং এক যুগের মর্জি যে অন্য যুগে বদ্‌লে যায়, সেকথা কেই বা না জানেন!

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাই॥

এ নদীর জলটুকু টলমল করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুরঝুর করে।
চাঁদ-মুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

এই ধরনের মর্জির নমুনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না, সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই,…।

এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত-পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো।[১২]

কবিতার রাজ্যে এই যেমন একরকম মর্জি দেখা গেল, তেমনি অন্য মর্জিও অসম্ভব নয়। পুরোপুরি এর বিপরীত মর্জিও দেখা যায়। ছড়ার মধ্যে ফুটেছে বালকের মন। তাতে না আছে বাঁধুনি, না আছে তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু প্রবীণরা অন্য রকম। তাঁরা যুক্তিতর্কের ওপর বেশি নির্ভর করেন। অবিমিশ্র ছবি দেখার খুশি তাঁদের ধাতে সয়না। হ্যাজলিট যাই বলুন, সাবালক মানুষের কাছে কবিতার সমাদর সত্যিই বিরল ঘটনা। কারো-কারো মনে তথাকথিত এই প্রবীণতার লক্ষণ এতো বেশি বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, তাঁরা কবিতা পড়তেই চান না। আবার যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের মধ্যেও মনোধর্মের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এইবার এই রকম প্রবীণস্বভাব একজন বাঙালী কবির কবিতার কথা উঠ্‌বে। তিনি নিঃসন্দেহে কবিমনের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত বুদ্ধিচর্চার ফলে তাঁর মনটাই তর্কপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। বাংলা সনেট রচনায় তাঁর যেমন নাম আছে, তেমনি অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদী হিসেবেও তাঁর খ্যাতির কথা সবাই জানেন। সনেট-কে তিনিই বলেছিলেন 'বিগাঢ়যৌবনা তন্বী'!

কথায় কথায় রসিকতা করা তাঁর স্বভাব ছিল। সনেটেও তিনি তাঁর এই পরিহাস-প্রীতির পরিচয় রেখে গেছেন। এতক্ষণে তাঁর নামটি অনেকেই অনুমান করেছেন বলে আশা করা যায়। অতঃপর আগে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিপরিচয় দিয়ে নিয়ে তাঁর সেই 'বিগাঢ়যৌবনা তন্বী' কবিতার স্বভাবটি দেখা যাবে।

হরগৌরীর কল্পনা তো আজকের সৃষ্টি নয়! দূর সময়ের ধারায় সে-রূপক এসে পৌঁছেছিল আঠারোর শতকের বাংলা দেশে। কিন্তু তবু ভারতচন্দ্র তার মহাত্ম্যের স্বাদ পাননি। হরগৌরীর 'আধ-মুখে

ভাঙ-ধুতুরা' আর, বাকি আধ-মুখে তাম্বুল চর্বণের ছবিতে তিনি যে রঙ্গরসের প্রগল্‌ভতা রেখে গেছেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তা লক্ষ্য করেছিলেন। হর-গৌরীর এক চোখে ভাঙের নেশা আর অন্য চোখে 'কজ্জলের' 'উজ্জ্বলতা'-র ছবিও সেই মেজাজের কীর্তি। গভীর ব্যাপারে লঘুতা আরোপের অভ্যাস ছিলো তাঁর। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য ঠিক সেই অনুপাতে হাল্‌কা হবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বৈ কি! পাবনা হরিপুরের চৌধুরী পরিবারের সন্তান তিনি; যশোরে তাঁর জন্ম; পাঁচ বছর বয়সে যশোর ছেড়ে নদীয়ায় গিয়েছিলেন। সেই বাল্যস্মৃতির পটে সেকালের নদীয়ার যে রেখাচিত্র ফুটেছিল তার মধ্যে তিনটি মানুষের একটি স্নানের ছবি আছে। 'আত্মকথায়' প্রমথ চৌধুরী নিজেই লিখেছেন সেকথা—'দুপুর বেলা বাড়ির সুমুখের পুকুরের একটি পিরালীবাবু দুটি স্ত্রীলোকের কাঁধে হাত দিয়ে স্নান করতে এলেন। এ ব্যাপারে মহা গোলমাল হতে লাগল, কারণ শুনলুম, তিনজনই নাকি সমান মাতাল।' এই কৃষ্ণনগরেই তিনি প্রথম জেগে উঠেছিলেন। মিশনরি-ইস্কুলে ঢুকে পাদরি সাহেবের কাছে যে-ভজনটি শেখা হয়েছিল, সে-ভজনের নমুনা শুনে তাঁর বাবা তাঁকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র-প্রভাবে কৃষ্ণনগর কতোটা রসিক হয়েছে, আর, কৃষ্ণনগর-প্রভাবেই বা ভারতচন্দ্র কতোটা রঙ্গস্বভাব পেয়েছিলেন, সে-বিষয়ে চূড়ান্ত গবেষণার দিন ফুরোয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালও ছিলেন কৃষ্ণনগরের মানুষ। মনে হয়, ব্যক্তি-প্রভাবের চেয়ে স্থানমাহাত্ম্যই যেন বেশি কাজ করেছে। সেই স্থানমাহাত্ম্যের ফলেই বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীর বাল্যকালে কৃষ্ণনগরের খ্রীষ্টান যাজক এই অদ্ভুত ভজনটি চালু করেছিলেন—

বন্যে এল ভেসে গেল, চাষার ডুবলো ধান,
শালাদের যেমন কর্ম তেমনি
শাস্তি দিলেন ভগবান।

কৃষ্ণনগরের সেকালের ভাষা ছিল মাধুর্যে-চাতুর্যে অতুলনীয়। কামার-কুমোর-ছুতোর-স্যাকরা-কলু-শুঁড়ি,—কৃষ্ণনগরের এই সব অধিবাসীদের সঙ্গে কথায়-কথায়,—মালোপাড়ার জেলে-মাঝিদের সঙ্গে আলাপে,—সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি উড়িয়ে, এবং এ-ছাড়া সমস্ত কাজের মধ্যে ভাষার দিকে কান-মন দুই-ই সজাগ রেখে প্রমথ চৌধুরী সেই শ্রুতিমধুর ভাষাটি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। নিজের কথা তিনি বাড়িয়ে বলেননি। 'আমার ভাষার বনেদ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনাগরিক ভাষা'—তাঁর এ-উক্তি অসঙ্গত নয়[১৪]।

অর্থাৎ যশোর বা পাবনার চেয়ে কৃষ্ণনগরের কাছেই তাঁর ঋণের পরিমাণ বেশি। তাঁর কবিতার সংখ্যা বা পরিমাণ বেশি নয়। কিন্তু কৃষ্ণনগরের ভাষার রূপ এবং ভাবের রুচি দুই-ই বজায় আছে তাতে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সংগীত, সাহিত্য—সর্ববিভাগেই সম্পন্ন ছিল সে-আমলের কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগরের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর এই বিশেষ প্রীতি লক্ষ্য করলে অনুসন্ধানী পাঠকের মনে একালের বিশ্ব-বিশ্রুত কবি এলিয়টের মন্তব্য জেগে উঠতে পারে। একদা এলিয়ট বলেছিলেন—প্রত্যেক কবিকেই তার নিজের আঞ্চলিক ভাষার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়।[১৫] প্রমথ চৌধুরীও তাই করেছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে কলকাতার হেয়ার ইস্কুলে,—সেখান থেকে কলেজে ঢুকে সেণ্টজেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজের দুই পর্বের মাঝে পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র হিসেবে তাঁর কিছুদিন কেটেছে। বিলেতে ব্যারিষ্টারি পড়া,—রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তাঁর

বিবাহ,—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপনা, বিভিন্ন জমিদারী-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ,—ব্যক্তিগত জীবনীর তথ্য হিসেবে এ-সব বৃত্তান্ত অবশ্যই স্মরণীয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল—এই দুই মনীষীর দুই ব্যক্তিত্বেরই প্রভাব লেগেছিল তাঁর মনে। কৈশোরেই তাঁর ফরাসী-শিক্ষা শুরু হয়। সংগীতে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। তাঁর 'রায়তের কথা'র এবং 'প্রাচীন হিন্দুস্থানে'র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গল্পসংগ্রহ 'আহুতি' তিনি শরৎচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। 'সবুজ পত্র' তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। বাংলা দেশের প্রায় চল্লিশ বছরের সাহিত্য-কর্মের [১৯০৫ থেকে ১৯৪৫] সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অন্তরঙ্গ, নিরবচ্ছিন্ন, ঐতিহাসিক!

অর্থাৎ তাঁর কথা অল্প কথায় শেষ হবার নয়। তাঁর গদ্যরীতিই কি কম বাদ-বিতর্কের কারণ হয়েছে? এখনো সে রীতির প্রশংসা এবং নিন্দা, দুই-ই শোনা যায়। তাঁর গল্পের খ্যাতি আছে, কিন্তু তাঁর কবিতার আলোচনা কমই হয়েছে। সেই কবিতার কথা মনে পড়লেই মন 'নিবিষ্ট হয় একটি সকৌতুক সংযমের শুদ্ধতায়। 'বিগাঢ়যৌবনা তন্বী'—কথাটা তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনে যখন তাঁর প্রথম কবিতার বই 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ছাপা হয়, তখনো গল্পকার হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা পাননি। অবশ্য বিদ্বান এবং রুচিবান হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সে আমলেও। প্রবন্ধের বই 'তেল-নুন-লকড়ি' বেরিয়েছে তার আগেই। গল্পের বই 'চার-ইয়ারী কথা' বেরুলো তার বছর তিনেক পরে,—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। মজলিশী স্বভাবের একজন বিদ্বান-শিল্পীকে দেখা গেল 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর লেখাগুলিতে। জয়দেব-কে উঁচু-দরের কবি

হিসেবে স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না তিনি। তবু তাঁর এই প্রথম কবিতার বইখানিতে ভাস, ভর্তৃহরি-র সঙ্গে জয়দেব-এর ওপরেও একটি চতুর্দশপদী ছাপা হয়েছিল। বাংলা দেশের পৌরুষ জয়দেবের কান্ত-কোমল পদাবলীর প্রতাপে অনেকটা অধঃপতিত হয়েছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

পাণির চাতুরী হ'ল নীবীর মোচন
বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন॥[১৬]

আর সেইসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে 'সভ্যতার প্রিয়শত্রু বার্নার্ড শ'-কে তিনি জানিয়েছিলেন—

মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাসো,—
অপরে বোঝে না, তাই নাটকেতে হাসো॥

*   *   *

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক![১৭]

এই দুটি কবিতা থেকেই তাঁর মনের বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। ভাবালুতা, উচ্ছ্বাস, বৃথা আবেগ, অবাঞ্ছিত কোমলতা, এ সব বরদাস্ত করতে নারাজ হয়েই তিনি আসরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর 'উপদেশ'-কবিতায় হাসতে হাসতে তিনি বলছিলেন:—

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালোবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,—
জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা।

কিন্তু লোকের কাছে 'বড়ো কবি' কিংবা 'ভাবুক কবি' আখ্যা পেতে হলে চাই অন্য আয়োজন,—চাই 'দরকারি ভাব আর সরকারি ভাষা।' তারপর—

যত যাবে মাটি আর খাঁটিকে ছাড়িয়ে,
শূন্যে শূন্যে মূল্য তব যাইবে বাড়িয়ে ॥[১৮]

রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকরণের দলে হারান নি তিনি। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর শেষ কবিতা 'আত্মকথা'য় এ বিষয়ে বিশেষ স্বীকারোক্তি আছে—

কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই!

সংহতির দিকে যাঁদের এতোই ঐকান্তিক আগ্রহ থাকে, শুরু থেকেই তাঁদের সাবধানে থাকতে হয়। বোধ হয় সেই কারণেই, বৃহৎ বিস্তারের অনুকূল রীতি বা কাব্যপ্রকার তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। 'বলাকা'-র ছন্দে তীব্র অথবা উচ্ছ্বসিত কোনো অনুভূতির কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। মধুসূদনের মতো দীর্ঘ প্রবাহে নানা উত্থান-পতনের বিচিত্রতা ফুটিয়ে তোলাও তাঁর সাধ্য ছিলো না। তাই তিনি পেত্রার্কা-র আদর্শে সনেট লেখাতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম কবিতায় নিজের আদর্শ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—

নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ।
বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার,
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
এ কথা পণ্ডিতে বোঝে মূর্খে লাগে ধন্ধ ॥

ভাস-কে বন্দনা জানিয়ে পৌরুষ-ঋজুতা-উৎসাহবোধের এই কবি লিখেছিলেন—

তব কাব্য গৌরবের ধরে ইতিহাস
তুমি জানো সমরস বীর ও করুণ।
সে শুধু কাতর, যার নয়নে বরুণ।
তোমার নাটকে তাই জ্বলে পরিহাস ॥'[১]

এ-সব কবিবচনে তত্ত্ব আছে, চিন্তা আছে, কৌতুক আছে,—কিন্তু সত্যিই এতে মন ভরে না। যে-মানুষ এতো সজাগ, সে-মানুষ আর একটু গভীরে নামলেন না কেন? প্রমথ চৌধুরীর কবিতা পড়তে-পড়তে এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। 'পদচারণে' এ প্রশ্ন অনুমান করে নিয়েই তিনি তাঁর আপন যুগের জবাব লিখে গেছেন। সে জবাবটি হলো এই—

এ যুগে কঠিন কবিতা লেখা,
কবিরা পায় না নিজের দেখা।

*　　*　　*

কবিতা কয়েদী রাধার মত
দায়ে পড়ে করে গৃহিণী-ব্রত।[২]

'জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি'র তিনি ছিলেন আজীবন বিরোধী। জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতির চর্চা করে আমাদের সেই পর্বের রবীন্দ্র-শাসিত বাংলা সাহিত্যে চিন্তার বিস্তার ঘটিয়ে গেছেন তিনি। মানুষের ভাবের সাম্রাজ্য জ্ঞানের পথিকরাও যে বাড়িয়ে থাকেন, প্রমথ চৌধুরী সে-কথা বলে গেছেন তাঁর 'মানব-সমাজ'-নামক সনেটে। Triolet, Terza Rima,—'গাথা সপ্তশতী' থেকে অনুবাদ ইত্যাদি বিচিত্র ব্যাপার তাঁর লেখায় কে-ই বা না লক্ষ্য করেছেন? 'চেরিপুষ্প', 'বনফুল', 'কাঁঠালী চাঁপা' প্রভৃতি ফুলের ফসলও তাঁর সৃষ্টির ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সে হলো কবির বিচিত্র বিষয়ের আগ্রহ, বিভিন্ন নিয়োগের কৃতিত্ব। তাঁর গভীর

কবিমনের প্রতীক্ষা আর সাধনার কথা ফুটেছে অন্যত্র—আভাসে, ইশারায়, মিতবচনে,—যেখানে তিনি 'সনেট-সুন্দরী'-র রূপ বর্ণনা করে লিখেছিলেন—

বিগাঢ়যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁটসাঁট ক্ষুদ্র।

সনেটের রূপে মুগ্ধ এবং গুণে ভক্ত এই কবি বলে গেছেন—'সন্তর্পণে করি তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ।'

কবিতার ভাব আর ভাষা, দু'দিকেই প্রমথ চৌধুরীর নজর ছিল তীক্ষ্ণ। ১৩২২-এর শ্রাবণ মাসে লেখা 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে কবিতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বেশ মজার কথা শুনিয়েছিলেন। মজার কথা, কারণ, তাঁর ভঙ্গিটাই ছিল মজা করে বলবার ভঙ্গি। পর-পর সূত্রবদ্ধ করে তিনি লিখেছিলেন—'কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত',—'কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে পান করে,'—'কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, এ কথা সকলেই জানেন',—'কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি'। এবং সেই সঙ্গে কবিতার অধ্যাপক-সমাজের বিরুদ্ধে তিনি একটি বিশেষ অভিযোগও প্রকাশ করেছিলেন। সেই অভিযোগটি প্রণিধানযোগ্য; একা তিনিই নন, আরো অনেকে অনুরূপ মন্তব্য জানিয়েছেন—

> কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাস্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস, কিন্তু স্কুল মাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাস্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে যাক, চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা

কাব্যের রূপ দেখতে পাই নে, শুধু তার গুণ শুনি। টীকা-ভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্য সম্বন্ধে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব জানি, কিন্তু সে যে কি বস্তু তা চিনিনে।[২১]

অর্থাৎ কবিরা যে আনন্দ থেকে কবিতা লেখেন, সেই আনন্দ [আবার মনে রাখা দরকার যে 'আনন্দ' মানে গভীর অনুভূতি, তা সুখও হতে পারে, দুঃখও হতে পারে] অনুভব করাটাই কবিতা-পাঠের লক্ষ্য। সেই আনন্দ যে-সব শব্দ, অলংকার, বা ছন্দের সাহায্যে প্রকাশিত হয়, সেই বাহনের বিশ্লেষণ নিয়ে বেশি ব্যস্ত হওয়াটা কিছু নয়। বাহন বিচারের একটা সীমা আছে। যাঁরা বেশি পণ্ডিত, তাঁরা ভুলে যান যে, সরস্বতীর ধ্যানে দেবীর হাঁসটার বিষয়ে অতি-চিন্তা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তাহলে কি কবিতার ব্যাখ্যান বা বিশ্লেষণ চলবে না? শুধু আনন্দই যথেষ্ট? কবিতার আত্মা যাই হোক, কাব্য যে শব্দকায়, তাতে কি কারো সন্দেহ আছে? প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—

যেমন কেবলমাত্র মনের আনন্দে গান গাইলে তা সঙ্গীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও তা কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনাশক্তি। মনের ভাবকে গড়ে না তুলতে পারলে তা মূর্তিধারণ করে না আর যার মূর্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হতে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ মিল ইত্যাদির গুণেই সে কায়ায় রূপ ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হলে শব্দজ্ঞান থাকা চাই, ছন্দ-মিলের কান থাকা চাই। এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনা চাই, কেন না সাধনা ব্যতীত কোনো আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না।[২২]

অতএব শুধু 'আনন্দময় আছি'-র অনুভূতিটুকু নয়,—আন্তরিক

অনুভূতির সাধনালব্ধ, যোগ্য প্রকাশের নাম কবিতা। পৃথিবীতে যতো ভাষায় যতো কবিতা আছে, সকলের মূলেই এই সত্য বিদ্যমান। অবিশ্যি অনুভূতিরও বৈচিত্র্য আছে, সাধনারও ইতরবিশেষ আছে। তারপর এক-এক দেশের এবং ভিন্ন-ভিন্ন যুগের রুচিরও তারতম্য আছে। মানুষের মন এক ছাঁচে গড়া নয়। কিন্তু এক মনের সঙ্গে অন্য মনের যতো প্রভেদই থাক না কেন, মন মাঝে-মাঝে দুলে উঠবেই। কবিদের মধ্যে কেউ সেই দোলার বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ জানিয়েই ক্ষান্ত হন, কেউ বা অনেক বলেন ;—কেউ বলেন আঁটসাঁট কথায়, কেউ ইনিয়ে-বিনিয়ে। এই সূত্রে একজনের কথা এইখানেই বলে নেওয়া সংগত হবে। পরিণত বয়সে বাল্যস্মৃতির পুনরুজ্জীবন কতো যে সুখ দেয়, কতো যে দুঃখও দেয়, সে বিষয়ে তিনি বলেছিলেন—

> জীবনে যখন নিরাশিষ বিচরণে
> একে একে যায় যা-কিছু মেনেছি প্রিয়,
> বাল্যে যে সুর ভালো লেগেছিল মনে
> ফিরে পেলে আজো মনে হয় বরণীয় !
> কতো যে কালের ঘুমন্ত ভাবনারা
> জেগে উঠে ফের জাগায় পুরোনো হাসি—
> সেই হাসিতেই অনেক কান্না ভোলা !
> মন ভুলে যায় এখন সে চোখ বাসি ![২৩]

এই তো মনের কথা! গভীর অনুভূতি মনের মধ্যে ঢেউয়ের মতন আসে। তারপর, একটি বিশেষ সুর যেন সমস্ত চৈতন্যকে বাজিয়ে তোলে। মনে হয়, সেই সুরটাই যেন সমুচিত প্রকাশ। মনে হয়, কথার কীই বা দরকার! তাই কবি বলেছেন—

ক্ষীণ সুকুমার ; হে সুর ! তোমার প্রেমে
ভাষা যে আপন চিহ্ন হারায় সুখে
কেন অনুভূতি বচন-সহায় হবে ?
তুমিই তো পারো পূর্ণ প্রকাশ হতে !
মৈত্রীর বাণী কোমলে কপটও হয়,—
প্রেমিকের বুলি আরো মিছে, আরো মিছে।
সুরের আকুতি বিশ্বাসঘাতী নয়,
সুরমায়া আহা কী মধুক্ষরা সে যে ![২৪]

হয়তো সুর পুরোপুরি নিজের পায়েই দাঁড়াতে পারে ! কিন্তু কবিতা তো সত্যিই সুরসর্বস্ব নয়। ভাবলে দেখা যাবে কবিতা যে শব্দকায়, এবং তার শব্দ সমাবেশ-ভঙ্গিটি যে সংগীতময়,—এই দুটি সত্য একই সঙ্গে স্বীকার্য। অনুভূতির প্রকার-ভেদের সঙ্গে সুরেরও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। মন কখনো নাচে, কখনো হাঁটে। কখনো মেঘ, কখনো রৌদ্র ! এই আলো-ছায়ার আলপনা আঁকা চিরকালের কবি-কল্পনার পথ ধরে দেশে-দেশে, কালে-কালে কোথায় চলেছেন অনন্তবিলাসময়ী কাব্যলক্ষ্মী ? কোন্ অনন্তে চলেছেন, তা কে বলবে ? আমাদের দেশের পণ্ডিতরা বলেছেন লৌকিক হৃদয়ভাবগুলি রসসত্তে পরিণত হচ্ছে। ভালবাসার ভাব, হাসির ভাব, দুঃখের ভাব, রাগের ভাব ইত্যাদি যাবতীয় লৌকিক ভাব থেকে কাব্য অংকুরিত হচ্ছে, কুসুমিত হচ্ছে। তার মানে, বিশেষ মনের বিশেষ অনুভূতি সমবেদনাময় রসিক মন মাত্রেরই উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠছে। একদিকে প্রতিদিনের জগৎ, অন্য দিকে কাব্যের জগৎ—এই দুই জগতের মধ্যে তাহলে সম্পর্কটা কী রকম ? আমরা বলবো ওদের মধ্যে আছে ভাবের সঙ্গে রসের সম্পর্ক—লৌকিকের সঙ্গে অলৌকিকের,—অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের ! য়ুরোপের পরিভাষায় বলা যেতে পারে ওরা হলো

'analogues'[২৫]। তবে এ তর্ক অবান্তর। কবিতা আনন্দের সামগ্রী, এবং সে আনন্দ মনের স্পর্শশক্তি বাড়িয়ে দিয়ে যায়—এটুকু মেনে নিতে পারলেই যথেষ্ট। কবিতা ততোধিক কিছু, যাঁরা একথা প্রমাণ না করতে পারলে অসুখী থেকে যান, তাঁরাই আরো মাথা ঘামিয়েছেন। অনেক দিন আগে গ্রীসে প্লেটো ছিলেন এই ধরনের মানুষ। তিনি এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, ভগবানকে অহিতের দোসর করে গড়বার অধিকারটা কবিদের কে দিয়েছেন? সেকালের গ্রীসের কবিদের কাব্যে প্লেটোর অভিযোগের কারণ ছিলো। কবিরা অশুভ দেবতার ছবি এঁকেছিলেন। অ্যাকিলিসের মতো বীরের মুখে করুণ বিলাপোক্তি দেওয়া হয়েছিল। অতএব কাব্য দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, সুতরাং আদর্শ রাষ্ট্রে কবির আদৌ জায়গা নেই—এই ছিলো প্লেটোর মূল কথা।

শুধু তাই নয়। প্লেটো দার্শনিক সত্যবোধের কষ্টিতে কবিতার উপযোগিতা বিচার করতে চেয়েছিলেন। মানুষের ইন্দ্রিয়বোধে এ জগৎ পরিবর্তনশীল। জন্ম-মৃত্যুর জোয়ার-ভাঁটায় আসা-যাওয়ার অশেষ খেলা চলেছে এখানে। কিন্তু সত্য কখনোই নশ্বর হতে পারে না। একই সৌন্দর্য-সত্যের অশেষ প্রতিভাস দেখা যাচ্ছে বিচিত্র সুন্দর বস্তুর মধ্যে। কবিরা আবার সেই সব খণ্ড বস্তুর অনুকরণ করছেন। অতএব তাঁরা আসলের ছায়ার নকল করছেন। প্লেটোর এই অভিযোগ তার্কিক মানুষের তর্কের খোরাক জুগিয়েছে। আমরা, একালের মানুষরা অসংকোচে বলতে পারি যে, প্লেটো যে-সময় এ কথা বলেছেন, তখন তাঁর কবিতাবোধের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। হোমারের কাব্য যে তাঁর ভালো লাগ্‌তো, সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন।[২৬] উত্তরকালে সুনীতি এবং সত্যের অতিরিক্ত দুর্ভাবনায় পড়ে তিনি অন্ধ চোখের এবং অন্ধ মনের শাসনে আত্মহারা হয়েছিলেন।

বস্তু-জগতের সঙ্গে কাব্য-জগতের একটা সম্পর্ক যে আছে, সে

কথা মানতেই হবে। কিন্তু কবিতা না অনুকরণ, না প্রপঞ্চজাল থেকে মোক্ষে পৌঁছোবার দুশ্চিন্তা! কবিতা অনুভূতির শব্দতরঙ্গ!

মানুষের গভীর অনুভূতি খানিকটা সুর সঙ্গে নিয়ে আসে। এবং সেইখানেই কাব্যশিল্পে ভেজালের প্রথম সম্ভাবনা। অনেক অনুভূতিহীন কথা অনুভূতির ভেক নিয়ে ছন্দ-অলংকারের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সরল পাঠকের বুদ্ধি-নাশ ঘটিয়েছে। যেহেতু কবিতা সুরময় [তা সে সুর গম্ভীর হোক বা চটুলই হোক], সেই কারণে সুরের ওপরেই সব জোর দিয়ে একদল লোক ছন্দের ঝুমঝুমি, করতাল, ঢাক, ঢোল, তবলা, মৃদঙ্গ —যাতে সুবিধা বুঝেছেন, তাই-ই বাজিয়েছেন। এবং তা থেকে, অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে অনেকে মনে করেছেন যে, কবিতা মানেই চাঁদ, প্রেম, যক্ষ, ঘুম, স্বপ্ন ইত্যাদির মিল-বাঁধা রুম্‌ঝুম্‌ বাজনা। আমরা অনুভূতির খাঁটি সুরটাকে আলাদা করে চিনে নেবার শক্তি হারিয়েছি। সেই সুরের এবং সেই সুরাশ্রিত শব্দ, শব্দবন্ধ, অলংকার ইত্যাদির ব্যাকরণ উপলব্ধি করতে হলে আদিতেই এই বিশ্বাস মনে রাখা দরকার যে, কবিরাও আইন মানেন,—কাব্যের রাজ্যেও নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। তাঁরা ভাব নিয়ে [সাধারণত যে-অর্থে 'ভাব' কথাটা ব্যবহার করা হয়, এখানে সেই অর্থেই] কাজ করেন। ভাষার মধ্য দিয়ে ভাবের বিশেষ বন্দোবস্ত ঘটানোটাই কবিত্বের বিশেষ কাজ। একুশ বছর বয়সে জগতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মনে এই ভাবনাটি আশ্রয় পেয়েছিল। তারপর নিরন্তর তিনি এই বন্দোবস্তের কথা ভেবেছেন। তাই তাঁর কবিতা এতো বিচিত্র ভঙ্গির,—এতো অশেষ বিস্ময়ের! কবিতার রাজ্যে আনন্দ প্রকাশের ব্যাকরণ কেবলই বদলাচ্ছে। মধুসূদনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কাব্যরীতির পার্থক্য আছে। তার আসল কারণ, ভাবের প্রকাশে প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক দেশের পৃথক-পৃথক

আয়োজনের সত্যিই দরকার আছে। একুশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> বড় বড় কবিদিগের লেখা দেখিয়া আমরা অধিকাংশ সময়ে এই বলিয়া আশ্চর্য হই যে, 'এ ভাবটা আমার মনে কত শতবার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আমি ত স্বপ্নেও মনে করি নাই এ ভাবটাও আবার এমন চমৎকার করিয়া লেখা যায়!' অনেকের মনে ভাব আছে অথচ ভাব ধরা দেয় না, ভাব পোষ মানে না; ভাবের ভাব বুঝিতে পারা যায় না। আইস, আমরা অনবরত বুঝিতে চেষ্টা করি। মনোরাজ্যে এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া লই যে, বাজে খরচ না হয়।[২৭]

কবির অনুভূতির সঙ্গে মননও যোগ দিতে পারে। কথার মধ্য দিয়ে সুর এবং ছবি দুই-ই সেই অনুভূতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে দেখা দেয়। ছবি, সুর, মনন, এই তিন উপাদানের সমন্বয়-রহস্যটাই হলো কবির শিল্প-কৌশল। আমরা তাকেই বলেছি কবির আনন্দের ব্যাকরণ। কবিতার এই তিনটি উপাদানের, অর্থাৎ মনন, সুর এবং চিত্রগুণের ত্রি-সত্য যুগে যুগে স্থায়ী হলেও প্রত্যেক দেশেই মানুষের পরিবর্তনশীল মনোভাবনার হ্রাস-বৃদ্ধি-বিভিন্নতা অনুসারে সমুচিত ভাষার, সমুচিত সুরের এবং সমুচিত চিত্রের নিত্য অনুসন্ধান চলেছে কবিদের মনে-মনে। মনোরাজ্যের সেই বন্দোবস্তের প্রয়াস-প্রযত্নটা বোঝা দরকার। কবিরা চিত্তবৃত্তির কারবারী। তাঁরা ভাবের অনুভূতি নিয়ে রসের সৃষ্টিলোকে এগিয়ে চলেছেন। কেউ-কেউ সফল হয়ে দিগ্বিজয়ী হয়েছেন। তাঁদের মৃত্যুর পরেও অনুভূতিশীল পাঠকের মনে যুগ-যুগান্ত ধরে তাঁরা অমর হয়ে থাকেন। কেউ শতজীব, কেউ বাঁচেন সহস্র বৎসর। কিন্তু বেশির ভাগই যান সর্বভুক্ বিস্মৃতির জঠরে।

কেনই বা মরেন ? কেনই বা বাঁচেন ? ভাবের বন্দোবস্ত ব্যাপারে যাঁরা চিরকালের মানুষের দিকে নিত্যজাগর, অথচ নিজের দেশ-কালকেও যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁদেরই জন্মলগ্নে বৃহস্পতির শুভজ্যোতিঃ দেখা দেয়। মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন—

জয় কবি ! জয় হৃদয়-জেতা !
দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা !
চিদ্‌-রসায়ন প্রচেতা ! জয় জয় ![২৮]

এবং রবীন্দ্রনাথের সেই 'বন্দোবস্তে'র বিস্তার দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল—

কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজো আপন রাজ্যে, কবির পূজো সব দেশে।[২৯]

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ১৮৮৩, ২১শে জুলাই-এর বিবরণ।

২। চৈতন্য চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মধ্যলীলা, ২০।১০।

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত, পৃঃ ৪৬।

৪। গীতবিতান : 'বিচিত্র' দ্রষ্টব্য।

৫। মুস্কিল আসান : শ্রীদিলীপ রায় [১লা আষাঢ়, ১৩৬১] ; 'ক্রিজিডিয়র' থেকে উদ্ধৃতি।

৬। সদ্ভাবশতক : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—'বর্ষা'।

৭। ঐ—'প্রভাতকালে মনুষ্যের প্রতি উপদেশ'।

৮। Biographia Literaria—Coleridge।

৯। 'পাখির ভোজ'—আকাশ-প্রদীপ : রবীন্দ্রনাথ।

১০। "I wrote to Laura Riding,......that her school was too thoughtful, reasonable and truthful, that poets were good liars who never forgot that the Muses were women who liked the embrace of gay, warty lads."

১১। সোনার তরী : রবীন্দ্রনাথ—'বৈষ্ণব কবিতা'।

১২। 'ছেলেভুলানো ছড়া'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩। এই অধ্যায়ে ৪৫-এর পৃষ্ঠায় হ্যাজলিট সম্পর্কে যে উল্লেখ করা হয়েছে, বইয়ের পরবর্তী অংশে তার বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৪। আত্মকথা : প্রমথ চৌধুরী।

১৫। এই বইয়ের 'কথা আর সুর' প্রবন্ধের ৯-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। 'জয়দেব'।

১৭। 'বার্নার্ড শ'।

১৮। 'উপদেশ'।

১৯। 'ভাস'।

২০ 'কবিতা লেখা'।

২১। 'সাহিত্যে খেলা'—প্রমথ চৌধুরী।

২২। বর্তমান বঙ্গসাহিত্য—ঐ।

২৩। Thomas Moore-এর Irish Melodies-এর 'On Music' কবিতার প্রথম স্তবকের অনুবাদ।

২৪। ঐ তৃতীয় স্তবকের অনুবাদ।

২৫। "There is plenty of connection between life and poetry, but it is to, so to say, a connecton underground. The two may be called different forms of the same thing: one of them having (in the usual sense) reality, but seldom fully satisfying imagination : while the other offers something which satisfies imagination but has not full 'reality'. They are parrllel developments which nowhere meet, or, if I may use loosely a word which will be serviceable later, they are analogues. Hence we understand one by help of the other, and even, in a sense, care for one because of the other ; but hence also, poetry neither is life, nor, strictly speaking, a copy of it."—'Poetry for Poetry's sake' : A. C. Bradley.

২৬। "I confess I am checked by a kind of affectionate respect for Homer, of which I have been conscious since I was a child."—Republic-এর দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৭। রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বইখানির 'ছোট ভাব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৮। 'শ্রদ্ধা-হোম'।

২৯। 'আভ্যুদয়িক'।

কথা আর সুর

আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি মুর যেমন কথা-নিরপেক্ষ সুরের স্বাতন্ত্র্যের কথা তুলেছিলেন, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও তেমনি প্রথম যৌবনে 'সংগীত ও কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে কবিতা এবং সংগীতের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন।[১] সে প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে, 'কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা।' তিনি বলেছিলেন—'বিশ্বাসের শিকড় মাথায়, আর উদ্রেকের শিকড় হৃদয়ে। এই জন্য, বিশ্বাস করাইবার জন্য যে ভাষা, উদ্রেক করাইবার জন্য সে ভাষা নহে। যুক্তির ভাষা গদ্য আমাদের বিশ্বাস করায়, আর কবিতার ভাষা পদ্য আমাদের উদ্রেক করায়।' এইভাবে কবিতা, সংগীত এবং গদ্য, একে-একে এই তিনটি প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছিল। অতি সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি কবিতার স্বরূপ বুঝিয়েছিলেন। আগে তাঁর সেই উক্তিটি দেখে নেওয়া দরকার। তিনি লিখেছিলেন—

> আমি যাহা বিশ্বাস করিতেছি তোমাকে তাহাই বিশ্বাস করান, আর আমি যাহা অনুভব করিতেছি তোমাকে তাহাই অনুভব করান—এ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করিতেছি, একটি গোলাপ সুগোল, আমি তাহার চারিদিক মাপিয়া জুকিয়া তোমাকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে গোলাপ সুগোল,—আর আমি অনুভব করাইতে পারি না যে গোলাপ সুন্দর। তখন কবিতার সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়। গোলাপের সৌন্দর্য আমি যে উপভোগ করিতেছি, তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্য-ভাবের উদ্রেক হয়। এইরূপ প্রকাশ করাকেই বলে কবিতা।

এই দৃষ্টান্তের পরে তিনি আবার স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন—

আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি উপকরণ আছে—কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। ...সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই। ...কবিতায় আমরা বাছিয়া বাছিয়া কথা লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি।

কথায় কথায় 'ম্যাথ্যু আর্নল্ডের 'Epilogue to Lessing's Laocoon'—কবিতার মর্মকথা আলোচনা করে, পর-পর গায়ক, চিত্রকর এবং কবি, এই তিন শিল্পীর সাধনার পার্থক্য সম্বন্ধে ম্যাথ্যু আর্নল্ডের মন্তব্য তিনি অংশতঃ অনুমোদন করেছিলেন। তাঁর আংশিক মতবৈষম্যের ক্ষেত্রটি বিশদ করবার জন্যেই এখানে আর একটু উদ্ধৃতি অপরিহার্য। ম্যাথ্যু আর্নল্ড কতকটা এই বলেছিলেন যে, সংগীত এবং চিত্র চলমান মুহূর্তের সৌন্দর্যকে স্থায়িত্বের বাহন দেয়। অপর পক্ষে, কবির দায়িত্ব যে ততোধিক গু দায়িত্ব, তাতে তাঁর সন্দেহ ছিলোনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

চিত্রকরের ন্যায় মুহূর্তের বাহ্যশ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া—জীবনের গতি-স্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়। ভাব হইতে ভাবান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়। ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগর-সঙ্গম পর্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হয়। কেবলমাত্র স্থির আকৃতি তিনি চিত্র করেন না, এক সময়ের স্থায়ী

> ভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না, গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সঙ্গে তাঁর নিজের মতের পার্থক্য দেখিয়েছিলেন এইভাবে—

> ম্যাথিউ আর্নল্ডের মতে চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সংগীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সংগীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই ব[illegible], গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই। সংগীত ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য। উভয়ে যমজ ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান, কেবল উভয়ের শিক্ষার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ সংগীতের সঙ্গে কবিতার যমজ-ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ঘোষণা করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রবন্ধটির শেষ দিকে যা লিখেছিলেন, তা ম্যাথ্যু আর্নল্ডের প্রতিবাদ নয়। তিনি জানিয়েছিলেন যে, দুটি এক শ্রেণীরই সামগ্রী বটে, কিন্তু আমরা দুটিকে ঠিক একভাবে দেখি না। যে বিশেষ বিষয়ে কোনো বিশেষ কবিতা লেখা হচ্ছে, সেই বিষয়টির স্বাধীন ভাবনা-কল্পনা আমরা কবিতার ক্ষেত্রে সমর্থন করে থাকি, কিন্তু গানের বেলায় করি না। কবির বরং অনেক স্বাধীনতা আছে—ঠিক অলংকার-শাস্ত্রের আইন-কানুনে তাঁকে আজকাল আর বন্দী থাকতে হয় না,—নব-রসের অকাট্য তেমন কোনো বাঁধন নেই একালে। তাঁর নিজের দেওয়া দৃষ্টান্ত দিয়েই প্রসঙ্গটি পরিস্ফুট করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন—

> যেমন সন্ধ্যার বিষয়ে কবিতা রচনা করিতে গেলে কবি

সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করিতে থাকেন ও তাঁহার প্রতি কথায় সন্ধ্যা মূর্তিমতী হইয়া উঠে, তেমনি সন্ধ্যার বিষয়ে গান রচনা করিতে গেলে রচয়িতা যেন চোখ কান বুজিয়া পুরবী না গাহিয়া যান, যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন, তাহা হইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাঁহার সুরও আপনা আপনি নামিয়া আসিবে, ফুরাইয়া আসিবে। প্রত্যেক গীতিকবিদের রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাল্মীকি, গানের কালিদাস জন্মগ্রহণ করিবেন।

গান যে এখনো কবিতার মতো স্বাধীন হয়নি, সে কথা রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধটিতেই বার-বার স্বীকার করেছেন এবং সেই সূত্রে গানের মতো অবস্থায় পড়লে কবিতার কী দুর্দশা হতো, সে বিষয়ে কৌতুকজনক একটি পরিস্থিতির নমুনা দিয়েছেন। তাঁর ঐ একটি প্রবন্ধ থেকেই অনেক উদ্ধৃতি তুলতে হলো। এবং এই সূত্রে সেখান থেকেই আরো একটি উদ্ধৃতি অপরিহার্য—

> এখন সংগীত যেরূপ হইয়াছে, কবিতা যদি সেইরূপ হইত, তাহা হইলে কি হইত? মনে কর এমন যদি নিয়ম হইত যে, যে কবিতায় চতুর্দশ ছত্রের মধ্যে বসন্ত, মলয়ানিল, কোকিল, সুধাকর, রজনীগন্ধা, টগর ও দুরন্ত এই কয়েকটি শব্দ বিশেষ শৃঙ্খলা অনুসারে পাঁচ বার করিয়া বসিবে, তাহারই নাম হইবে কবিতা বসন্ত;—ও যদি কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ কবিদিগকে ফরমাস করিতেন, "ওহে চণ্ডীদাস, একটা কবিতা বসন্ত, ছন্দ ত্রিপদী আওড়াও ত!" অমনি যদি চণ্ডীদাস আওড়াইতেন—
>
> বসন্ত মলয়ানিল রজনীগন্ধা কোকিল
> দুরন্ত টগর সুধাকর—

মলয়ানিল বসন্ত, রজনীগন্ধা ... বসন্ত
সুধাকর কোকিল টগর।

ও চারিদিক হইতে "আহা" "আহা" পড়িয়া যাইত, কারণ কথাগুলি ঠিক নিয়মানুসারে বসান হইয়াছে; তাহা হইলে কবিতা কতকটা আধুনিক গানের মত হইত।

ম্যাথ্যু আর্নল্ডের যে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর একুশ বছর বয়সের ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, সেটি প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। সেই বয়সেই রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র মতো একটি ছোটো কবিতায় আর্নল্ড কবিদের জন্যে এক সতর্কবাণী প্রচার করেছিলেন। বঙ্গানুবাদে সেটি এই রকম দাঁড়াবে—

কবিদের প্রতি সতর্কবাণী

যখন কবিরা বিনা অনুভবে রচনা করে,
না পায় সৃষ্টিসুখ,
জেনো দুনিয়াও প্রতিদানে তার না দেয় ফিরে
সে লেখা ভাবার সুখ।[২]

অনুভূতি কেবল কবিদেরই সুমান্য নন,—অনুভূতি ছাড়া চিত্রকরও অসার্থক, গায়কও ব্যর্থ। কবি এবং গায়ক উভয়েই যেমন সুরস্রষ্টা,—সুর কথাটা একটু ব্যাপক অর্থে নিলে—অর্থাৎ কেবল কানে শোনবার সুর নয়, যে অন্তর্লীন সামঞ্জস্য মনেও অনুভব করা যায় তাকেও যদি সুর বলতে আপত্তি না হয়, তাহলে চিত্রকরকেও সুর-স্রষ্টা বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটির কথা বলেছিলেন, আর্নল্ডের সেই Epilogue to Lessing's Laocoon-এ কবি আর্নল্ড তাঁর একদিনের ভ্রমণ

এবং ভাবনার কথা ছন্দে বেঁধে গেছেন। লণ্ডনের হাইড পার্কে একদিন সকালে এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে তাঁর মনে পড়েছিল ঐ সব প্রসঙ্গ। বন্ধুটি জিগেস করেছিলেন কবিতার তুলনায় সংগীতের কৃতিত্ব যে বেশি দেখা যায়, তার কারণ কী? পণ্ডিত বন্ধুটি আরো বলেছিলেন—দেখো, কবিতার দেশ পুরাকালের গ্রীসেতেও পথে ঘুরতে-ঘুরতে প্রশংসা করবার মতো যতো মর্মরমূর্তি পসানিয়াসের চোখে পড়তো, তিনি যদি চাইতেন তাহলে ঠিক সেই অনুপাতে ভালো কবিতা তিনি পেতেন না,—সে দেশে কবিতার সংখ্যা যদিও কিছু কম ছিলো না। বন্ধুটি পুরাকাল থেকে তাঁর নিজের কালে চোখ ফিরিয়ে গ্যেটে এবং বার্ডস্বার্থের নামে প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেন যে, ঐ মুষ্টিমেয় কৃতীদের কথা স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু, গানের রাজ্যে মোজার্ট, বেঠোফেন, মেণ্ডেলসনের মতো যাঁরা সম্রাট, তাঁদের তুলনায় কবিদের কৃতিত্ব সত্যিই কম!

পথ চল্‌তে-চল্‌তে সেদিন আর্নল্ড দেখেছিলেন ঘাসের সবুজে ইংলণ্ডের মে-মাস তখনো সতেজ! এল্‌ম্ গাছে লেগে আছে ফুর্তির আমেজ,—ছায়ায় গরুর পাল বিশ্রামরত,—মাছির গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল গ্রীষ্ম-ঋতুর হাওয়ায়! সেই রোদে উজ্জ্বল সকালে দক্ষিণের বাতাস লেগেছিলো তাঁর গায়ে। আর, তিনি বলে উঠেছিলেন—ওহে দেখতে পেয়েছি চিত্রকরের শিল্পের সীমানা!

দেখো, দেখো—বলি,—চিত্রীর ক্ষেত্রটি
সেই শিল্পের সীমানা যে দেখা যায়!
চলমান দল, গ্রীষ্মের এ সকাল—
ঘাস ও এল্‌ম্, ফুলধরা কাঁটা-গাছ,
গরু-মহিষের বসা ও দাঁড়ানো রূপ—
গাগুলো তাদের ঝক্‌ঝকে, চোখে মায়া!

এইসব, এইসবই বা আরো যা বড়ো
এইমতো চাই এক চাহনিতে ধরা।
বাইরে যা দেখি, তারই সাদৃশ্যে সাধ—
প্রাণবাহিনীর এক লহমার প্রাণ।
তাই যদি হয়, তাহলে সে লহমাটা
ঠিক বাছ্‌লেই চিত্রীর সম্মান।[৩]

দৈবী শক্তির বলে চিত্রকর সেই বিশেষ লগ্নের কাহিনী ব্যক্ত করুন—এই ছিলো আর্নল্ডের মন্তব্য।

যাই হোক্‌, আবার তিনি ভাবতে-ভাবতে হাঁটতে লাগলেন। চল্‌তে-চল্‌তে তাঁরা এসে পৌঁছোলেন পুলের ওপর। বাতাস কখনো দম্‌কা, কখনো স্তব্ধ। পুলের নীচে দেখা যায় বাগান। সেখান থেকে হাওয়া খেলে যাচ্ছে উজ্জ্বল জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। দূরে ইমারতে, মিনারে আলো-হাওয়ার অবাধ ঢেউ! বাতাসে শব্দ! বেড়াতে-বেড়াতে মনে রয়েছে এইসব কথা; হাওয়ার শব্দ কানে বাজছে। সেই অবস্থায় তিনি বলে উঠলেন—সংগীতের জগৎটা তো এমনিই,—এই রকমই। ঐ মঠে যেমন বড়ো বড়ো মনোভাবনার আশ্রয়, গানেও তো সেই রকম। অবশ্য সংগীতের স্রষ্টাকে মনঃস্রোতস্বিনীর একটি কোনো বিশেষ ঢেউ বেছে নিতে হয়,—একটি কোনো বিশেষ স্পন্দন।

অনুভূতির একটি কোনো কাঁপন ঘিরে
সুন্দরের যে নির্ঝর রুদ্ধ রয়,
স্রষ্টা তারই মুক্তি রচে গানের স্রোতে।
গানেই সেই না-যায়-বলা বাণীর জয়!
সেই ঢেউয়ের চাই সঠিক নির্বাচন
এবং সেই গভীরে সুখে নিমজ্জন![৪]

সাধ্যাতীত লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যে কবির বক্তব্য যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা অনুবাদে এখানে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা নেওয়া গেল। অতঃপর ম্যাথ্যু আর্নল্ডের ভাবনার স্রোত দেখা যাক্। তিনি বেঠোফেনের সৃষ্টি-রহস্যের কথা ভাবলেন। দুটো মাত্র শব্দ বেছে নিয়ে সুর-স্রষ্টা বেঠোফেন কী গভীর বিষাদ-কারুণ্যের সুরমায়া সৃষ্টি করেছিলেন! সীমার বাঁধনে বাঁধা কথার ঢেউয়ের মধ্যেই দেখা দিলো অসীম! এলো নবযৌবন! চিরকালের মুক্ত, প্রাণবন্ত, হৃদয়াবেগের মতো সেই বাণীমূর্তি যেন জ্বলতে লাগলো।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চল্‌লেন তাঁরা। দূরে রইলো গোচারণের মাঠ, শোনা গেল দূর থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ গীতালাপ। কাছের দৃশ্যে শুধু মানুষ আর মানুষ। কেউ বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ হাঁটছে। কেউ বা জোরে ঘোড়া হাঁকিয়েছে, কেউ বা আস্তে। কেউ সুখী, কেউ সুন্দর, কারো বা যৌবন, কারো বা জরা। কেউ চলেছে শূন্য মনে, কেউ বা ভাবতে-ভাবতে। হাসতে-হাসতে কথা বলছে কেউ। ঘাড় নাড়া, আর, মৃদু হাসি,— অভিবাদন, আর, বিদায়-সম্ভাষণ! তারই মধ্যে ঝরছে দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রু। সব চলে যায়,—দ্রুত ভেসে যায়! কোথা থেকে আসে? কোথা যেতে চায়? আর্নল্ড বললেন—ঐ দেখো কবির দায়িত্ব; ঐ তো কবিতার [illegible]ত্র!—কিন্তু এ শিল্পের জায়গা নিতে পারে, এমন তো আর দ্বিতীয় দেখিনা।

কারণ, কবিকে একাধারে দুই-ই হতে হয়। চিত্রকরের মতো মুহূর্তের ছবির রস জাগিয়ে তোলা, এবং সুরকারের মতো বিশেষ অনুভূতির সুর বাজিয়ে তোলা এই দু'কাজেই তাঁর যোগ্যতা থাকা চাই—

> কারণ, হায়রে কতো কাজ তাকে করতে হয়
> চিত্রণে পটু, দক্ষতা চাই সংগীতে-ও।

এক লহমার দৃশ্যকে পটে ধরতে হয়—
এক লহমার গাঢ় অনুভূতি জানতে হবেও।
মানি বটে ঠিক ছবির মতন স্পষ্ট নয়।
মানি তার কথা গানের মতনও গভীর নয়।
কিন্তু শব্দে যতোটা ফোটানো সাধ্য হয়,
বাণীর গম্য সে অতলে তাকে নামতে হয়।
এবং আরো তো, আরো দাবী রাখে যে হয় কবি—
জীবনের গতি আঁকবে কবিতা চলচ্ছবি ॥

টুক্‌রো টুক্‌রো অংশে ছড়ানো ছিন্ন নয়,
একটি সুতোয় সবই আবদ্ধ জীবনময়।
ধরবে সে সব জীবনের গতি এ-বিশ্বের।
দুঃখ-সুখের, বিরতির কথা,—সংগ্রামের।
দৃষ্টি চলুক্ প্রসারিত রূপ-বিচিত্রায়।
প্রবাহিত নানা অথির দৃশ্যে কবির মন।
সে অভিনিবেশ মানে না ক্লান্তি এই ধরায়
আদি-উৎসের ধারা সে দেখুক্,—চিরক্ষণ
পরিবর্তন চলে অফুরান বর্ষ-স্রোতে
দেখুক্-মধ্যে, দেখুক্ অন্তে, কী মৌনে শমে শান্ত হয়।

ঐ পশুদল ঘাস ছেড়ে উঠে চলন্ত—
ওদেরও সঙ্গে হোক্ সাথী হোক্ কবির মন।
নুয়ে-নুয়ে হাঁটে দুঃখীর মন নিভন্ত—
ভিড় ঠেলে-ঠেলে তারও সাথী হোক্ কবির মন।

হাঁ হাঁ ঘুরন্ত, রোদে চোখে-পড়া বিচিত্র
জন-নেতা, আর মেয়েটা, বণিক, বীর সেনাও—
প্রভু আর দাস, যুবজন আর প্রবীণ দল
গম্ভীর আর হাল্‌কা,—মিছিল অনর্গল
সকলের প্রাণ দেখুক, সে যাক্‌ সবার ঘর ॥[৫]

ম্যাথ্যু আর্নল্ডের এই মন্তব্য কতোটা সংগত, কতোটাই বা অসংগত, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা থেকেই সেকথা ভেবে দেখবার উৎসাহ পাওয়া যাবে। টমাস মূরের যে কবিতাটির উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে সুরের অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংগীতের শ্রেয়ত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে। আবার আর্নল্ডের কবিতাটিতে দেখা গেল সচল জীবন রূপায়ণের শ্রেষ্ঠ বাহন হিসেবে ছবি, গান এবং কবিতা, এই তিনের মধ্যে কবিতারই বন্দনা করা হয়েছে। মূরের আয়ুষ্কাল ছিল ১৭৭৯ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ; আর্নল্ডের ১৮২২ থেকে ১৮৮৮। অর্থাৎ উনিশের শতকের প্রথমার্ধের শেষে মূর যখন সত্তরের কোঠা পেরিয়ে আশির দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, ম্যাথ্যু আর্নল্ড তখন পূর্ণ যৌবনে অধিষ্ঠিত। সমকালীন দু'জন কবির মনে একই বিষয়ে দু' রকম বোধের ঢেউ খেলে গিয়েছিল। এইবার একালের প্রতিষ্ঠিত আর এক কবির মন্তব্য দেখা যেতে পারে। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে টি. এস্. এলিয়ট্-এর একখানি পুস্তিকা ছাপা হয়েছে,—তার নাম 'কবিতার তিনটি কণ্ঠ'। সেই ছোটো প্রবন্ধটিতে এলিয়ট অবশ্য কবিতার সুরধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। তবে, কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাতে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণের চেষ্টা আছে। পরে, সে লেখাটির কথা অন্য কারণে পুনরায় উত্থাপন করা দরকার হবে। এখানে সে আলোচনার মোট বক্তব্যের আভাস দিলেই কাজ চলবে। তিনি বলেছেন যে, যাবতীয় কবিতার মধ্যে হয় শোনা যাবে কবির নিজের কাছে নিজেরই নিবেদনের

কণ্ঠস্বর, নয়তো, ছোটো হোক্ বড়ো হোক্ কোনো বিশেষ শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি তাঁর নিবেদন,—আর তাও যদি না হয়, তাহলে তৃতীয়ত, নাট্য-ধর্মের প্রয়োজনে কোনো নাটকীয় চরিত্রের মুখে পদ্যবাহিত বচন সরবরাহের অভিপ্রায়ে গড়ে-তোলা সমুচিত অন্য এক স্বর! এই ত্রি-বৈচিত্র্যের উল্লেখ করে এলিয়ট অতঃপর প্রথমটিকে পুরোপুরি নাকচ করেছেন, কারণ, কবিতা কোনো ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র একজনের ব্যক্তিগত সংরক্ষিত সম্পত্তি নয় বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। এমন কি ভালোবাসার কবিতাও কেবল দুটি মানুষের যৌথ সম্পত্তি নয়। তিনি বলেছেন—

> আমার মত এই যে, একটি ভালো প্রেমের-কবিতা বিশেষ একজনের উদ্দেশে উচ্চারিত হলেও অন্যেরও যাতে শ্রুতিগোচর হয় কবি সেই অভিপ্রায়েই লিখে থাকেন। কেবল প্রণয়াস্পদের জন্যে কিছু বলতে হলে,—ভালোবাসার সঠিক ভাষাটা নিঃসন্দেহে গদ্যই হওয়া দরকার।[৬]

কেবল একজনের জন্যে হলেও ভালোবাসার ভাষা গদ্য হবে কি পদ্য হবে, সেটা অবশ্য তর্ক-সাপেক্ষ ব্যাপার। এখানে সে তর্ক আপাতত অবান্তর। তবে নানা কথা বলতে বলতে প্রবন্ধের এক জায়গায় এলিয়ট অতঃপর আমাদের বাঞ্ছিত কথাটিও কিঞ্চিৎ ছুঁয়ে যেতে ভোলেন নি। তাঁর সেই কথাটি হলো—

> যে কবিতা উপদেশাত্মক বা আখ্যানমূলক নয় অথবা অন্য কোনো রকম সামাজিক অভিপ্রায়েও যেখানে লেখবার তাগিদ নেই, সেক্ষেত্রে কবি তাঁর শব্দ-সম্ভারের ইতিহাস-বৈচিত্র্য, অর্থ-পরিসীমা, সুর-ধর্ম ইত্যাদি যাবতীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে অন্তরের দুর্নিরীক্ষ্য এক তাড়নাকেই পদ্যে প্রকাশ করতে পারেন।[৭]

'সুর-ধর্ম [music] কথাটার চকিত উল্লেখের পরে ঐ লেখাটিতে

সে প্রসঙ্গে বিশদতর আলোচনা করা হয়নি বটে, কিন্তু, অন্যত্র তিনি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন—

> সমস্ত কবিতাই যে সুরেলা [melodious] হবে, কিংবা, সুরেলা হওয়াটাই যে শব্দের সুর-ধর্মের [music of words] বিশিষ্ট শর্ত, সে ধারণা পোষণ করা সমীচীন নয়। কোনো-কোনো কবিতা লেখা হয় গানের উদ্দেশ্য সামনে রেখে ; একালের বেশির ভাগ কবিতা লেখা হয় সাধারণ আলাপের ভাষায় ব্যক্ত হবার জন্যে ; এবং অসংখ্য মৌমাছির গুঞ্জন কিংবা পুরোনো এল্‌ম্‌ গাছে ঘুঘু পাখির বিষণ্ণ কূজন ছাড়াও পৃথিবীতে আরো অনেক কিছু বলবার আছে।[৮]

এই শেষের দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে অনেক গূঢ় সত্যের সমালোচনার মধ্যে তিনি লিখেছেন —

> কাব্যের সুর-ধর্ম [music] তাহলে কবির সমকালীন লৌকিক সাধারণ ভাষারই অন্তর্নিহিত সুর-প্রকৃতি। এবং তার মানে, কবি নিজে যে বিশেষ অঞ্চলের ভাষায় অভিজ্ঞ, সেই আঞ্চলিক শব্দমালারই সুর-বৈশিষ্ট্য।[৯]

আমাদের একালের বাঙালী কবি প্রমথ চৌধুরীর 'কৃষ্ণনাগরিতা'র বিশেষত্ব এই সূত্রে মনে পড়া স্বাভাবিক। কবি য়েট্‌স ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ। এলিয়ট বলেছেন যে য়েট্‌সের নিজের গলায় তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুনলে তবেই বোঝা যায় যে, সে দেশের কবিতা উপলব্ধির পক্ষে সে দেশের উচ্চারণ-রীতি বজায় রেখে পড়বার সামর্থ্যটা কতো বড়ো প্রয়োজনীয়তা! তিনি আরো বলেছেন যে, কোনো শব্দের সুর-ধর্ম যেন বিশেষ ছুটো ব্যাপারের ছেদবিন্দুতে অবস্থিত—একদিকে সেই শব্দটির পূর্বে এবং পরে অবস্থিত অন্যান্য শব্দের সঙ্গে এবং কাব্যপ্রসঙ্গের সঙ্গেও তার

একরকম সম্পর্ক আছে, অন্যদিকে পূর্বপ্রসঙ্গের সঙ্গে যোগ বজায় রেখে সেই শব্দটির যে অর্থ অব্যবহিত ভাবে ধর্তব্য, অন্যান্য বিচিত্র ভূমিকায় সেই একই শব্দের অন্যান্য যাবতীয় অর্থের তুলনা করলে তার অনুষঙ্গ-উদ্রেক-সামর্থ্যের যে হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, সেটাও বিবেচ্য। একটা পুরো লাইনের মধ্যে কেবল দামী শব্দেরই ঠাস-বুনুনি ঘটলে দামী জিনিসের দাম বোঝা যাবে কেমন করে? কবি মাত্রেই সে কথা জানেন। তাই ব্যঞ্জনাধর দামী শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত কম-দামী শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে যোগ্যস্থানে আসন পেয়ে থাকে। কবি এলিয়ট যা বলতে চেয়েছেন তার মর্মার্থ এই যে, কবিতার সুর-সম্পদ আর তার অর্থ-সমৃদ্ধি আলাদা করে দেখবার জিনিস নয়। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—এইটেই যথার্থ তারিফের ভাষা! 'কানের' প্রাপ্তি 'মরমের' তরঙ্গে বেগ বা আবর্ত বা অন্য কোনো আনুকূল্য আনুক! সুর-ধর্ম বা সংগীত-গুণ বা অনুরূপ অন্য কোনো শব্দের সাহায্যে যে বিশেষত্বের কথা আমরা বলে থাকি, সে তো কেবলই শ্রুতিবেদ্য নয়,—শুধু কানেই শোনবার জিনিস নয়; সে যে কবিতার অর্থেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কবিতার অর্থ যেমন আলাদা জিনিস নয়, কবিতার সুরও তেমনি পুরো কবিতারই অঙ্গচ্ছটা! 'অঙ্গচ্ছটা' কথাটা অবশ্যি এলিয়টের ভাবার অনুবাদ নয়। নৈয়ায়িকের চোখে পড়লে ও-কথার কপালে লাঞ্ছনা ঘটবে। তাঁরা সওয়াল করবেন—কে অঙ্গী? কার অঙ্গ? কোন্ কোন্ অঙ্গের ছটা? ছটার প্রাধান্য অঙ্গীর দ্বারা তিরোহিত হচ্ছে কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সেই দুর্যোগ আশঙ্কা করে কথাটা বরং এইভাবে বলা যেতে পারে যে, কবিতায় কথা আর সুর দুয়েরই উৎসস্থান হলো কবির অনুভূতি। সেই অনুভূতির বলেই কবি সুরের প্রবাহে কথার বিন্যাস ঘটিয়ে থাকেন এবং কথার সেই সমুচিত বিন্যাস তাঁর অনুভূতির যোগ্য

সুরটিকে সুধ্বনিত করে। ভালো কবিতার অনুভূতিও সোনা, কথাও সোনা, সুরও সোনা। সোনার হাতে সোনার চুড়ি কে কার অলংকার ?

কবিতায় কথার সঙ্গে সুরের এই অটুট মেলবন্ধনের কথা মনে রেখে কথা ও সুর, উভয় ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশীদের মর্যাদা বোঝা উচিত। একটি কথাকে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কথা থেকে একান্ত পৃথক বা স্বতন্ত্র করে দেখবার উপায় নেই। খুব দামী শব্দও সম্পূর্ণ একা দাঁড়াতে পারে না। যেমন—'ঢলঢল' কথাটা কবিত্বের দিক থেকে রুচিকর বটে, কিন্তু অন্য কোনো শব্দের নৈকট্য বরদাস্ত করতে রাজী না হয়ে ঐ 'ঢলঢল' যদি একশ্চন্দ্র সুধাকর হবার দুরাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে জোর গলায় হোক্, মিহি গলায় হোক্, একবার 'ঢলঢল' বলেই কবিকে থেমে যেতে হবে। তারপর খুব মোটা কলমে বিস্ময়ের চিহ্ন এঁকে দিলেও বিস্মিত হবার সুযোগ কি অব্যবহিত মনে হয় ? কিন্তু ঐ কথাটাই আরো কিছু কিছু কথার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে কী মধুই না বর্ষণ করতে পারে! 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়!' —এই শব্দমালার মধ্যে ও-শব্দটির সুর-সুধা এবং অর্থামৃত দুয়েরই স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। উনিশ-শ' তিরিশের দশকে বাংলা কবিতায় যখন মননের টাঁকশাল থেকে সদ্য-আমদানী নতুন-নতুন শব্দের দিকে কবিদের বিশেষ ঝোঁক পড়েছিল, তখন বিষ্ণু দের আঠারো লাইনের একটি মাত্র কবিতায় অন্তত ছ'টি কর্‌করে অনভ্যস্ত শব্দ দেখেছিলাম। আগের শতাব্দীর পণ্ডিত-কবি মধুসূদনের তুলনায় সে অবিশ্যি তেমন কিছুই নয়। যাই হোক্, বিষ্ণু দের এই ছটি শব্দ যথাক্রমে—'অনিকেত', 'পিতৃসারস', 'যযাতি-শিরা', 'অশনায়োগ্র', 'স্নায়ুদাবদাহ' এবং 'মারক-আখর'।[১১] অভিধানে 'অনিকেত' শব্দের

মানে দেখা যাবে 'গৃহহীন'। শুধুই 'অনিকেত' বললে কেবল ঐ শব্দটার খটোমটো ভাব ছাড়া মনে আর কোনো বোধ জাগে না। কিন্তু 'অনিকেত মনে যক্ষের কূট প্রশ্ন আনে'—এই ছটি শব্দের আদি-শব্দ হয়ে বসে ওটি যে কেবল বেশ মানিয়ে গেছে, তাই নয়;—মহাভারতের বন-পর্বে গৃহহীন পাণ্ডবদের সঙ্গে বকরূপী যক্ষের সাক্ষাতের কাহিনীটি মনে করিয়ে দিয়ে ঐ লাইনের 'যক্ষ' ও 'কূট প্রশ্ন' উভয়ে মিলে এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রধান ছুটি শব্দ 'মনে' আর 'আনে'-র ধ্বনিগত সাহচর্যের ফলে 'অনিকেত' শব্দের উৎকট অভিনবত্বের ভাবটা কেটে গিয়ে মসৃণ, সুখকর, স্মরণীয় এক মৌলিকতা দেখা দিয়েছে। তেমনি 'পিতৃসারস যযাতি-শিরার প্রবল গানে' লাইনের মধ্যে 'পিতৃসারস' কথাটি একদিকে মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত জরান্বিত যযাতির যৌবন-ভিক্ষা এবং নিজেরই অনুগত পুত্র পুরুর কাছে তাঁর অভীষ্ট-লাভের সর্বশ্রুত গল্পটিকে আমাদের মনে জাগিয়ে তুলে, —অন্যদিকে, সর্বশ্রুত উপাখ্যানের সারস-বৃত্তান্তের স্মারক হয়ে ও-শব্দ নিজেও সার্থক হয়েছে, 'যযাতি-শিরা'কেও কৃতার্থ করেছে; এবং সকলে মিলে পুরো লাইনটাকেই স্মরণীয় হতে দিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এ-সব শব্দ এখানে পৌরাণিক স্মৃতিবাহকতার গুণেও বিশেষ সম্পন্ন। আবার, এদের সুর-সম্পদও তুচ্ছ নয়। দীর্ঘ লয়ের ধ্বনি-প্রবাহের মধ্যে প্রথমটির মৃদু নিক্কণ এবং দ্বিতীয়টির ঈষৎ সংঘর্ষ আমার তো খুবই ভালো লাগে। উত্তম পুরুষে মন্তব্য নিবেদন করতে গিয়ে তথাকথিত বিজ্ঞান-বোধ কুণ্ঠিত হয় তো হোক; কবিতার কথা এবং সুর উভয়ে মিলে পাঠকের একান্ত আপন মনেরই একটি প্রাপ্তি,—একটি অদ্বৈত অনুভূতি; পাঠকের 'আমি'-র কাছে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই আবেদন। ব্যক্তি-মনের সেই আবেদন পেতে হবে। কবিকে বোঝবার

জন্মেই পাঠকের পক্ষে এটুকু আত্মস্বীকৃতি স্বীকার্য। যাই হোক, আগের তিনটি দৃষ্টান্তের মতন বাকি তিনটিও একা-একা অকৃতার্থ থাকতো,—প্রতিবেশী শব্দগুলিকে মেনে নিয়ে এবং তাদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে 'অশনায়োগ্র', 'স্নায়ুদাবদাহ' এবং 'মারক-আখর' সার্থক হয়েছে। এই ছটির মধ্যেই কর্‌করে নতুনত্বের বাত্তি শোনা যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে যেমন, পুরোনো মোলায়েম শব্দের ক্ষেত্রেও তেমনি একই নিরিখ প্রযোজ্য। বিষ্ণু দের ঐ কবিতা থেকেই একটু নমুনা দেখা যেতে পারে—

> সন্ধ্যামণির সোনার খনিতে আগুন লাগে।
> আকাশগঙ্গা পীতপিঙ্গল বালুকারেখা।
> শনির কণিকা মারক-আখরে জীবনে হানে
> করোটির কালি, করকোষ্ঠিতে ছিন্ন লেখা।

এই উদ্ধৃতির প্রথম লাইনে যে পাঁচটি শব্দ আছে তাদের প্রত্যেকটিই বহুপরিচিত। কিন্তু সমাবেশের গুণে, পর-পর পাঁচটি ন-কারের আশেপাশে বিভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনের সাহচর্যে, এবং ঐ শ্রব্য ধ্বনি-তরঙ্গের অর্থ স্বরূপ সূর্যাস্তকালের যে ছবিটি ওর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তারও প্রসাদে এখানকার মোট প্রকাশটি উল্লাসে-বিষাদে কেমন যেন বিধুর হয়ে উঠেছে! তারপর, প্রথম দু'লাইনে নিসর্গ-বর্ণনার যে উদাস-মধুর ঐশ্বর্য মনে উজ্জ্বলের সঙ্গে পিঙ্গলের অনির্বচনীয় বিস্তার ছড়িয়ে দিয়ে যায়, পরের দু'লাইনে সেই বিস্তারের রেশ যেন অনিবার্য ভাবে সহসা নিশ্চিহ্ন হয় করোটির কালিতে। চিরকালের নিসর্গ-তৃষ্ণাতুর মানুষের দৃষ্টি বেধে যায় এ-যুগের করকোষ্ঠির ছিন্ন লেখার মধ্যে। এই বাধাবোধ সত্ত্বেও অর্থের সঙ্গে সুরের এই মিলনটি তবু পরম নির্দ্বন্দ্ব মনে হয়।

কথা আর সুর যে পরস্পর-সাপেক্ষ সামগ্রী, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সত্যেন দত্ত শব্দের জায়গীর জয় করেছিলেন, কিন্তু সুর ও শব্দের এই পরস্পর-সাপেক্ষতার সম্পর্কটি ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি বলেই তাঁর কবিতার অনেক জায়গাতেই উৎকট শব্দের ছোপ থেকে গেছে।

সে নামালে চোখ আকাশ ভরা
দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
সে কাঁদ্‌লে পরে মুক্তা ঝরে
হাস্‌লে পরে মাণিক হাসে!

সত্যেন দত্তের 'কিশোরী'-কবিতার এই মর্মোচ্ছ্বাস যতোদূর আন্তরিক ছিল, ততোদূরই সার্থক হয়েছে। কিশোরীর রূপে শুধু বৈষ্ণব কবিদেরই একমাত্র স্বত্বাধিকার থাকবে কেন? সত্যেন দত্তও সে রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে সেই আবেদনের সম্মোহ অনুভব করে তিনি লিখেছিলেন—

কানে জোড়া দুল্ দেখে তার
ঝুম্‌কো-জবা দোলায় দুল;
তার সরু সীঁথার সিঁদূর মেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল!

সত্য-বাতিকগ্রস্ত যে-সব পাঠক এই কবিকল্পনার ব্যাকুলতা দেখে অবিচলিত থাকবেন, তাঁদের কথা ধর্তব্য নয়। কিন্তু রসিক পাঠক যদি কোথাও কোনো রকম কুণ্ঠা বা বিঘ্ন বোধ করেন তাহলে সে জায়গাটা বিশেষ ভাবে দেখা দরকার। এই লেখাটির শেষ দিকে সে রকম একটু আপত্তির সম্ভাবনা আছে। সেখানে কবি জানিয়েছেন—

ওই সওদাগরের বোঝাই ডিঙা
ফিঙার মত চলত উড়ে
তার পরশ-লোভে আজকে সে হায়,
দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে!
অরাজকের পাগলা হাতী
পথে পথে ফিরছে মাতি',—
তারে দেখতে পেলেই করবে রাণী
শুঁড়ে তুলে তুলবে মুড়ে!
ওগো তারই লাগি বাজছে বাঁশী
পরাণ ব্যেপে ভুবন জুড়ে!

এই শেষের কটি ছত্রে রূপকথার পরিমণ্ডল যেন সুখাবেগে ঘনীভূত! চারিদিকের রূপ মায়া তবু কী যেন অবাঞ্ছিত আঘাতে কুণ্ঠিত হয়েছে। এর সঙ্গে কবিতার আগের অংশের যাবতীয় কথার এবং সুরের প্রভাব নিঃসন্দেহে জড়িত। কবিতাটির প্রথম উচ্ছ্বাসে কবি যখন লিখেছিলেন—

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তার আলতা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল!

—তখন প্রেরণার যে জোর ছিল, কবিতার এই শেষের কয়েক ছত্রে সে জোর যে মন্দীভূত, তাতে সংশয় নেই। 'মুড়ে' কথাটা নিঃসন্দেহে আপত্তিজনক। যথোচিত রসবোধের সাহায্যে সমুচিত বিবেচনা না করেই সত্যেন্দ্রনাথের বিপুল শব্দভাণ্ডার থেকে ও-শব্দটি তাড়াতাড়ি আনা হয়েছিল। অরাজক দেশের হাতী বেরিয়েছে যথাযোগ্যা রানির সন্ধানে,—রূপকথার এই আবহাওয়ার মর্যাদা রক্ষা করে এবং

সেই সঙ্গে রাজহস্তীর প্রতি অনুচিত উপেক্ষা পরিহারের দায়িত্বও মেনে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যদি লিখতে চেষ্টা করতেন, তাহলে 'মাথা'র প্রতিশব্দ 'মুড়ো' কথাটা কখনোই তাঁর কবি-রুচির সায় পেতো না। আর এও ঠিক যে, 'মুড়িয়া'—এই অসমাপিকা ক্রিয়ার চলিত রূপ ধরে নিলেও ও-কথাটা তেমন কোনো অর্থ বা তৃপ্তি দিতে পারে না। 'মুড়ে' শব্দটা এখানে গ্রাম্য এবং সুরহীন। কথার সঙ্গে সুরের,—পূর্ব-অনুভূতির সঙ্গে পরবর্তী কল্পনার যোগটা ঐ একটি অপব্যবহারের ফলে বড়োই শিথিল হয়ে পড়েছে।

এইবার এই আলোচনার ওপর বিশেষ আলোকপাতের আশা নিয়ে পাশ্চাত্ত্য কাব্যবিদ্ রিচার্ডস-এর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। রিচার্ডস্ লিখেছিলেন—

> পারিপার্শ্বিক অন্যান্য সহচরের সঙ্গে অন্বিত থেকেই একটি গীতিময় শব্দবন্ধ তার বিশিষ্টতা অর্জন করে; কোনো বিশেষ দৃশ্যের মধ্যে বিশেষ রঙ্ দৃষ্টিগোচর অন্যান্য রঙের সঙ্গে তার নিজের অন্বয়টিকেই প্রকাশ করে; কোনো জিনিসের আয়তন বা দূরত্ব বুঝতে হলে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জিনিসের দিকে নজর দিতে হয়। বের্গসঁ যাকে বলতেন আন্তর্ভেদন [interpenetration], আমাদের বোধ-বুদ্ধির সকল ক্ষেত্রেই সে ব্যাপার চোখে পড়ে। শব্দের ক্ষেত্রেও তাই-ই, কিন্তু বহু পরিমাণে ততোধিক; আমরা কোন বিশেষ শব্দের যে বিশেষ অর্থ পেয়ে থাকি, সেটা পারিপার্শ্বিক অন্যান্য শব্দের অন্যান্য অর্থের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়।[১২]

শব্দের মৌলিকতা দেখাবার খেয়ালটা কবিদের মজ্জাগত। সে কেবল বিষ্ণু দে বা তাঁর পূর্বগামী সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ খেয়াল নয়।

সত্যেন্দ্রনাথের যখন শিক্ষানবীসী চল্‌ছিলো, সে সময়ে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর-পর কয়েকখানি কবিতার বই লিখেছিলেন। ১৩০৩ সালের ১০ই বৈশাখ তারিখে আদি ব্রাহ্ম সমাজের ছাপাখানা থেকে তাঁর পঁচিশটি কবিতার সংগ্রহ 'মাধবিকা' ছাপা হয়। কবিদের শব্দ-সন্ধানের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান চিন্তায় সেই বইখানির একটি কবিতা বিশেষ কাজে লাগবে। এখানে সেই লেখাটি তুলে দেওয়া হলো। রচনাটির নাম 'উপমা'। তাতে মনোরমা নারীর সৌন্দর্যের কথা আছে—

একে একে ফুরাইল সকল উপমা—
বয়ান হেরিয়া লাজে মলিন চন্দ্রমা,
আঁখি লজ্জা দেয় হরিণীরে স্নেহ-ভরে,
পুষ্পশর ছাড়ে ধনু ভ্রূবিলাস ডরে,
নাসিকায় শুকশিশু, অধরে প্রবাল,
গ্রীবাদেশে হারে কম্বু, বাহুতে মৃণাল,
অভ্রভেদী মহিমায় পয়োধরভূমি
হিমগিরি ছাড়ি উঠে সপ্তলোক চুমি',
কেশরী মরিছে হেরি কটির ক্ষীণিমা,
সুপীন নিতম্বে মজে সকল প্রথিমা,
উরুদেশে হার মানে কদলী গঠন,
দেহযষ্টি সুললিত লতার মতন ;—
ত্রিভুবন আছে, অয়ি শুধু মনোরমা,
তোমার অঙ্গের তরে যোগাতে উপমা।

মনোরমা রমণীর রূপ-বর্ণনায় সংস্কৃতের অনুগামী এই প্রথাগত কবি-কল্পনার অতিশয়োক্তি-স্বভাবটাও যেমন তাক-লাগানো দাক্ষিণ্যের নিদর্শন, এ-কবিতার দশম চরণের শেষে 'প্রথিমা' কথাটাও তেমনি

চমকপ্রদ। পৃথুলতা-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রথিমা' ওখানে আকস্মিক বটে, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের 'মুড়ে'র মতন অপনির্বাচিত নয়। আঠারোর শতকে ভারতচন্দ্র এরকম শব্দ-মননের অনেক নমুনা রেখে গেছেন। আরো অনেক কবি এ রকম খেলা দেখিয়েছেন। সেকালে, একালে,—সব যুগেই এরকম ঘটে থাকে। এবং শব্দের চমক সব সময়ে অল্প-পরিচিত শব্দের মধ্য দিয়েই যে পরিবেষণীয়, তাও নয়। যেমন—

আজিকে দেহের পালা ; রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি
হয়তো বা তারই কাছে পড়ে আছে অমরার চাবি ॥[১৩]

এই দু' লাইনের শেষ শব্দ 'চাবি' আমাদের খুবই চেনা বটে, তবু ওরই মধ্যে পূর্বশব্দ 'অমরা'-র অনুভূতিবেদ্য বিরোধের বেশ একটু চমক আছে। শব্দের অর্থ, প্রসঙ্গের গতি ও প্রকৃতি, এবং সেই শব্দটির সুরধ্বনির বিশিষ্টতা—এই তিনটি পরস্পর-অবিভাজ্য চিন্তা এইভাবে কবিতার সমালোচকের মনোযোগ দাবী করে। 'উত্তরফাল্গুনী'র [১৩৪৭] কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'জন্মান্তর' কবিতার প্রথম স্তবকে লিখেছিলেন—

আধখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে
জাগায়েছে তার মুখে কী মন্দির কান্তি।
নিমেষনিহত স্বচ্ছ চোখের সরসে
ত্রস্ন তারকা সন্ধানে সংক্রান্তি।
রেশমী কেশের ঘন, কুঞ্চিত লহরে
ভর করে আছে অনাদি অসীম রাত্রি।
নিরাশ-নিবিড় আয়ুর অন্ত্য প্রহরে
কেন এলো আজ অনাহূত বরদাত্রী ?

এই আট লাইনের মধ্যে কেবল 'ত্রস্নু' শব্দটাকেই নতুন বললে

ঠিক হবে না; হ্রদ বা সরোবর অর্থে 'সরস' কথাটার ব্যবহারও কবিমনের শব্দচৈতন্তের নমুনা; 'ঘন, কুঞ্চিত লহর'ও তাই,—'নিরাশ-নিবিড়'-এর হাইফেন-বাঁধুনির মধ্যেও কবির বিশেষ মনন-লগ্নের, বিশেষ অনুভূতি-নৃত্যের ঝংকার শোনা যাচ্ছে। এখানে কবির ভাবনা যে বেগ নিয়ে দেখা দিয়েছে, মনের অন্য লগ্নে তিনি নিজেই, কিংবা অন্য কোনো কবি অবশ্যই অন্যতর বেগের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়ে শব্দ বাছাই করবেন। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' বইখানির 'বরযাত্রা' কবিতাটির কথাই এই সূত্রে ধরা যেতে পারে। সেখানকার নাচে আরো উল্লাস, আরো যেন ক্ষিপ্রতা অনুভব করা যায়—

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন কোন দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে॥

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়াল আসি',
বাতাসে সুগন্ধের বাজাল বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি॥

হঠাৎ হাওয়া উঠেছে। বনের ঘুম ভেঙে গেছে। আকাশে বিশাল কোনো পাখির ডানা ঝাপটানির শব্দ উঠলো বুঝি! বিপুলের সঙ্গে সূক্ষ্মের সংগতি,—ভয়ংকরের সঙ্গে স্নিগ্ধের! ফুটে উঠলো কমনীয় মল্লিকা! আকাশে নতুন আলোর প্রসন্ন সমারোহ!

কবি-মনের নিসর্গ-উপলব্ধির এই বিশেষ মেজাজের নিয়ন্ত্রণ মেনে

নিয়েছে এখানকার কথা আর সুর। যে শব্দগুলি এখানে বসেছে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র ধ্বনিকে এবং অর্থকে প্রতিবেশী শব্দমালার ধ্বনি ও অর্থের প্রবাহে মিশিয়ে দিয়ে চরণে-চরণে, স্তবকে-স্তবকে অপরূপ সুখাবেগে ধ্বনিত হতে-হতে, ছবিতে-সুরেতে-মননে-অনুভূতিতে মিশে কবিতার হিল্লোল সৃষ্টি করেছে। 'গুঞ্জিত' বা 'পুঞ্জিত' শব্দগুলো যদি অন্যান্য শব্দের পাশ কাটিয়ে একেবারেই আলাদা থাকবার পণ করে বসতো, তাহলে, ঐ কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে সংযুক্ত নাসিক্য-ব্যঞ্জনের যে সমারোহ ঘটেছে, তা থেকে বঞ্চিত থাকা ছাড়া আমাদের আর উপায়ান্তর ছিল না।

অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকর-গুঞ্জিত
কিশলয়-পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।

—তৃতীয় স্তবকের এই পুরো ঢেউয়ের মধ্যেই তাদের অন্যথা সম্ভাবনীয় একান্ত স্বাতন্ত্র্যের জড়তা তিরোহিত হয়েছে।

এতক্ষণ যে আলোচনা চলেছে, তা থেকে কবিতার কথা ও সুরের ওতপ্রোত সম্পর্কের স্বীকৃতি ছাড়া দ্বিতীয়ত এই কথাও সূচিত হলো যে, শব্দের অর্থগুণ এবং শব্দের ধ্বনিবিশিষ্টতা দুটিই অপরাপর শব্দের সংযোগের সূত্রে অনুধাবনীয়। রিচার্ডস্ এদের অন্যোন্য সম্পর্কের কথাই বলে গেছেন। তৃতীয়ত, আমরা ভাবলেই দেখতে পাই যে, কবির উপলব্ধির মধ্যে কোনো ফাঁকি যদি না থাকে, তাহলে তাঁর শব্দ-নির্বাচন পরস্পর সংলগ্ন শব্দ-প্রবাহের মধ্যে যথাযথ আশ্রয় পেয়ে সার্থক হবে। আর, ফাঁকি থাকলে কোনো শব্দ প্রতিবেশীদের সঙ্গে

মিশ খাবে, কোনোটা বা খাবে না। বলেন্দ্রনাথের যে কবিতাটি তোলা হয়েছে, তাতে 'প্রথিমা' কিঞ্চিৎ অপরিচিত মনে হলেও অসংগত মনে হয় না। সুধীন্দ্রনাথের 'ত্রস্ন তারকা সন্ধানে সংক্রান্তি'-তে 'ত্রস্নু'-কথাটাও তেমনি মানিয়ে গেছে। কিন্তু কোনো লেখক যখন ফ্যাশানের টানে, আত্মপ্রদর্শনের অতিরিক্ত ঝোঁকে কিংবা অন্য কোনো খেয়ালের বশে উৎকট বা অল্প-পরিচিত, বেশি সুরেলা বা অতিরিক্ত বানিয়ে-তোলা কোনো শব্দ ব্যবহার করেন, তখন সেই কৃত্রিমতা ঢাকবার জন্যেই তাঁকে অতিরিক্ত প্রয়াসে মনোযোগী হতে হয়। আমাদের বাংলা কবিতায় গত তিরিশের দশকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতি নামী কবিদের প্রভাবে পড়ে সে সময়ের তরুণ এবং তরুণতর কবিযশঃপ্রার্থীদের মধ্যে এই রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন শব্দ-প্রদর্শনের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। এই শ্রেণীর শব্দবিলসন প্রায় সব ক্ষেত্রেই তৎ-সংযুক্ত কোনো-না-কোনো অর্থ-বিলসনের সঙ্গে জড়িত ছিল। অর্থাৎ কেবল শব্দ দেখাবার ঝোঁক নয়, সে ছিল ভাব এবং শব্দ, দুই ব্যসনেরই যুক্ত-প্রদর্শনী। তিরিশের দশকের বাঙালী তরুণদের মনে ডি. এইচ্. লরেন্স, টি. এস্. এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, বা কামিংস্, অডেন, স্পেণ্ডার প্রভৃতি বিদেশী কবিদের সাক্ষাৎ প্রভাব যতো না পড়েছিল তার চেয়ে বেশি পড়েছিল সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রভৃতি দেশীয় কবির ইঙ্গ-বঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী রীতি-সমাবেশের জৌলুষের দিকে আকর্ষণ। রাজনীতির ভাবনা, বেকার-জীবনের গ্লানি ইত্যাদি চিত্তভার থেকে যাঁরা অপেক্ষাকৃত মুক্ত ছিলেন তাঁরাও যুগের কৃতবিদ্যদের নকল করে কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ভালোবাসার বদলে অবিশ্বাস, সুখের বদলে দুঃখজল্পনা, শান্তির পরিবর্তে উত্তেজনার পিপাসা এবং আশার বদলে নৈরাশ্যের অভিনয় তখন নকল-নবীশদের পাথেয় হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে

কতকটা ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছিল শব্দের জাঁক, অল্প-পরিচিত বিদেশী কাব্য-পুরাণের উল্লেখ সূত্রে কবির নিজের বিদ্যা প্রদর্শনের আড়ম্বর, কবিতার ইতস্ততঃ বন্ধনী ব্যবহারের মধুসূদনীয় অভ্যাসের অনুস্মৃতি,—মাঝে-মাঝে য়ুরোপীয় সাহিত্যের বা সংস্কৃতের উক্তি পরিবেষণের উনিশ-শতকী মুদ্রাদোষ। এই সময়ে একজন তরুণ কবিযশঃপ্রার্থী লিখেছিলেন—

> মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে ময়দান দগ্ধ জগ্ধ প্রায় !
> গলিত পিচের পথে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে অনির্বাণ '
> আরক্ত বয়ানে ফেরে শ্বেতাঙ্গরা মোটরের খোপে,
> আহারের হয়েছে সময়। পথের কিনারে চলে
> বিবসনা নিরিন্দ্রিয়া পাগলিনী অশ্রান্ত প্রলাপে।
> কভু রুদ্ধ পথযান বৃষভের দীর্ঘ উল্লম্ফনে
> বৃষস্যন্তি পিছে। বীভৎসের নেই কোনো সীমা ?—আমি
> করি উমেদারি দুয়ারে দুয়ারে ধনীদের গৃহে।[১৪]

'বৃষস্যন্তি' বানানে অশুদ্ধি আছে। সে বোধ হয় ছাপার ভুল। ঐ দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দটি অভিধানে দুর্লভ নয়। মানে হলো—বৃষাভিলাষিনী গাভী। অতঃপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। তারপর, সংস্কৃতের 'অদ্' ধাতু থেকে 'জগ্ধ' কথাটার উৎপত্তি এবং ওর মানে হলো 'ভুক্ত' বা 'ভক্ষিত'। এখন এই আভিধানিক শব্দের আভিধানিক অর্থ মনে রেখে গ্রীষ্মের দুপুরে কলকাতার ময়দানে ঘাস-শুকোনো রোদের ছবিটা ভাবা যাক। ভাবলে মনে হয় কেবল 'দগ্ধ' কথাটাই পরবর্তী 'প্রায়'-এর সঙ্গে প্রতিবেশী-সম্পর্কের নৈকট্য মেনে নিলে যথেষ্ট হতো ; অর্থের দিক থেকে তাই যথেষ্ট। 'জগ্ধ'-শব্দটা নিতান্তই জবরদস্ত। গ্রীষ্মের সূর্যদেব কলকাতার মাঠের ঘাস জ্বালিয়ে অবশেষে সেই দগ্ধ তৃণ উদরসাৎ করেছেন, অনায়াসে এতোটা কল্পনা করা

সত্যিই দুঃসাধ্য। তবে, পাঠক খুবই সমবেদনাশীল হবেন, সে কামনাও অন্যায় নয়। কিন্তু পাঠকের সমবেদনা বা সহানুভূতিরও তো সীমা আছে। কোনো শব্দ শুধু তার আভিধানিকতার আড়ম্বর দেখিয়েই জয়ী হতে পারে কি? আর কবি যদি কেবল সুরের খাতিরে ছন্দের প্রয়োজনে ওখানে 'জঙ্ঘ' কথাটা বসিয়ে থাকেন তাহলেই কি তাঁর বিরুদ্ধে পাঠকের অভিযোগ প্রত্যাহৃত হবে? ছন্দের খাতিরে যা-খুশি-তাই করা যায় না। অধিগম্য একটা মানে চাই-ই। অবিশ্যি মানের বাতিক নয়। এবং না-মানের বাতিকও নয়। এই দুটো বাতিক থেকেই দূরে থাকা দরকার। অর্থ এবং ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থেকে কেবল ছন্দের দিকেই তিনি যদি মনোযোগী হতেন তাহলে তো 'জঙ্ঘ'-র জায়গায় 'বঙ্ঘ', 'মঙ্ঘ', 'লঙ্ঘ' জাতীয় অর্থহীন কিন্তু সমান ওজনের যে-কোনো একটা শব্দ বসানো চলতো। তিরিশের দশকের এই তরুণ কবিও জানতেন যে, ছন্দ ততোটা নিরঙ্কুশ বা নিরবগ্রহ স্বাধীনতা দিতে পারে না। মোটামুটি একটা অর্থগত সংগতি বজায় রাখতেই হয়। অভিধান-ভীরু পাঠক মহলে সেই ভাবেই তিনি তাঁর সে-কালের বিশেষ প্রিয় 'জঙ্ঘ' কথাটার জাঁক দেখিয়েছিলেন। বিশেষ প্রিয়, বলছি এই কারণে যে তাঁর যে-বইয়ে এই কটি লাইন ছাপা হয়েছিল, সেই বইয়েতেই একাধিকবার যে-সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে 'জঙ্ঘ', 'কিণ', এবং 'ত্রস্নু' এই তিনটি শব্দ ভোলবার নয়। সুধীন্দ্রনাথের যে ক'লাইন তুলে দেখানো হয়েছে, তাতেও 'ত্রস্নু' শব্দটি দেখা যাচ্ছে; সেখানেও ও-শব্দ তৎপ্রসঙ্গের মসৃণ সংযোগ মেনে নিয়ে সার্থক হয়েছে, চঞ্চলকুমারের বইয়ের 'চতুর্দশপদী'-বিভাগে যেন সুধীন্দ্রনাথেরই আনুগত্য-সূত্রে বলা হয়েছিল 'মুহূর্তেকে দেখা দিয়ে চলে যায় ত্রস্নু তারা যত।' আর, রবীন্দ্রনাথের একটি বহুশ্রুত উক্তির ভগ্নাংশের রেশ মিশিয়ে 'কিণ'

শব্দটি [যার মানে—কড়া, ঘষার চিহ্ন, শুষ্ক ব্রণ ইত্যাদি] অন্তত এক জায়গায় চঞ্চলকুমার বড়োই নৈরাশ্য এবং বিষাদের মর্জিতে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার আজো খোলে নাই
ঘুরে মরি বিপাকেই রূপের ধাঁধায়—
রক্তের জোয়ারে কিণ মাংস গ্রন্থি তাই,
হৃদয়ের উপকূল ধুয়ে ক্ষয়ে যায়।[১০]

রবীন্দ্রনাথের রেশ মনে রেখে উল্টো কথার খোঁচা দেওয়াটা সে সময়ের তরুণদের ফ্যাশান হয়েছিল। তাঁরা এলিয়টের নকল করছিলেন।

শব্দের কারবারী যাঁরা, তাঁরা যে শব্দগত চমকের সুযোগ [illegible] না নেবেন, সেকথা নয়। ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী সবাই নিয়েছেন। কিন্তু এ আলোচনার বর্তমান প্রতিপাদ্য বিষয়টা এই যে, পুরো যে মর্জিটা, কিংবা একাধিক মর্জির সমাবেশময় যে সম্মিলিত এককটি কোনো কবিতায় প্রকাশিত হচ্ছে, সেই পূর্ণতার অন্তর্লীন, [illegible] ঐক্য বজায় রেখে ভালো কবিকে তাঁর শব্দ বাছাই করতে হয়। 'সম্মিলিত একক'-এর কথা ক্রমশ প্রকাশ্য। তার আগে অনুভূতি এবং মননের একযোগের বিষয়ে একটা সহজ নমুনা দিয়ে কবিদের শব্দচৈতন্যের এই বিশেষ দিকটি দেখা যাক। ঝর্নার রূপ-গতি-কলনাদের উল্লাস ফুটেছিল সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়। তাতে শব্দের ধ্বনি, সুর এবং অর্থ তিনি লক্ষণেরই সংগতি দেখা গিয়েছিল।

বন্-ঝাউয়ের ঝোপগুলোয়
কাল্‌সারের দল চরে,

শিং শিলায় শিলার গায়,—
ডালচিনির রং ধরে!'[১৬]

—এখানে সবই চেনা শব্দ। তবু 'শিং', 'শিলায়' এবং 'শিলার'—পাশাপাশি এই তিনটি চেনা কথা একটিমাত্র অনুভূতির বেগে কেমন আশ্চর্য সমাবেশ হয়ে উঠেছে! 'কালসার' আর 'ডালচিনি' ওজনে ছোটো-বড়ো না সমান-সমান, সে প্রশ্ন মনেও জাগে না। দুটো শব্দই পরিচিত। ওরা চমক না দিক্, তৃপ্তি দেয়। কবির শব্দ নির্বাচনের তারিফ করতেই হয়। সত্যেন দত্তের দক্ষতার উদ্দেশে উন্নাসিক কোনো অতৃপ্ত আত্মা যদি একালের ঈর্ষা-অক্ষমতা-আত্মগ্লানির কোটরে বসে বসে বলেন—হায় রে কবে কেটে গেছে সত্যেন দত্তের কাল! — তাহলে তাঁকে সত্যেন দত্তের এই নিসর্গানুকারী কবিত্বের এক আধুনিক উত্তরাধিকারীর সার্থক একটি কবিতা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। অনুভূতির অকৃত্রিম রঙে এবং সুরে তাঁর শব্দগুলি যেমন রঞ্জিত, তেমনি স্পন্দিত।

ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ
স্তম্ভিত অরণ্য স্তব্ধ!

অশ্বথ, শাল্মলী, ন্যগ্রোধ মহীয়ান্
লুণ্ঠিত গর্বিত-শির,
স্বর্গস্পর্শী প্রায় শক্তির অভিমান
হৃত আজ বনস্পতির।[১৭]

বড়ো বড়ো গাছ কাটা হচ্ছে জঙ্গলে। এই ছবিটার মধ্যে মিশে আছে মহীরুহের গগনচুম্বী স্থৈর্য, সুবিস্তীর্ণ শান্ত ছায়ালোক, তার আশ্রিতকে আশ্রয় দানের শক্তি,—এবং সেই একই দৃশ্যের মধ্যে একটি বিরোধী বাজনা বেজে উঠেছে—ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ। বিশের

শতকের পঞ্চম দশকে বাংলা দেশের কবি-চৈতন্যে যখন এই নিসর্গ-দৃশ্য ধরা দিয়েছিল, তখন স্বাভাবিক নিয়মেই তাতে কবির ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রগত অভিজ্ঞতার মন্তব্য মিশে গিয়েছিল। স্তব্ধ, শান্ত, সহিষ্ণু বনস্পতি হলো মহতের গর্বের প্রতীক,—সৌন্দর্য, স্বাধীনতা এবং সৃষ্টির প্রতীক। সে-ই হলো দধীচি,—সে-ই হলো ভীষ্ম-পিতামহ। কুঠারের বাজনা কবির মনে এই মনন এবং অনুভূতির তরঙ্গ তুলে শব্দে সুরে, কবিতায় রূপান্তরিত হলো। অজিত দত্ত বললেন—

অন্যায় যুদ্ধের অন্তিম হত্যা কি
মহতের গর্বিত আত্মার ?
মুক্তির রাজ্য কি বিন্দু রবে না বাকি
হিংসার পথে জয়যাত্রার ?
আম্র-তমাল-ছায়া-প্রসুপ্ত বনচর,
ব্যাঘ্র-বরাহ গজরাজ,
পশুপতি সিংহ ও ভল্লুক, অজগর
পরাস্ত হিংসায় আজ।
লাঞ্ছিত স্বাধীনতা, ভগ্ন শূন্য নীড়,
সৌন্দর্যের অবসান,
স্রষ্টা আত্মদাতা মহীরুহ দধীচির
লৌহ-দানব হরে মান।

ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ—
শঙ্কিত অরণ্য স্তব্ধ।

আগেকার আমলে বাংলাদেশের কবিরা অন্যত্র যাই করুন, কবিতার ক্ষেত্রে তাঁরা সব চেয়ে বেশি যে ইন্দ্রিয়ের খাতির করতেন, সেটা চোখ নয়, নাক নয়, ত্বক নয়, রসনাও নয়,—সে ছিলো কানের খাতিরের যুগ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কাব্য সেকালে শ্রুতির ঐরাবত বাহনেই প্রচার লাভ করেছে। সুর বজায় রেখে, মিলের পরে মিল গেঁথে কবি যে অনেক কথা বলতে পারেন, মনে হতো সেটাই তাঁর দৈবী শক্তি! শব্দের শ্রুতিগুণের দিকেই তখন প্রধান মনোযোগ ছিল। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে ব্যঞ্জনা-নিরপেক্ষ অর্থগুণ আর শ্রুতিগুণই ছিলো সাধারণের মনোযোগের বিষয়। তর্কের খাতিরে 'ব্যঞ্জনা' কথাটা অনেকটা টেনে বাড়িয়ে ও-কথার অর্থবিস্তার মেনে নিয়ে নিছক কানের গোচর ধ্বনিগুণকেও একরকম রস-ব্যঞ্জনা বলা যায় বটে, কিন্তু, সবাই জানেন যে, কানের তৃপ্তিটাও ভেতরের নানান্ বাসনাময় চৈতন্যেরই প্রাপ্তি! সেকালে আমাদের কবিতানুরাগী চৈতন্যটাই ছিলো কর্ণেন্দ্রিয়প্রধান। একটু নমুনা দেখা যাক্—

> আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে।
> স্তোক-কৃষ্ণ অংশুমান্ দাম বসুদাম সাথে॥
> কটি কাছনি বঙ্কিম ধটি বেণুবর বাম কাঁখে।
> জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর, ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে॥
> গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কানে কুণ্ডল-খেলা।
> গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ-[illegible]লা॥
> স্ফুট চম্পক-দল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনু-শোভা।
> পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর মনোলোভা॥

শেখর দাসের এই গোষ্ঠলীলার পদে যা বলা হয়েছে, তার মানেটা ছেঁকে নিলে এই ছবিটি পাওয়া যাবে—কৃষ্ণের সঙ্গী শ্রীদাম আসছেন পাগড়ি মাথায় দিয়ে, অন্যান্য সঙ্গী স্তোক-কৃষ্ণ, দাম, বসুদাম তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, শ্রীদামের কোমর ঘিরে মালকোঁচার বঙ্কিম ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। তাঁর বাম কাঁখে রয়েছে বাঁশি। তাঁর চলনের ঢঙে হাতীও হার মানে। 'ভাই' 'ভাই' বলে বন্ধুদের ডাকছেন তিনি। তাঁর

কাঁধে গরু বাঁধবার দড়ি, কানে দুল্‌ছে কুণ্ডল, গলায় গুঞ্জামালা, হাতে অঙ্গদ-বালা। সেই রূপের জ্যোতি যেন ফুটে-ওঠা চাঁপা ফুলের চেয়ে উজ্জ্বল। পাঁয়ে তাঁর নূপুর বাজছে। কবি শেখর দাস আত্মহারা হয়েছেন সেই রূপ দেখে।

এই রচনার মধ্যে রঙ্গিয়া, বঙ্কিম, কুঞ্জর, মন্থর, ছান্দন, কাঙ্খহি, লম্বিত, গুঞ্জা, অঙ্গদ, চম্পক, নিন্দিত, পঙ্কজ—এই এক-ডজন শব্দের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রথম অক্ষর [অর্থাৎ সিলেব্‌ল্] হলন্ত ; এবং ঙ, ঞ ইত্যাদি নাসিক্য ব্যঞ্জনবর্ণের যেন গাঁদি লেগেছে এখানে। কথা, সুর, মানে—এই তিনে মিলে সারা আট লাইনের মধ্যে যেন একটা নাচ নাচা হয়ে গেছে। আর, শ্রোতার বোধের ওপর সব চেয়ে বেশি তীব্র যার পদাংক পড়েছে, সে প্রধানতঃ রূপসত্ত্বও নয়, বোধসত্ত্বও নয়,—সে সুরসত্ত্ব! এখানে আওয়াজটাই মুখ্য। তবু, বোধ এবং সুর সত্যিই পরস্পর আলাদা ভাবে দেখবার জিনিস নয়। পুরাকালে প্লেটো জানিয়ে গেছেন যে, মনের ভাবনা [*dianonia*] আর ভাষা দুটো একই জিনিস ; পার্থক্য এইটুকু যে, ভাবনা মানবাত্মার সেই স্বগত সংলাপ যা ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকেই সম্ভব, এবং ধ্বনির সহচারিতা মেনে নিয়ে ভাবনার যে স্রোত অধরোষ্ঠের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয় তারই নাম ভাষা [*logos*] [১৮]। হলন্ত নাসিক্য অক্ষরের একটি করে গিঁঠ বেঁধে উল্লাসের অব্যবহিত ধ্বনিরূপ এক্ষেত্রে পরবর্তী স্বরান্ত অক্ষরের মৃদু মুক্তির সম্মিলনে পর্যবসিত হয়েছে। 'জিতি কুন্—জর। গতি মন্—থর' ইত্যাদি অংশে কুন্, মন্ প্রভৃতি হলন্ত অক্ষরের আগে এবং পরে স্বরান্ত অক্ষরের বিন্যাসে ছুটির ফুর্তি যেন আরো বেগময় হয়ে উঠেছে। আবার, 'কটি-কা-আ—ছনি ॥ বঙ্ কিম—ধটি ॥ বেণুবর—বাম ॥ কাঁ-আ—খে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুধু হলন্ত নাসিক্যেরই নয়, অন্য আয়োজনও বিদ্যমান। রাখাল-বালকদের

সরল মনের নৃত্যচপল আনন্দের বেগ এক অব্যাহত ধ্বনিরূপের সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছে। অব্যাহত এবং অব্যবহিত। সেই ফুর্তির সঙ্গে, অথবা কবির অন্তরে তজ্জনিত সুখাবেগের সঙ্গে এইসব শব্দের এবং এখানকার ছন্দের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাতে সন্দেহ নেই। অন্তরাবেগের বৈচিত্র্য অনুসারে ধ্বনির নির্দিষ্ট ভেদ-তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকরা আজো সূত্রবদ্ধ করতে পারেন নি। তবে ভাষাবিদ্‌রা কখনো-কখনো সে রহস্যের যবনিকা মোচন করবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'শব্দকথা'-য় এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' বইখানির মধ্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনাসূত্রে সে কথা ভেবেছিলেন। বিশেষ বিশেষ বোধ, অভিজ্ঞতা এবং ধারণার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ধ্বনির যোগ নির্ণয়ের প্রয়াসে ভাষাতত্ত্বে 'বাও-ওয়াও'-মত, 'পুঃ-পুঃ'-মত, 'ডিং-ডং'-মত, 'য়ো-হি-হো'-মত [১৯] ইত্যাদি বোধানুসরণশীল ধ্বনির তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। অর্থসাদৃশ্যের সমান্তরাল কিছু কিছু ধ্বনিগত সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে পণ্ডিতরা 'মরফিম'-বাদ খাড়া করেছেন।[২০] শেখর দাসের এই বাংলা কবিতার বাজনা শুনতে-শুনতে সেই সব কথা মনে পড়া অবান্তর নয়। কিন্তু যে কথাটা এখানে সর্বাধিক বক্তব্য, সেটা এই যে, এ কবিতায় বাজনাটাই প্রধান, দৃশ্যটা নয়। গলার গুঞ্জামালা, বাহুর অঙ্গদ-বালা, চাঁপা ফুলের চেয়ে উজ্জ্বল তনুশোভা— এসব যদিচ চোখের আনুকূল্যেই প্রাপ্তব্য, তবু শেখর দাস এসব পরিবেষণ করেছেন কানের দেবতাকে। এ কবিতা তারিফ করবার পরে পুনরায় মনে হয় যে, কানের যেন দৃষ্টিশক্তি জেগেছে! অন্তত এক্ষেত্রে শব্দের শ্রুতিগুণ কবিতার আসল আবেদনের শ্বাসরোধ করেনি। কিন্তু মধ্যযুগের সর্বত্র এরকম ছিলো না। এর বিপরীত ঘটনাই সে কালে বেশি ঘটেছে। এইবার সেই বিপরীতের নমুন দেওয়া যাক।

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥

সংস্কৃতের অনুকরণে দিব্যি বানিয়ে-তোলা এই উদ্ধৃত অংশের শ্রুতিগুণকে কেবল ধ্বনিরই একান্ত অহমিকা বললে অপরাধ হবেনা। পূর্বদৃষ্টান্তের তুলনায় শব্দার্থ বা প্রসঙ্গার্থ থেকে অনেক বেশি পরিমাণে নিরপেক্ষ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি এখানে কেবল ধ্বনিরই উল্লাস বা বিস্ময়টুকু প্রকাশ করেছে। একেবারে নিরর্থক শব্দ দিয়েও কতকটা উল্লাস প্রকাশ করা অসম্ভব নয়। যদি বলা যায়—

শম্প-ঝম্পন চুম্ব-লম্ভন নক্ত-ঝর্ঝর ঝন্ধ।
উলস সম্ফল ঝটিতি ঝঞ্চন গাগরী-গর্গর কম্প।

—তাহলে তাতেও একটা নাচ অনুভব করা অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা' বইখানির মধ্যে তাঁর বাল্যস্মৃতি থেকে একটি ইংরেজি গানের ধ্বনি-রূপ উদ্ধার করেছিলেন; এই সূত্রে সেটিও মনে পড়া স্বাভাবিক—

'কলোকী পুলোকী সিঙ্গিল্ মেলালিং মেলালিং মেলালিং।'

ভাবলে কৌতুকজনক মনে হয় যে, বালক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে যে গানটি শুনে ঐ ধ্বনিটি আয়ত্ত করেছিলেন, সেটি মূলে হয়তো এই ছিল—'Call of Thee, full of glee, singing merrily, merrily, merrily'। অর্থনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও অবিমিশ্র ধ্বনিরই একটা স্বাদ আছে। কিন্তু কবিতা সেরকম ধ্বনিসর্বস্ব ব্যাপার নয়। কথা আর সুর, দুয়ের ওতপ্রোত সম্বন্ধ মেনে নিয়ে তবেই কবিতার পূর্ণ চরিতার্থতার তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

পিয়াল ফুল পরাগ মাখি' আয়ত-তরলায়িত আঁখি
হরিণী আজি লেহন করে চরণ সুধা স্যন্দ কার?

—কালিদাস রায়ের জনপ্রিয় 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতার এই শব্দ-স্রোত কি সত্যিই সম্পূর্ণ অর্থ-নিরপেক্ষ ব্যাপার? বেশ বোঝা যায় যে, তিনি জনপ্রিয় বৈষ্ণব প্রসঙ্গের আবেগ অবলম্বন করে ললিত ধ্বনি-কল্লোলের কারুকৃৎ হয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি কথা আর সুরের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন।

বছর দশেক আগে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিলো। মনে আছে তাঁর সেই স্মিত দৃষ্টির অনতিস্ফুট কৌতুক। নবীন ছন্দ-শিক্ষার্থীদের তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি কবিতা পড়বার রীতি জিগেস করতেন।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

ধ্বনির দিকে যাঁদের মনোযোগ বেশি, তাঁরা সকলের চেনা ঐ বিখ্যাত কবিতাটি এই ভাবে পড়ে থাকেন —

ঐ আসে | ঐ অতি | ভৈ রব | হর ষে
জল সিন্ | চিত ক্ষিতি | সৌ রভ | রভ সে
ঘন গৌ | রবে নব | যৌ বনা | বর ষা
ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য যে, 'চিত ক্ষিতি' 'ঘন গৌ' প্রভৃতি পর্ব-পরিকল্পনার মধ্যে কবির অনুভূতি বোঝবার জন্যে তিলমাত্র তাগিদ নেই। যথার্থ কাব্যানুরাগীরা জানেন যে, বাগর্থের সমন্বিত অবস্থাটাই কবিতার আবশ্যিক শর্ত। তবে 'অর্থ' মানে সব সময়ে আভিধানিক অর্থ নয়। শব্দের রসরাগের দিকে নজর থাকা চাই,—শব্দে, শব্দবন্ধে, বাক্যে,

চরণে, স্তবকে,—অর্থাৎ শিরোনাম থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত সর্বত্র অর্থে, ছন্দে, প্রসঙ্গে কবির অনুভূতি ও মননের স্বকীয়তা ফোটা চাই। উচ্চারিত সুর অন্তরের অভিজ্ঞতার রঙে রঞ্জিত হওয়া চাই। লেখক এবং পাঠক উভয়েরই এ কথা মনে রাখা দরকার।

তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপকথার—[২১]

১৯৪০ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই দু' লাইনের শেষ শব্দটি ধ্বনিতে-অর্থে যে সম্মিলিত ধাক্কা দিয়ে যায়, রসিক মনের কাছে সে কি আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে? অনতিপ্রত্যাশিত সমাবেশের গুণে চেনা-কথা এখানে যেন অচিন মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। আবার—

ক'দিন হল জানি নে কোন গোঁয়ার খুনি
সমথ তার নাৎনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার দলে গেছে জীবন গেছে চুকে।[২]

এই প্রকাশের মধ্যে 'গোঁয়ার', 'খুনি', 'সমথ', 'ভেগেছে' ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অ-কবিতাশ্রয়ী শব্দ মোটেই বেমানান মনে হয় না।

একালের নবীন-প্রবীণ অনেক কবিই সুর বা সংগীতগুণের সাহায্যে কথাকে অপূর্ব বিস্ময়-ব্যঞ্জক করে তোলবার কায়দা দেখিয়েছেন। অজিত দত্তের যে বইখানির কথা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখান থেকেই সে-ব্যাপারের একটু নমুনা তুলে দেওয়া যেতে পারে। চরণ বা স্তবকের বাইরে রেখে পৃথকভাবে দেখলে 'খুশিতে' এবং 'মিতে', 'প্রতীক্ষায়' এবং 'বসন্ত ক্ষপায়'—এসব মিলের পুরো স্বাদ আর

কতোটুকুই বা পাওয়া যায়। অজিত দত্তের চতুর্দশপদীর মধ্যে এসব কথার বিচিত্রতর, পূর্ণতর স্বাদ ফুটে উঠেছে। তাঁর 'শিলাভট্টারিকা' সনেটের অষ্টকটুকু ছেপে দেওয়া হলো। সেই নমুনা থেকে অভিপ্রেত মতের সত্যাসত্য বোঝা যাবে—

রেবাতটে, বেতসের'কুঞ্জছায়া শীতল যেথায়,
সভয়ে সলজ্জ পথে পৃথিবীর আঁখি এড়াইয়া
আসন্ন আসঙ্গ-আশা-আশঙ্কায় দুরুদুরু হিয়া
আসিল কুমারী কন্যা, পরীর মতন লঘু পায়।

যেথায় কৌমারহর মৃদু পদধ্বনি প্রতীক্ষায়
জাগিতেছে উৎকণ্ঠিত রজনীর প্রহর গণিয়া
সেথা সে থামিল আসি ; তারপর রজনী মথিয়া
অপূর্ব দেহের সুধা আস্বাদিল বসন্ত ক্ষপায়।

পঞ্চম চরণের শেষ শব্দ 'প্রতীক্ষায়' অষ্টমের শেষ 'বসন্ত ক্ষপায়'-কে বহুমূল্য প্রতীক্ষার পরে যেন অলিঙ্গন করেছে। শব্দের অর্থে, চরণের অর্থে, পুরো কবিতার অর্থে এবং সম্পূর্ণ কবিতাটির উচ্চারিত ধ্বনি-প্রবাহের মধ্যে এক সুনিশ্চিত, অনুভূতিবেদ্য সংগতি আছে। তেমনি একই বইয়ের 'সাঁওতালি মেয়েরা' কবিতায় ভিন্ন সুরে অনুরূপ শব্দমূল্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—

সাঁওতালি মেয়েরা বনের পথে
নেচে নেচে চলে যেন হরিণ-ছানা,
সাঁওতালি মেয়েরা কোন্ জগতে
ভেসে চলে যেতে চায় নেই ঠিকানা।

চুলে তারা গোঁজে ফুল, হাসে খিল্‌খিল্,
শুকনো পাতার পথে চলে খুশিতে,

মহুয়া বনের সাথে কী ওদের মিল।
বনের পরীরা যেন ওদের মিতে।

অজিত দত্তের সুর-সচেতন মননের জাদুতে চেনা কথা বার-বার এমনি অচিন-খুশির বেগ লাভ করে ধন্য হয়। রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যে বাস করে নতুন পথান্বেষীর দল বাংলা কবিতায় শব্দের নবীভবন কামনা করেছেন। তাঁদের ক্লান্তির সুরে, গ্লানির সুরে,—কখনো বা উৎসাহের সুরে, আনন্দের সুরে,—আবার কখনো তর্ক-বিতর্কের সুরে, শব্দ বার-বার নতুন ভাবে বেজে উঠেছে। জীবনানন্দের কবিতায়—

চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখীর ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়্‌কড়্‌!
শশাফুল,—দু'একটা নষ্ট শাদা শসা,—
মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুকনো মাকড়সা
লতায়—পাতায়;[২৩]

—এই নৈসর্গিক সাধারণ্যের অসামান্যতা ফুটিয়েছে অতি সাধারণ, সর্বশ্রুত কয়েকটি বাংলা শব্দ। বুদ্ধিমানের অনুভূতির মধ্য দিয়ে সেই সাধারণ বাংলা শব্দই বিন্যাস লাভ করেছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়ার কাঠামোতে—

এক যে ছিলো অ্যামিবা,
আদ্যিকালের বুড়ি;
রোগ ছিলো তার খাই-খাই, আর
কিসের সুড়সুড়ি;
—কিসের কে জানে।

* * *

চোখ গজালো, কান গজালো
আরো কতো কি,
দিগ্‌গজেরা বলে সবই
ভস্মে ঢালা ঘি!
কিছুই হয়না মানে।[২৪]

সাধারণ চল্‌তি শব্দের সমবায়ে,—এবং চরণে-চরণে প্রচ্ছন্ন সুনিশ্চিত সংগীত নিহিত রেখেই আর একজন বলেছেন আর-এক অনুভূতির কথা। বুদ্ধদের বসুর বইয়ের মধ্যে যে-রকম লাইন সাজিয়ে কবিতাটি ছাপা হয়েছে, সে-রীতি লঙ্ঘন করে, সেখানকার নিহিত সংগীতটি এখানে সুস্পষ্ট ভাবে পাঠকের গোচরে আনবার জন্যে একটু পৃথক বিন্যাসে তার এক অংশ ছেপে দেওয়া গেল—

বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই চমকে
দেখি হঠাৎ
জানলা খোলা, আকাশ খোলা,
রাতের রূপের ঘোমটা তোলা,
নিখিল-নীলের মুক্ত খিল,
মুক্ত চাঁদ, একলা চাঁদ, শান্ত রাত হালকা-নীল।
তক্ষুণি মনে পড়লো তোমার
কবিতা,
কে যেন হানলো হাত
বুকের মধ্যে, হৃৎপিণ্ডের
রুদ্ধ কপাট
খুলে দিলো কোন মত্ত আঘাত—
এ কী উন্মাদ অনিদ্রা, এ কী

উদ্দাম হাত,
উন্মাদ রাত !

একটি নেপথ্য নাট্যকথার আবেদন আছে এই কবিতার মধ্যে। সংক্ষেপে কাহিনীটি এই—এ নাটকের নায়িকা যিনি, তিনি এক কবিকে চিনেছিলেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু রক্ত-মাংসের মানুষ একদিকে ; কবি অন্যদিকে। দুই পৃথক সত্তা সত্যিই পৃথক নয়, তবু ধ্যানে আর বাস্তবে কিছু তফাৎ থাকেই তো। যাই হোক, 'শীতের আকাশে একান্ত একা চাঁদের মতো' যিনি নিঃসঙ্গ, তাঁর কবিমানসও যে প্রতি-নায়িকা বড়োলোকের কন্যা 'ফ্যাশান-নিশেনি, বুকনি বোঝাই' উজ্জ্বলা দত্তের আকর্ষণে আকৃষ্ট হতে পারে, এতোটা আশঙ্কা করা এতোদিন আমাদের নায়িকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি বলেছেন—ঈর্ষা নয়, সকল-বৈপরীত্য-গ্রাহী প্রেমের অধ্যাত্ম-শক্তির উৎসাহেই তিনি কবির এ আচরণের প্রতিবাদ করছেন।

যে-তোমারে আমি জানি তার কোনো
আভাস কখনো দেখতে পেলে
চীৎকার করে আঁৎকে উঠবে যে উজ্জ্বলা !

—সেই উজ্জ্বলাই কি-না কবির সঙ্গে নায়িকার আলাপ করিয়ে দিলো এক পার্টিতে! এবং আলাপের অনতিকাল পরেই তাঁকে 'ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলো।' মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এই বেদনার পরে পার্টি থেকে ফেরবার পথে প্রণয়-সন্ধানী, দেহ-রসিক, অতি-সাহসী বরুণ মিত্রের 'হাতের সাহস বাড়লো ক্রমশ রমেশ মিত্র রোডের কোণে'। নায়িকা তাতে বাধা দেন নি। কারণ, পার্টিতে চুপচাপ একা ব'সে ব'সে হাই উঠছিলো, তাই বাধ্য হয়েই তিনি ককটেল খেয়েছিলেন একটা। এবং আহত মনের ক্ষোভও তার কাজ করেছে। মনে হয়েছে—'আবছা রাতের আচ্ছাদনে—আচ্ছা বেশ।'

জয়ী হয়েছে বরুণ মিত্রের হাত। কিন্তু বাড়ি ফিরে জানলায় খোলা আকাশের নীল জ্যোৎস্না দেখে হঠাৎ যেন আর-এক হাতের আঘাত পাওয়া গেল। কোমরে নয়, শরীরের অন্য কোথাও নয়,—সরাসরি হৃৎপিণ্ডে হাত পড়লো। এ-কবিতার প্রথম উদ্ধৃতিতে সেই উদ্দাম হাতের প্রসঙ্গ দেখা গেছে। বুদ্ধদেব এই লেখাটিতে নাট্যরস দিয়েছেন, গল্প দিয়েছেন, ছন্দের কৌশলও দেখিয়েছেন। ছন্দের প্রসঙ্গে এ লেখাটির কথা অন্যত্র আবার স্মরণ করা যাবে। কিন্তু আপাতত এ গল্পের ছেদ টানা যাক। এখানে যা বক্তব্য, তা গল্প নয়, নীতিকথা নয়, একান্তভাবে কোনো বিশেষ কবির জীবন-দর্শনের কথাও নয়। কথা আর সুর, ছুটি বিষয়ের দিকে নজর রেখে শাস্ত্রকথার কাঠিন্য এবং পারিভাষিকতা যথাসাধ্য এড়িয়ে এই সিদ্ধান্তই এখানে পরিবেষণীয় যে, একালের বাংলা কবিতায় কথার নির্বাচনে ক্রমশ একটা সা[illegible]র প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সহজ, আটপৌরে শব্দ দিয়ে এবং অনুকূল ও সমুচিত সুরের মধ্যে সেই সব শব্দের বিন্যাস ঘটিয়ে কবিরা এ-কালের পরিবর্তিত যুগানুভূতি এবং ভিন্নতর ব্যক্তি-চৈতন্য প্রকাশ করতে চাইছেন। কবিতার শব্দরীতির আলোচনায় মধুসূদনের তৎসম-শব্দ-প্রীতি,—রবীন্দ্রনাথের শব্দ-প্রকৃতিতে সুরেলা স্বপ্নবিহ্বল ভাব,—আধুনিকদের উদ্ভট, উৎকট গ্রাম্য অথবা বাজার-চল্‌তি শব্দের ঝোঁক,—এই ধরনের নামকরণ কিন্তু অবৈজ্ঞানিক বল্‌তে হবে। বুদ্ধদেব তাঁর সদ্য-আলোচিত ঐ 'নেপথ্য-নাটকের' মধ্যে 'তেমতি' শব্দটিও তো অপাংক্তেয় করে রাখেন নি। আধুনিকরা সনাতনীদের মতোই আন্তরিক ব্যাকুলতা দিয়ে পথ সন্ধান করছেন। কথার পিপাসা সুরের তৃষ্ণার মতোই কবিদের চিরকালের অশান্তি, তাঁদের চিরকালের আনন্দের সহচর। কথা তাঁদের কাজের উপকরণ নয়; কথাই তাঁদের উপলব্ধি। রিচার্ডস্‌ বলেছেন—

মানুষের মনের অভিজ্ঞতার যে সব-অঞ্চল সংবেদন (sensation) কিংবা স্বজ্ঞা-র (intuition) মধ্যে মিল্‌তে পারে না, কথা আমাদের মনোলোকের বিভিন্ন অঞ্চলের সেই অপূর্ব মিলন-ভূমি। মন অশেষ চেষ্টায় যে আত্মপরিণতির পথ সন্ধান করছে, কথা সেই প্রয়াসের নিমিত্ত এবং উপায় দুই-ই। সেই জন্যেই তো আমাদের ভাষা গড়ে উঠেছে।[২৫]

কথা আর সুরের সমন্বয়-রহস্যের বিষয়ে আরো কথা বাকি রইলো। পরে, সে কথার পুনরুত্থাপন করা যাবে। এখন ভুল সুর আর ভুল কথার অত্যাচারের বিষয়ে দু'চার কথা বলা দরকার।

১। রবীন্দ্ররচনাবলী—অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২। 'A Caution to Poets': M. Arnold। বর্তমান লেখকের অনুবাদ।

৩। "Behold,' I said' 'the painter's sphere !" থেকে "Then let him choose his moment well," অবধি কবিতাংশের এই অনুবাদটুকু বর্তমান লেখকের।

৪। "Some pulse of feeling he must choose" থেকে "And press into its inmost heart." অংশের এই ভাবানুবাদ বর্তমান লেখকের।

৫। "For, ah ! so much he has to do !" থেকে "He follows home, and lives their life !" অংশের এই ভাবানুবাদ বর্তমান লেখকের।

৬। 'The Three Voices of Poetry'—T. S. Eliot ; পৃঃ ৬।

৭। "In a poem which is neither didactic nor narrative, and not animated by any other social purpose, the poet may be concerned solely with expressing in verse—using all his resources of words, with their history, their connotations, their music—this obscure impulse."—ঐ, পৃঃ ১৮ দ্রষ্টব্য।

৮। "It would be a mistake, however, to assume that all poetry ought to be melodious, or that melody is more than one of the components of the music of words. Some poetry is meant to be sung; most poetry, in modern times, is meant to be spoken—and there are many other things to be spoken of besides the murmur of innumerable bees or the moan of doves in immemorial elms.''—The Music of Poetry [1942] দ্রষ্টব্য।

৯। "The music of poetry, then, must be a music latent in the common speech of its time. And that means also that it must be latent in the common speech of the poet's place."—ঐ।

১০। 'যযাতি'—চোরাবালি [১৩৪৪]।

১১। ছোটোদের উপকথায় সন্তানবৎসল সারসের কাহিনী স্মরণীয়।

১২। "A note in a musical phrase takes its character and makes its contribution only with the other notes about it; a seen colour is only what it is with respect to the other colours co-present with it in the visual field; the seen size or distance of an object is interpreted only with regard to the other things seen with it. Everywhere in perception we see this interinanimation (or interpenetration as Bergson used to call it). So with words too, but much more; the meaning we find for a word comes to it only with respect to the meaning of the other words we take with it."—The Philosophy of Rhetoric [1936] : I.A. Richards; পৃঃ ৬৯-৭০।

১৩। 'দ্বন্দ্ব'—উত্তরফাল্গুনী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

১৪। 'বর্ষশেষ'—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় [১৩৪৫], পৃ: ৪২।

১৫। 'বর্ষশেষ' [১৩৪৫] পৃঃ ২৪।

১৬। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৭। 'কাঠ'—পুনর্নবা অজিত দত্ত। এই কবিতাটির রচনাকাল সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

১৮। Sophist এবং Theaetetus দ্রষ্টব্য।

১৯। Elements of the Science of Language : I. J. S. Taraporewala দ্রষ্টব্য।

২০। "Two or more words are said to share a morpheme when they have, at the same time, something in common in their meaning and something in common in their sound. The joint semantic-phonetic unit which distinguishes them is what is called a morpheme."—The Philosophy of Rhetoric [1936] : I. A. Richards ; পৃ: ৫৯।

২১। 'রূপকথায়'—সানাই।

২২। 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'—আকাশপ্রদীপ।

২৩। 'পঁচিশ বছর পরে'—ধূসর পাণ্ডুলিপি : জীবনানন্দ দাস।

২৪। 'আশ্বিকালের বুড়ি'—ফেরারী ফৌজ : প্রেমেন্দ্র মিত্র।

২৫। "Words are the meeting points at which regions of experience which can never combine in sensation or intuition come together. They are the occasion and the means of that growth which is the mind's endless endeavour to order itself. That is why we have language."—The Philosophy of Rhetoric ; পৃ: ১৩১।

ভুল সুর, ভুল কথা

পাঁচজন রসিকের মধ্যে কেউ যদি হঠাৎ আপন মনে বলে ওঠেন—

টং টং টং পাঁচটা যখন বাজ্‌ল ঘড়িতে
ঝাট্‌ ছাড়নু ঘুমের বাড়ি—জাগ্‌নু ত্বরিতে!

এবং তারপর একটু থেমে আবার যদি বলেন—

মুখে কৌতুক, চোখে কৌতুক, হয়ে উৎসুক অতি,
তেতালাতে হলাম হাজির, দেখতে উষা সতী!

তাহলে, তাঁর সেই মর্জির বিষয়ে পঞ্চরসিকের সভার মন্তব্যটা কোন্‌ দিকে ঝুঁকবে? তাঁকে কি শিশু-মনের প্রতিভূ বলা হবে,—না-কি নিসর্গ সৌন্দর্য-পিপাসু প্রবীণ মানুষ বলেই ধরতে হবে? টং টং টং বাজনা বাজিয়ে একতলা থেকে তেতলার সিঁড়ি ধরেছে তাঁর ফুর্তি। সে কি বুড়ো মানুষের সাধ্য? বৃদ্ধেরা আস্তে হাঁটেন। ও রকম জোর কদমে হেঁটে সুন্দরী উষাকে যৌবনও এ কথা বলতে পারে না যে,—

উষা! তোমার বর্ণভাতি খাঁটি সোনালি!
তার পাশেতে অন্যরূপ ফিকে রূপালি!

প্রবীণের চোখ আরো স্থির, আরো শান্ত, আরো অন্তর্মুখী। যৌবনও মগ্ন হতে জানে, স্তব্ধ হতে পারে। কিন্তু শিশুর খেয়াল অন্য রকম। ভোরের প্রথম সূর্যরশ্মি তাকে নির্বাক করে না,—শুধু অবাক্‌ করে,—চঞ্চল হয়ে সে খোঁজে ছাদের সিঁড়ি,—সিঁড়িতে লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে,—খোলা ছাদে পৌঁছে হয়তো সত্যিই চীৎকার করে বলতে থাকে—

যাতুকরি, ওগো উষা! ওগো আলোক-কন্যা!
মোর চিত্তে ঢাল, ঢাল তিমিরহরা বন্যা।

অথচ এ রচনা সুনির্মল বসু, সত্যেন দত্ত বা তাঁদের আগের আমলের শ্রুতি-নৃত্যামোদী কোনো দাশু রায় বা গোপাল উড়ের কীর্তি নয়। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে বছর পাঁচেক বড়ো, স্বনামধন্য কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'শেফালী-গুচ্ছ' ১৩১৯ সালে ছাপা হয়। সেই বই থেকে তাঁরই 'উষা' কবিতার কয়েক লাইন ওপরে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি সত্যিই কবি-মনের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এখানে কেমন যেন অকারণে প্রগল্‌ভ হয়ে পড়ার বদ্‌ অভ্যাসের কিছু সাক্ষী থেকে গেছে। রাতের শেষে, দিনের সূচনায়, শান্ত হাওয়া আর নম্র আলোর সাক্ষাৎ যে নিবেদনটি পাওয়া যায়, তার অণুমাত্র চিহ্ন নেই এখানে। নাচের তালে তালে "ঘন গৌ—রবে নব—যৌ বন—বরষা' বল্‌লে সমাসন্ন মেঘ-বর্ষণের সবিস্ময় আনন্দ যেমন অবিলম্বে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, এখানেও সেই রকম ব্যাপার ঘটেছে। ধ্বনির ঝোঁকে পড়ে কবি তাঁর পথ হারিয়েছেন। নিঃসন্দেহে পথ হারিয়েই তিনি বলেছিলেন—

চিরানন্দা উষারাণী, বীণা লয়ে করে
করে ঝঙ্কার!—সোনার তারে একী সুধা ঝরে!

'চিরানন্দা উষারাণী'-র হাতের বীণায় বড়ো দ্রুত লয়ের আঘাত দিয়ে গেছে এখানকার ঝংকার-ধ্বনি। ওটি উষার সুর নয়। বরং কিছুটা সে সুর আছে ঐ বইখানিরই দ্বিতীয় 'উষা'-কবিতার মধ্যে।

শিশির মুকুতাহার কণ্ঠে দোলে! সৌরভ নিশ্বাসি
ঘন ঘন, এ কি হাসি! ভালে টিপ্, অরুণ-দুকূলা,
ঘুরাইছ লীলাপদ্ম!—দিগঙ্গনা, আনন্দ-আকুলা,
অয়ি উষে!

কবিতা হিসেবে এ রচনাও অল্পমূল্য। এ জিনিস মনের মধ্যে তেমন কোনো সাড়া জাগায় না বটে, কিন্তু তাহলেও সুরটা এখানে অসংগত নয়। কবি বলেছেন—

অয়ি কুহাকিনী উষে! পশি মম মানস-নগরে,
রচিয়াছ ভাবরাজ্যে সৌন্দর্যের নব-বৃন্দাবন···

ভাবের সঙ্গে সুরের সংগতি ঘটাবার দায়িত্ববোধটুকু এই দু' লাইনের মধ্যে আদৌ নেই বলা চলবে না। আগে যে কবিতার কথা বলা হয়েছে, তাতে চটুল ফুর্তির যে ভাবটা ছিলো, এতে নিশ্চয়ই তা নেই। সে জায়গায় এটিতে যা পাওয়া যাচ্ছে, সে হলো সেই জাতের বিস্ময় যার গলার আওয়াজ গম্ভীর এবং হাঁটার ঢঙ্টা মন্থর। এখানকার ভাব এবং ভাষা যেন ভাবতে-ভাবতে, ধীর পাদক্ষেপে গভীরে নামছে! উষার গলায় শিশিরের মুক্তাহার, নিশ্বাসে সৌরভ, হাসিটি বিস্ময়জনক, কপালে টিপ, পরনে রাঙা রেশমী বসন,—এবং হাতের লীলাপদ্ম তিনি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছেন। এ দৃশ্য দেখতে পেলে উষাকে 'কুহকিনী' 'যাদুকরী' যে নামেই ডাকতে ইচ্ছে হোক না কেন, অন্য কারো সঙ্গে তিনি যে তুলনীয়, সে-কথা ভাববার, অথবা সেই কথা ভেবে রূপের কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উষাকে জিতিয়ে দিয়ে লঘু, ক্ষিপ্র, ললিত বেগে এ রকম কোনো মন্তব্য ঘোষণা করবার ইচ্ছে হয় না যে—

উষা! তোমার বর্ণভাতি খাঁটি সোনালি!
তার পাশেতে অন্য রূপ ফিকে রূপালি!

কিন্তু সমস্ত সাবালক মানুষের চোখেই ভোরের চেহারা তাহলে কি একই রকম আবেদনের বস্তু হবে? না কখনোই নয়। জীবনের গভীরতম বিপর্যয়ের ব্যাপারেও মানুষের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া কে না লক্ষ্য করেছেন? অপরিসীম শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে কাব্যে এবং সংসারে যার

বার মাতৃস্নেহের যে পরমা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে, সেই মাতৃস্নেহ স্থগিত রেখেও মাকে তাঁর প্রণয়ীর আবেদনে আত্মহারা হতে দেখা গেছে। মৃত্যুর দৃশ্য মানুষকে অল্প-বিস্তর নাড়া দিয়ে থাকে, সেটাই জানা কথা। কিন্তু মমতার ধন সন্তানের মৃত্যুর দু' দণ্ড পরেই সংসারের অন্য আহ্বানে যথারীতি সাড়া দিয়ে থাকেন, এমন পিতা-মাতাও খুব দুর্লভ মনে করবার কারণ নেই। এক আঘাতে সবাই একভাবে আহত হন না, এক ডাকে সবাই এক কণ্ঠে সাড়া দেন না। সুতরাং উষার শিশির, ঘাস ইত্যাদি নরম আবেদন যদি কারো মনে খুবই গরম ভাব জাগিয়ে তোলে তা হলেও কিছু বলবার নেই। তবে, সাধারণত তা হয় না! ভাবুক মন ভূমার সামনে নত হয়ে থাকে। উষা আমাদের হাততালি দিয়ে নেচে ওঠার প্রহর নয়। রাতের শেষে, দিনের সূচনায় আত্মা যে ব্রাহ্ম মুহূর্তটি অনুভব করে, সেটি প্রাচীন রীতিতেও যেমন, আধুনিক রীতিতেও তেমনি এক অপরূপ শান্ত উপলব্ধি। আমাদের অতি নিকট বর্তমানের চিত্তদাহের বাস্তবতা মনে রেখেই এ কথা বলা গেল। এ-কালের নানান্ অবাঞ্ছিত ব্যবস্থার মধ্যে যে সব হৃদয়বান অথচ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিত্য যন্ত্রণা পাচ্ছেন, তাঁরাও উষা-র দিকে তাকিয়ে অল্প-বিস্তর অন্তর্মুখী না হয়ে পারেন না। এমনি এক ব্যক্তি লিখেছেন—

> মুছে গেল রাতের জঞ্জাল ;
> এবার এক কাপ চা, ঠাণ্ডা স্নান,
> সূর্য ওঠে কুয়াসা ছিঁড়ে, মিনার জ্বলে,
> আবার সুরু হয় নগরের প্রাণ।
> কানে বাজে কাল রাতের গান
> শব্দহীন মন,
> বিরস এ দিন আমার।

দিল্লীর দৃশ্য-পট রয়েছে কবির এই অনুভূতির পেছনে। কবিতার মধ্যে সে কথাই বা উহ্য থাকবে কেন? তিনি ভেবেছেন, দেখেছেন, শুনেছেন,—এবং ভাবতে-ভাবতে, দেখতে-দেখতে, শুনতে-শুনতে লিখেছেন—

শ্বেতপাথরে সূর্যের আলো লাগে,
নবাবী আমল, সৌখীন প্রাণ,
সন্ধ্যায় লাল মসজিদের আজান
কানে বাজে কাল রাতের গান

*   *

আশ্চর্য ব্যাপার সব অভ্যাসে পরিণত,
সবি নিয়তির খেলা, বিষচক্রে জীবন ঢিমে।'

জীবনে যা ছিলো আশ্চর্য, একালের বিমুখ চৈতন্যে তা যে বড়োই ঢিমে হয়ে গেছে, সেই মন্তব্যের সঙ্গে উষার ধূসরতার বিষণ্ণ একটি মিল উপলব্ধি করেছেন এই কবি। 'আধুনিক' কবিও জগৎ-ছাড়া মানুষ নন। শুধু কালের বিষাদ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিতে একটু বেশি পরিমাণে কালি ছিটিয়ে দেয়।

অতঃপর রবীন্দ্র-যুগের পরলোকগত আর একজন কবির উষাকালের অভিজ্ঞতা দেখা যাক। তিনি লিখেছিলেন—

শষ্পশয্যা ছাড়িয়া ফড়িং
উড়িবে বলিয়া তুলিছে ঘাড়,
তুলসীর ঝাড়ে জাগি প্রজাপতি
পালক দোলায়ে ভাঙিছে আড়;
জাগিয়া উঠিয়া গোলাপ ভাবিছে
কখন মেলিবে দল্‌টি তার;

কুয়াসার মত আলোক যখন
ঝাপসা হয়েছে অন্ধকার।

এবং সেই সময়ে—

তেমনি আজিকে হৃদয় আমায়
অন্ধও নহে, আলোও নাহি
হে জবাকুসুম-সঙ্কাশ-দ্যুতি,
হে সবিতা, আজি তোমারে চাহি;

এই আলো-আঁধারি রূপমাধুর্যের ছোঁয়া পেয়ে তাঁর সত্তার মধ্যে জেগেছিল ব্যাকুলতা। টং-টং-টং বাজনা নয়,—অন্তর্মুখী ব্যাকুলতা। তিনি বলেছিলেন—

ঐ চেয়ে দেখ,—পূর্ব তোরণে
ফুটিছে উষার রক্তরাগ—
ওরে মন, তুই তারি সাথে আজ
আপনার মাঝে জাগরে জাগ;
নীরব গগন, নীরব পবন,
শান্ত নীরব ধরণীতল—
ওরে মন, তোর নীরব কথাটি
এই বেলা তুই বল্ রে বল্।[২]

এক-একটি দৃশ্যের সঙ্গে মানুষের মনের যুগ-যুগাতিশায়ী, চিরন্তন এক-রকম যোগ আছে। সংস্কৃতের 'সিদ্ধরস' কথাটির সাদৃশ্য বজায় রেখে সেই যোগের সত্য ব্যক্ত করবার অভিপ্রায়ে আমি 'সিদ্ধযোগ' শব্দটি ব্যবহার করছি। সমানুভূতিময় পাঠক আশা করি অনুমতি দেবেন। সমুদ্র, আকাশ, সঙ্গীহীন অন্ধকার রাত, সুস্থ মায়ের কোলে হৃষ্ট শিশুর রূপ ইত্যাদি দৃশ্যের সঙ্গে মানুষের মনের এমনি এক-একরকম সর্বকালীন সম্পর্ক আছে। আমি তাকেই বলছি

সিদ্ধযোগ। কথাটি বিশদ করবার জন্যে বলা যায় যে, উষার সঙ্গে রসিক মনের সিদ্ধযোগটি হলো নম্র স্বীকৃতির যোগ। দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রথম যে কবিতাটির কথা এই চিন্তার প্রবাহে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে সেই সিদ্ধযোগের অভাব দেখা যাচ্ছে। আর, তাঁর দ্বিতীয় কবিতাতে, এবং পরে যে লেখাগুলি থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হলো, যথাক্রমে সমর সেন এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সেই অন্য দুটি কবিতার মধ্যে ভাষা বা ভঙ্গির যতো পার্থক্যই থাক্, সিদ্ধযোগটি মোটেই লঙ্ঘন করা হয়নি। সমর সেন উষাগমনের সংবেদন পেয়েছেন তাঁর নিজস্ব ইন্দ্রিয়ের, মনের, যুগের এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে। যতীন্দ্রমোহনও পেয়েছিলেন সেই ভাবে। দুজনের অবস্থানে এবং প্রকৃতিতে পার্থক্য ছিল। তাঁদের ঐ দুটি লেখার মধ্যে সে পার্থক্য নিশ্চয়ই বিদ্যমান। কিন্তু উষার সিদ্ধযোগটি তাতে বিচলিত হয়নি। যতীন্দ্রমোহন দেখেছিলেন—

নীরব গগন, নীরব পবন,
শান্ত নীরব ধরণীতল—

সমর সেন বলেছেন—

শব্দহীন মন,
বিরস এ দিন আমার।

দেবেন্দ্রনাথ সেন কিন্তু অনুচিত ফুর্তির ঝোঁকে চিত্তপীড়নকারী নাচের বাজনা বাজিয়েছেন। যদি বলা হয়, ওটি তো শিশু-পাঠ্য কবিতা, অতএব মার্জনীয়, তাহলেও প্রতিবাদ বন্ধ হবে না। কবিতার বোধের ব্যাপারে শিশু আর বয়স্কের যে ব্যবধান সেটা দিনের সঙ্গে রাত্রির ব্যবধানের মতো কিংবা মানচিত্রে আন্দামানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র-ব্যবধানের মতো অনায়াস-দৃশ্য পার্থক্য নয়। উভয়ের অভিজ্ঞতার বিস্তারে এবং গভীরতায় পার্থক্য আছে বটে,

কিন্তু, সেটা অন্য ক্ষেত্রে সুযুক্তি হলেও এক্ষেত্রে নয়। 'হুঁহু কোড়ে হুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ লাগিয়া'—এ অনুভূতি অকালপক্ক শিশুদেরও অনধিগম্য, স্বীকার করি। কিন্তু উষার শোভা দেখে শিশুরাও স্তব্ধ হতে জানে। আবার, সমুচিত লগ্নে বৃদ্ধও মুখর হতে পারেন। শিশু এবং বৃদ্ধ উভয়ে একই উৎসাহে সুকুমার রায়চৌধুরীর এই কবিতা আবৃত্তি করে সুখ পান—

ছুটলে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে —
রাম খটাখট ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার। [৩]

সে মর্জি কেবল শিশুদেরই সম্পত্তি নয়। তাতে বয়স্কেরও অধিকার আছে। কিন্তু যে বালকের সদ্য মাতৃবিয়োগ ঘটেছে, তার মনে ও-সুর দেখা দিলে সেটা সত্যিই অবাক হবার কথা। তেমনি রাত যখন শেষ হলো, দিন যখন শুরু হচ্ছে, সে-সময়ে টং টং টং বাজনার শ্বাসাঘাত বড়োই বেমানান। দেবেন্দ্রনাথ ভুল সুরে গান ধরেছিলেন।

যথোচিত সাবধান হয়ে অতঃপর এই সত্য কথাটি বলা দরকার যে, টং-টং, ঢং-ঢং জাতীয় কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দে,—মাঝে-মাঝে শব্দের অথবা শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তির কায়দাতে,—কখনো বা বর্ণনীয় প্রসঙ্গের পক্ষে সত্যিই বেমানান, অথচ, যার মায়া কাটাতে কবির

বড়োই কষ্ট হয়, সে রকম শব্দের কিংবা অভিধান-বদ্ধ অন্যতর শব্দের প্রদর্শন-ব্যসনে দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গুণী কবিদেরও অনুচিত আসক্তি ছিল। রবীন্দ্র-যুগের প্রবীণ, প্রতিষ্ঠিতদের তালিকায় দেবেন্দ্রনাথের নামটি এই সব মুদ্রাদোষের কবলায়িত কবিদের নেতার নাম নয়। অনেকের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁকে আলাদা করে দেখানো হচ্ছে না। তিনি ছিলেন হৃদয়বান, সদা-প্রসন্ন মানুষ। অনেকের যা থাকে না, সেই বিনয়-গুণ তাঁর জীবনে এবং রচনায় বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল। কবিরাও দোষ এবং গুণ, দুয়েরই যে অধীন, একথা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন। বোধ হয় সেই কারণেই তাঁর নামটি এখানে প্রথমেই মনে এলো। তাঁর অমর আত্মা সমালোচকের অজ্ঞানকৃত অপরাধ সস্নেহে মার্জনা করবেন।

প্রথমে ধ্বন্যাত্মক শব্দের আসক্তির কথা বলা যাক। 'শেফালীগুচ্ছ' ছাড়া অন্যান্য বইয়েতেও দেবেন্দ্রনাথের এ দোষের নমুনা আছে। যাই হোক, ঐ বইয়েতেই 'বর্ষশেষ ও নববর্ষ' কবিতার শুরুতে দেখা যাচ্ছে—

ঢং ঢং টং টং যামিনী পোহায় ;
আয়ু তার শেষ হ'ল আত্মা বাহিরায় !
আহা বুড়া ছিল বেশ ! দোষে গুণে ছিল !
কত লোকে ওর সাথে হাসিল কাঁদিল !
শশাঙ্ক দিগন্ত তলে, বিষণ্ণ অন্তরে,
ঢালিছে মলিন জ্যোতি চিতার উপরে !
অশ্রুজলে সিক্ত আহা আরক্ত অশোকে
ছেয়ে গেল চিতা—বুড়া গেল পরলোকে !

অতি-ভক্তির পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে এ লেখাটি যাঁরা পড়ে দেখবেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, বছর শেষ হয়ে যাবার

বিষাদ-বিস্ময়ের আবেগ নেই এতে। এখানে কৌতুকের সুরই প্রধান এবং তা আদ্যন্ত-বিস্তৃত। ছয় ঋতু যেন বছরের পুত্র-কন্যা। একাধিক মাস নিয়ে এক-একটি ঋতুর বিস্তার। মাসগুলি যেন ঋতুদের পুত্রকন্যা,—অর্থাৎ বছর-বুড়োর নাতি-নাত্‌নী।

ছটি পুত্রকন্যা ছিল, দু'দশটি নাতি ;—
কেহ শেষে না রহিল বংশে দিতে বাতি।
বুড়া বয়সের পুত্র আছিল 'বসন্ত,'
তারেও হরিল হায় করাল কৃতান্ত!

এই ভাবে একটি বৃহৎ উপলব্ধির পরিবর্তে কবির কল্পনা তুচ্ছ কৌতুকে মনোযোগী হয়েছে। তিনি বলেছেন—

এস তবে, আমরাও মৃত জনে স্মরি,
ফেলি দুটি অশ্রুবিন্দু চিতার উপরি!
আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল।
কত লোকে ওর সঙ্গে হাসিল কাঁদিল।

প্রথম লাইনের ঢং-ঢং টং-টং কোলাহল শুনেই স্পর্শকাতর পাঠক অনুমান করতে পারেন যে, ঐ শব্দের ধাক্কায় কবির কর্তব্য বানচাল হবে। এবং তাই-ই হয়েছে। অবিশ্যি শব্দের অপরাধে অনুভূতি অনুপস্থিত, না-কি অনুভূতির অভাবে শব্দের বাচালতা ঘটেছে, সেটা অন্য তর্ক। যে-সব বিভাবের ফলে কবির অনুভূতি রসসৃষ্টি হয়ে ওঠে, তার মধ্যে এখানকার তিক্ত টং টং শব্দও নিশ্চয় অন্যতম। তর্কসম্ভাবনাতীত সেই সত্যটি মনে রেখে বলা যায় যে, একটা বিশেষ শব্দের দিকে বড়ো বেশি মন দেওয়ার অপরাধ ঘটেছে। কালের রথচক্রের আওয়াজ শোনা যাবে, ভাবা গিয়েছিল। তার বদলে এ কী বাজনা! এ কী অনুভূতি! এ নিশ্চয় ভুল সুর, ভুল কথা।

অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কনকাঞ্জলি'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে। সে হলো 'শেফালীগুচ্ছ' ছাপা হবার পনেরো বছর আগেকার ঘটনা। তারও বারো বছর আগে 'কনকাঞ্জলি'-র প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল। সত্যেন দত্তের 'কিশোরী'র সঙ্গে অক্ষয় বড়ালের কনকাঞ্জলির 'কিশোরী'র কিছু মিল আছে। এখানে সেকথা নয়। অক্ষয়কুমারের একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের নমুনা দিতে গিয়ে সে প্রসঙ্গ মনে এলো। তাতে বলা হয়েছিল—

চরণ-কমলে মুখর নূপুর
বাজে মৃদু রুণি রুণি ;
চমকি চমকি ধরিছে সখীরে
নিজ পদ রব শুনি।

স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'শুনি' কথাটার সঙ্গে মিল রাখতে হবে বলেই অক্ষয়কুমার অভ্যস্ত 'রুণু-রুণু' বা 'রিনি-রিনি' পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে ঐ অবিশ্বাস্য 'রুণি রুণি' বসিয়েছিলেন। সুন্দরীদের নূপুর তাঁর কানে সত্যিই কি রুণি রুণি বোল বাজাতো? সন্দেহ আরো বেড়ে যায় যখন ঐ বইয়েতেই 'মোহ' কবিতার মধ্যে দেখা যায়—

নিস্তবধ চারিদিক,
তারাগুলি অনিমিক—
স্থধু চেয়ে আছে।
রুণি ঝুণি রুণি ঝুণি
নূপুরের ধ্বনি শুনি—
সে আসিছে কাছে।

এ রচনার উল্লেখ করতেও কুণ্ঠা ছিল। কারণ, তাঁর অনেক লেখার মতন এটিও একটি অপরিণত প্রকাশ মাত্র। লেখক যা বলেছেন তাতে এইটুকু বোঝা যায় যে, নিস্তব্ধ রাত্রিকালে প্রতীক্ষারত কবির

কাছে যে মেয়েটি নিত্য আসেন, তিনি এবং কবি উভয়ে কিছুক্ষণ রোদন করে থাকেন। ভাষাহীন সেই কয়েক মুহূর্তের ঘনিষ্ঠতার বর্ণনায় বুকে মাথা রাখা, থর-থর দেহলতা, বারংবার চুম্বন ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে এবং অবশেষে অক্ষয়কুমার জানিয়েছেন—

কার শাপে, কোন্ ভুলে
দেছে প্রেম হাতে তুলে
আজন্ম সহিতে!
ওগো আমি এত ত্রাস
এত অশ্রু, এত শ্বাস
পারি না বহিতে।

এই উক্তির সুরে,—অন্তত শেষের দিকে, কিছু আন্তরিকতা আছে। স্বল্পোচ্চারিত একটা যন্ত্রণার প্রকাশ আছে এখানকার শব্দে এবং ছন্দে। কিন্তু প্রথম দিকে 'নিস্তবধ' বানান-টির অভিপ্রায় বজায় রেখে উচ্চারণ করা সত্যিই ভারি কৃত্রিম মনে হয়। 'রুণি-ঝুণি'র মধ্যে ততোটা কৃত্রিমতা নেই। কৃত্রিমতাই কবির সিদ্ধির প্রবল শত্রু। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যাকরণ নেই বলেই কবি যা-খুশি তাই করতে পারবেন, ধরে নেওয়া ঠিক নয়। 'নিস্তব্ধ'-কে বিপ্রকর্ষের বলে 'নিস্তবধ' করে নিয়ে তিনি কি সূক্ষ্মতর, গূঢ়তর বোধের ব্যাকরণের সম্মতি পেয়েছেন? 'নিস্তবধ' ধ্বন্যাত্মক নয়; তথাপি কৃত্রিম। আগের দৃষ্টান্ত 'রুণি রুণি' ধ্বন্যাত্মক শব্দ; সেও কৃত্রিম। কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে কৃত্রিম?—সে প্রশ্নের জবাব দিতে হলে একজন আধুনিক কৃতবিদ্য কবি ও কাব্যতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতার ইংরেজী মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করতে হয়। সে মন্তব্যটি এই—

উপমা,—চিত্র বা ভাবের রূপক,—এবং অন্ত্য মিল, অর্ধ-মিল, স্বরমিল, অনুপ্রাস ইত্যাদি শব্দালংকার কবির অভিজ্ঞতার মনোলীন

রূপকল্প এবং তার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক পরিস্ফুট করতে এবং সেই প্রকাশটিকে সুসমৃদ্ধ করতে আরো সাহায্য করে।

অক্ষয়কুমারের এই সব উদ্ধৃতির মধ্যে সে রকম কোনো সহায়তার নিদর্শন নেই। এখানে তাঁর কবিতা থেকে পর-পর যে তিনটি নমুনা তুলে দেওয়া হলো তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে সুরের ভুল যে ঘটেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিলের কিঞ্চিৎ গরমিল হলেই যে মিল-মানা পদ্য রচনা বাতিল হয়ে যাবে, সে ধারণা কিন্তু মোটেই সংগত নয়। কবির অনুভূতি, মনন এবং অন্য-যা-কিছু ঐ দুটি কথার মধ্যে নিহিত আছে, প্রয়োজন অনুসারে সবই পরিস্ফুট হওয়া চাই। ও-ছাড়া মিল এবং অন্যান্য শব্দালংকারের উপযোগিতা বিচার করবার আর কোনো সংগত নিরিখ নেই। কবির যা বক্তব্য, অলংকারাদির মধ্য দিয়ে সেটি ব্যক্ত হচ্ছে কিনা, তাই দেখতে হবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরিচিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ-কে কিঞ্চিৎ গড়ে পিটে নতুন শব্দ বানাতেও আপত্তি নেই। দরকার হলে অন্যান্য শব্দেরও অনুরূপ রূপান্তর ঘটানো যেতে পারে। 'অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতি।' সংস্কৃতের প্রাচীন নির্দেশ এ ক্ষেত্রে এখনো অচল হয়নি। অপার কাব্যসংসারে কবি প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো সর্বাধিনায়ক। প্রেরণার অনুকূল রীতিতে মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে তিনি কলা-সম্মত রদ-বদল ঘটাতে পারেন বৈ কি। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝরা ফুল' বেরিয়েছিল ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। সে বইয়ে 'বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত' নামে একটি কবিতা আছে। মনে-মনে রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ খুবই শ্রদ্ধা করলেও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যেমন পারিপার্শ্বিক জগতে সে আদর্শের লাঞ্ছনা দেখে মর্মাহত

হয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ কবি করুণানিধান তেমনি কালিদাসের মেঘদূতের কথা স্মরণে রেখে, তাঁর স্ব-কালের কটাক্ষ প্রকাশ করেছিলেন 'বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত' কবিতায়। তাতে ইংরেজীতে-বাংলাতে-সংস্কৃতে-হিন্দীতে মিশ্রণের চিহ্ন আছে এবং সেই মিলনে ঠিক মসৃণতাও নেই। ইচ্ছে করেই তিনি সে কাজ করে গেছেন। কবিতার স্মৃতিশাস্ত্রে সেরকম মেলা-মেশার অনুমোদন নতুন কথা নয়।

শাপেনাস্ত-গমিত-মহিমা
যক্ষ একলা বসিয়া
কাঁদছেন আহা, চক্ষু ফুলেছে
রুমাল ঘসিয়া ঘসিয়া।

প্রথম থেকে চার ল্যাইন পেরিয়ে এসে এই দ্বিতীয় চার-লাইনের মধ্যেই লেখকের মনোভঙ্গি ধরা পড়েছে নিখুঁৎ ভাবে। তারপর যখন বলা হয়েছে—

ওগো পুস্কর, প্রিয়ারে আমার
বিরহবার্তা বোলো বোলো—
বলিতে বলিতে গিরি-কন্দর
তুষার কণায় ছেয়ে প'ল।

—তখন 'বিরহবার্তা বোলো বোলো'-র সঙ্গে 'তুষার-কণায় ছেয়ে প'ল'-র মিলে যৎসামান্য গরমিল থাকলেও রসিক শ্রোতা তাতে আপত্তি করবেন না, কারণ, সেই গরমিলটুকু কবির অভিপ্রেত। সেই প্রবাহের মধ্যে তাঁর এ রচনার সব কথা, সব ছবি, সব দীর্ঘশ্বাস এবং সকল চাতুর্য যেন এক হয়ে মিশে গেছে। যেন গানের আলাপের পরে তীব্র ঝংকার বেজেছে শেষের ক'লাইনে —

বড় সুখে ভাই ছিনু অলকায়
সে এক স্বপ্নরাজ্য
রোজ রোজ ভাই ভোজের ফর্দ
চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য,
জাফরান-রাঙা মটন-কোর্মা
চপ্ কাট্‌লেট পোলাও
তস্য উপরি ল্যাঙড়া আম্র
এবং রাবড়ি ঢালাও।
মিটাতাম তৃষা চাখিয়া চাখিয়া
আনারকা মিঠা শর্বৎ
গড়গড়া থেকে উড়িয়ে দিতাম
ধোঁয়ার বিন্ধ্য পর্বত।

আগের নমুনাটিতে 'বোলো বেলো'-র সঙ্গে 'ছেয়ে প'ল'-র মিলে যে ঈষৎ গরমিলের কথা বলা হয়েছে, আশা করি তাতে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা নেই। তবু যদি কারো অসুবিধা হয়, সেই আশঙ্কা মনে রেখে 'পড়লো' রূপের পদ্য-প্রয়োগ 'প'ল'-র কৃত্রিমতার কথাটা এখানে খুলে বলে দেওয়া ভালো। তাছাড়া বোলো-র সঙ্গে মিল বজায় রেখে 'পেলো' উচ্চারণ করলেও যাঁদের শোনবার কান আছে,—'বোলো বোলো' এবং 'ছেয়ে পোলো'-র ঈষৎ প্রভেদটুকু তাঁরা ঠিকই ধরতে পরবেন। যাই হোক্, প্রথার অনুসরণ করেই হোক্ কিংবা প্রথা লঙ্ঘন করেই হোক্, কেবল ধ্বন্যাত্মক শব্দের বাহাদুরী দেখাতে গিয়েই যে কবিরা অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ কাব্য-সার্থকতার লক্ষ্য হারিয়ে থাকেন, তা নয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রসঙ্গে, এখানে এই কথাটিই প্রধানত বক্তব্য যে, কেবল মাত্র ধ্বনির

গুণে কোনো শব্দই কবিতায় সফল হতে পারেনা। সত্যেন্দ্রনাথ 'পিয়ানোর গান' নাম দিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তাতে তাঁর নজর ছিল প্রধানত ধ্বনিগত সৌন্দর্য, স্পন্দন, অভিনবত্ব এবং চমৎকারিত্বের দিকে। সে ক্ষেত্রে শ্রুতিগত লক্ষ্যের খাতিরে কিছু-কিছু উৎকট শব্দ প্রবেশ করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পিয়ানোর টুং-টাং-এর অনুকরণে অর্থবাহী অথবা ইশারাবাহী সংগত শব্দই তাঁকে প্রয়োগ করতে হয়েছে। তবু কিছু উৎকট ভাব কোথাও-কোথাও রয়ে গেছে। সেইসব ক্ষেত্রে পাঠকের মন একটু-আধটু আপত্তি কি আর না জানায়? যেমন—

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
তার তুল্ কার মুখ?
তার তুল্ কোন্ ফুল?
বিল্ কুল্ তুল্ তুল্
টুক্ টুক্ বিল কুল্
এল্ বসরাই গুল্
দেল্ রোশনাই ফুল!

এ উদ্ধৃতির প্রথম দু'লাইনে সবগুলিই ধ্বন্যাত্মক শব্দ,—তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইনের একটিও নয়,—আবার পঞ্চমে, ষষ্ঠে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বসেছে, এবং শেষ দু'লাইনের ফারসী শব্দের ধাক্কাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ঠিক কোন্ সীমার পরে কবির ধ্বনির প্রতি নিষ্ঠা ধ্বনির মত্ততায় পরিণত হয়, অনেক ক্ষেত্রেই সেই গূঢ় বোধটুকু সত্যেন্দ্রনাথের ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের আশেপাশে সে সময়ে যাঁরা কবিতা লিখছিলেন, প্রযুক্তির ব্যাপারে তাঁরা রবীন্দ্র-পরিহারী যে-কোনো একটা পথ পেলেই খুশি হতে পারেন গোছের চাঞ্চল্য অনুভব

করেছিলেন। এই দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের আকাশে দ্বিতীয় ধ্রুবতারা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। নজরুলের মতো স্বত্ববান মানুষও সেই 'ভারতী'-ভাস্বর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব এড়িয়ে থাকতে পারেন নি। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় তো সে লক্ষণ আছেই, এমন কি পরের লেখাগুলিতেও সত্যেন্দ্রীয় ধ্বনিবশ্যতার কলঙ্ক আছে। 'ঝিঙেফুল' থেকে এখানে ক'লাইন তুলে দেখা যেতে পারে—

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজপাতার দেশে ফিরোজিয়া
ঝিঙে ফুল—ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল
ঝিঙে ফুল॥

আবার কথা উঠতে পারে যে এটি তো ছোটোদের জন্যে লেখা; অতএব ছোটোদের রুচিকর কিঞ্চিৎ ধ্বনির ঘুষই ওতে না-হয় দেওয়া হয়েছে,—তাতে আপত্তি কেন? আপত্তি এ কারণে, যে, ধ্বনির ধোঁয়াতে দৃশ্যটি বড়োই ঝাপসা হয়ে গেছে। ফারসী থেকে আমদানি 'ফিরোজিয়া' শব্দের মানে হলো—ঈষৎ নীল রঙ্‌। গাঢ় সবুজ রঙের লতার মধ্যে উজ্জ্বল হলুদ রঙের ঝিঙে ফুল যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা 'ফিরোজিয়া' শব্দের বর্ণসংকেত মনে-মনে মিলিয়ে দেখুন। রঙের ঈষৎ গরমিল পাঠক তাঁর আপন কল্পনা দিয়ে শুধ্‌রে নিতে পারেন। কবির কল্পনায় মিশমিশে কালো, সুদৃশ্য ফিঙে হলো ঝিঙে-ফুলের উপমান। রসবোধের দিক থেকে তাতেও আপত্তি নেই। কবিতায় রূপকে বা চিত্রকল্পে উপমান-উপমেয়ের সমস্ত উপাদান-লক্ষণ তো আর

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মেলানো হয় না। আপত্তি সেখানে নয়। কিন্তু মনটা অতৃপ্ত থেকে যায়, সেই কথাটাই বক্তব্য। বেশ বোঝা যায় যে, কবির মন ফিঙে-পাখির সঙ্গে ঝিঙে-ফুলের সাদৃশ্যবোধে লীন হবার সুযোগটি পেয়েই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। উচ্চারিত ধ্বনির সুর-সুরা তাঁকে অধীর আহ্বান জানিয়েছে। ফিঙের শান্ত, মসৃণ এবং বিশিষ্ট যে উজ্জ্বলতা তাঁর চোখের গোচর, সে সংবেদন স্পর্শ করেই তিনি নিমেষের মধ্যে তাঁর মনকে সঞ্চারিত হতে দিয়েছেন কানের উত্তেজনায়। তাই তো—

গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঝলমল দোলে দুল
ঝিঙে ফুল॥

কিন্তু ছোটোরাও চক্ষুষ্মান। তারা কেবল শুনতেই চায়না, দেখতেও চায়। চোখ আর কানের মধ্যে বন্ধু-ভাবটাই তাদের কাম্য। তারা বিরোধ পছন্দ করে না। সংসারে বড়োরাই কি বিরোধ চান? বিরোধ কেউ চায় না। শিল্পের ক্ষেত্রেও বিরোধ একটি উপায় ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিরোধের মধ্য দিয়ে মনকে সামঞ্জস্যের ধ্যানে তুলে দেওয়াটাই এ বিশ্বের দিন-রাত্রির সাধনা। দিন এবং রাত্রির, আলো আর অন্ধকারের বিরোধ সমন্বিত হচ্ছে সময়ের অন্তহীন পূর্ণতায়। সুখ এবং দুঃখ সম্পূর্ণ হচ্ছে সর্ববিরোধ-বিলোপী চৈতন্যের অনির্বচনীয় অদ্বৈতবোধে। কবিতার শিল্পেও তাই কাম্য। চোখে দেখা ছবি, আর, কানে শোনা ধ্বনি—এরা যে কখনোই বিপরীত ভাবনা না জাগাবে, তা নয়। কিন্তু সে রকম ঘটলে সেই বৈপরীত্যকে আবার মিলিয়ে দিতে হবে। এই সত্যবোধকে যাঁরা ভ্রান্তিবিলাস মনে করবেন, অযথা তাঁদের সঙ্গে তর্কে কালক্ষেপ করবার দরকার নেই। কারণ,

এ কথা এতোটা তলিয়ে না দেখলেও নজরুলের 'ঝিঙে ফুল'-এর বিষয়ে চক্ষু-কর্ণের অসামঞ্জস্য-ভাবটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। শব্দের ধ্বনি-গুণের দিকে মনোযোগ এখানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ফলে, ধ্বন্যতিরেকজাত সুরবিভ্রান্তি ঘটেছে। ধ্বন্যতিরেকের ব্যাখ্যা আমি অন্যত্র করেছি।[৫]

কবিতার পথে এমনি কতো যে বাধার পাথর ছড়িয়ে আছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর একটি কবিতার এক জায়গায় সে কথা চকিতে জানিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন—

বেদনার অর্ঘ্য রচি নিবেদিলে যাহার উদ্দেশে
আজীবন,—পথের পাথর মাজি' মণি অমলিন
রচিলে যাহার লাগি'—দৃষ্টি ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ—
বিদায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালবেসে?[৬]

সত্যেন্দ্রনাথ অবিশ্যি পাথরই বেশি মেজেছিলেন, মণি রচনায় তাঁর সিদ্ধি ততোটা ব্যাপক নয়। কিন্তু জগতে কবিদের যে কতকটা মণিকার-বৃত্তিই মেনে নিতে হয়, সে বিষয়ে মতান্তর নেই। অডেন-এর যে উক্তির বঙ্গানুবাদ একটু আগেই দেওয়া হয়েছে, তাতেও সেই কবি-কৃত্যের ইশারা আছে। কবিতার মধ্যে উপযুক্ত আশ্রয় পেয়ে শব্দের পাথর কেবল কানেরই মণি হয়ে উঠুক,—এ কামনা কাব্য-রসিকের কামনা নয়। সমস্তই হোক মনের মণি। মনের মধ্যে অনুভূতির মণিকুট্টিম পূর্ণ হয়ে উঠুক। সেইটিই এ পথের যথার্থ লক্ষ্য।

শব্দ বা শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তির ওপরেই বিশেষ ভাবে জোর দিয়ে কবিরা কখনো কখনো মণি রচনার সামর্থ্য দেখাতে চান। একালে—

অর্থাৎ ১৮৯০-র কাছাকাছি সময় থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-প্রয়াণ অবধি আমাদের বাংলা কবিতার এলাকার মধ্যে, সে বিশেষত্বও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এই ধরনের অভ্যাস আগেও ছিল, এখনো আছে। ধ্রুবপদের প্রাচুর্যের কথা পুরোনো বাংলা কবিতার পাঠক মাত্রেরই সুবিদিত। কোনো কবিতায় ভিন্ন-ভিন্ন অংশের মধ্যে বিশেষ যে চরণটি ঘুরে-ঘুরে বার-বার দেখা দেয়, তাকেই বলা হয় ধ্রুবপদ। বিশেষ অনুভূতি তাতে বিশেষ জোর পেয়ে থাকে। সেই জোরের চাহিদাটাও মনেরই চাহিদা,—কেবল কানের নয়। আমাদের একালের অনেক বাংলা কবিতায় মনের সত্যিকার প্রয়োজন ব্যতিরেকেই এই ধরনের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। দু'রকম পুনরাবৃত্তি,—এক হলো শব্দগত; আর এক, শব্দসমষ্টিগত। মনের প্রয়োজন নেই, তবুও পুনরাবৃত্তি ঘটছে—সেরকম চোখে পড়লে তাকে নিশ্চয়ই অপপ্রয়োগ বলতে হবে। তাতে সুর কেটে যায়। দেখা দেয় ভুল সুর। সত্যেন দত্তের 'তোড়া'-নামে একটি কবিতার মধ্যে সেই ভুল সুর রসিকের অনুভূতিতে অবশ্যই ধরা পড়বে। কিন্তু সে লেখাটিতে সত্যিকার কাব্যাবেগ আছে। প্রথম স্তবকের প্রথমেই একটি উচ্ছ্বাসের ঢেউ উঠেছে। ঢেউটি আন্তরিক। তার প্রকাশও অকৃত্রিম। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকে যখন তিনি সেই ঢেউটিকে আবার ঠিক আগের মতন ধরবার চেষ্টা করেছেন, তখন কানের পাওনা মিটেছে বটে, কিন্তু মনের উপলব্ধি তাতে গাঢ়তর হতে পরেনি। বাক্যকার যেন ফাঁকা মনে বেহালার তারে তাঁর পোষা সুর-কে আরো কিছুক্ষণ থাকতে বলেছেন। কিন্তু সুর তা থাকবে কেন? সুর ভারি খেয়ালী। খেয়াল কাটলেই সে হাওয়ায় মিশিয়ে যায়। 'ওগো ফেরো,—ফিরে এসো' বললেও সে আর ফেরে না। তখন সংসারের আর পাঁচজন মায়াবী মানুষের মতো কবিও হয়তো সেই সুরময়ী অনুভূতির পরিত্যক্ত অঙ্গবাসের ঘ্রাণ নেন,

মা যেমন মরা ছেলের খেল্‌না হাতে নিয়ে শূন্যতার মধ্যে তুচ্ছ সান্ত্বনা আঁকড়াতে চান। যাই হোক্‌ 'তোড়া' কবিতার প্রথম দুটি স্তবক এইবার দেখা যেতে পারে—

দুধের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া,
বৃন্তগুলি জরির সূতায় মোড়া!
পরশ কারো লাগ্‌লে পরে পাপ্‌ড়ি পড়ে খুলে,—
তবুও আগাগোড়া;
চৌকী দিতে পারলে না চোখ জোড়া;
দুধের বরণ, মধুর বরণ, মদের বরণ ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া!

মধুর মত, দুধের মত, মদের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান,
প্রাণের গভীর ছন্দে বেগমান!
হাল্কা হাসির লাগলে হাওয়া যায় সে ভেঙে চুরে,
তবুও কেন প্রাণ
ছড়িয়ে দিলে গোপন মধুতান!
মধুর মত, মদের মত, দুধের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান।

প্রথম স্তবকে পর পর দুধ, মধু এবং মদ তিনে মিলে ফুলের বর্ণবৈচিত্র্যকে ধ্বনিত করেছে। জরির সুতো দিয়ে বাঁধা নানা রঙের ফুলের তোড়া চোখের, কানের, মনের এবং সংহত চৈতন্যের প্রাপ্তি হয়ে উঠেছে। স্তবকের শেষে আবার ঐ দুধ, মধু, মদ দেখা দিয়েছে উদ্দীপনার আন্তরিক, অকৃত্রিম টানে। সেই টানের ধ্বনিগত

প্রকাশটুকু ছন্দের-রাজা সত্যেন্দ্রনাথের বড়ো ভালো লেগেছিল। তাই দ্বিতীয় স্তবকে পূর্বশ্রুতির রেশ বাগিয়ে ধরবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য প্রযত্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু সে প্রযত্ন যেন 'স্মরণের আবরণে মরণেরে' যত্নে ঢেকে রাখা! দ্বিতীয় স্তবকের শুরুতে 'মধুর মত দুধের মত, মদের মত সুরে গেয়েছিলাম গান'—এই মর্মোচ্ছ্বাস কেমন যেন বানানো ব্যাপার মনে হয়। মধুর মত গান এবং মদের মত গান,—দুটির কোনোটিই আয়াস-কল্পনীয় নয়। কিন্তু 'দুধের মত গান'? সে কী ব্যাপার? কবিকে জিতিয়ে দিতে হলে জোর করে একটা সংগত মানে বা ব্যঞ্জনা খাড়া করা দরকার। এই রকম একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে,—দুধের বর্ণগত স্বাদটুকু ভেবে নিতে হবে আগে; অতঃপর সেই শুভ্রতার সমধর্মী নিষ্কলুষ মনঃপ্রশান্তির ব্যঞ্জনা অণুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু প্রশ্নের কাঁটা তাতেও মরে না। কাব্য-রসিক জিগ্যেস করবেন,—প্রশান্তির স্মৃতি কি ঐ ভাষায়, ঐ ছন্দে, ও-রকম ঝোঁক এবং দোল এবং নাচ দেখাতে-দেখাতে ব্যক্ত হয়? কবিতার ক্ষেত্রে প্রশান্তির মধ্যেও কিছু উদ্দীপনা থাকতে পারে বটে। এখানকার উদ্দীপক সুরটা কিন্তু সেরকম নয়। তাহলে সেই আদর্শ সুরটা কি রকম? তার একটি নমুনা দেওয়া যাক। শরতের নৈশাকাশে অজস্র তারার মধ্য দিয়ে ছায়াপথ এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে উধাও হয়েছে, পুষ্পক রথে যেতে-যেতে রামচন্দ্র সেই দৃশ্য দেখিয়ে সীতাকে বললেন—'ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্'।[১] এই কথার সঙ্গে রামচন্দ্রের আরো একটু কথা মিশে গিয়েছিল। আমি প্রশান্তির নমুনা দেবার জন্যেই সেটুকু বাদ দিয়ে বললাম। কারণ, সেই বাকি অংশে রামচন্দ্রের অহং একটু বেশি মাত্রায় মাথা তুলেছিল। প্রশান্তি অহং-কে শান্ত করে। রামচন্দ্র বলেছিলেন—ঐ দেখ জানকি! শরৎকালের নির্মল আকাশে অন্ধকার রাত্রে তারকাকীর্ণ আকাশ যেমন

ছায়াপথের দ্বারা বিভক্ত হয়, ফেনিল সমুদ্র তেমনি আমার সেতুর দ্বারা ভারতের তটস্পর্শী মলয় পর্বত থেকে ব্যবহিত রয়েছে। কালিদাস রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবিরা প্রশান্তির প্রসন্নতা যে-ভাবে ব্যক্ত করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথের 'দুধের মত গান' মোটেই তার অনুগামী নয়। ও শুধু রসব্যঞ্জনাহীন শব্দেরই ঢেউ। মনে রাখা উচিত যে, কবিতার ক্ষেত্রেও প্রশান্তি কখনোই অমিত উচ্ছ্বাসের ঢেউ নয়। সত্যেন দত্তের এই দ্বিতীয় স্তবকটিকে রসের অণুবীক্ষণে ফেলে দেখলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, পাঁচ মাত্রার পর্বগুলি শ্রব্য সুরের উজ্জ্বলনায় ওখানে ঝলমল করছে বটে, কিন্তু তাদের অকপট স্বগতোক্তি যাঁরা শুনতে পান, কেবল তাঁরাই শুনবেন যে ওরা প্রত্যেকে বলছে—হায়, হায়, স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি! আগের স্তবকের স্মৃতি কবিকে আত্মানুকরণে নিযুক্ত করেছে।

দ্বিতীয় স্তবকে তাঁর মনের আরো কথা বলা হয়েছে,—আরো খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে অনুভূতির জোর নেই। প্রথম স্তবকের পরে ঠিক নিঃশেষ না হলেও, উচ্ছ্বাসের ঝোঁক নিঃসন্দেহে কমে গেছে। মাত্র তিনটি স্তবকে এ কবিতাটি তিনি শেষ করেছিলেন। তার বেশি দৌড় ছিলো না ও-ভাবটির,—দম ছিলো না,—যাবার তাগিদ ছিলো না। অনুভূতির বিশেষ লগ্নে লীন হয়ে গীতিকবিতার এই মাত্রা বা সীমার গূঢ় তত্ত্ব কবি নিজেই বুঝতে পারেন। 'তোড়া' কবিতায় মোটামুটি সেই মাত্রা বজায় রাখবার খেয়াল ছিল তাঁর। শব্দ অথবা শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তিঘটিত সুরচ্ছেদের নমুনা হিসেবে তাঁর এই লেখাটির উল্লেখ থেকে একে-একে একাধিক গূঢ় কথার সম্মুখীন হওয়া গেল। মূল প্রসঙ্গের দিকে মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে যথাসাধ্য সংক্ষেপে সেই আনুষঙ্গিক সত্যবোধ এইখানে স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া দরকার। প্রথমত প্রশান্তির ভাবটা অপেক্ষাকৃত

নিস্তরঙ্গ; প্রশান্তির ভাব যদি কবিতায় ব্যক্ত হতে চায় তাহলে সে-কবিতার শব্দে, অর্থে, সুরে সমুচিত প্রসন্ন গাম্ভীর্য বজায় রাখা দরকার; আলোচ্য কবিতার মূল ভাবটা প্রশান্তির নয়, স্মৃতিরোমন্থনময় বিষাদবোধের। দ্বিতীয়ত কবিতায় পুরোপুরি নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি পরিবেষণ করা অসম্ভব; কারণ, কবির মনে আদৌ কোনো তরঙ্গ যদি না দেখা দেয় তাহলে তিনি কবিতা লিখবেন কেন? তৃতীয়ত উত্তেজনা আর প্রশান্তি পরস্পরের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকবার পাত্র নয়। তাতে স্ব-বিরোধ হয়। 'মধুর মতো সুর' বল্‌লে মধুর গাঢ় রঙ্, রূপ, স্বাদ সব মিলিয়ে মনে একরকম নিবিড় ভোগের ধারণা জাগে—'মদের মত সুর' বল্‌লে ভোগের চিন্তা আরো উত্তেজিত হয়,—সেই সঙ্গে একই নিশ্বাসে উচ্চারিত 'দুধের মত সুর'-মন্তব্যের কোনো অব্যবহিত স্বাদ নেই। এই তিনটি কথা সমঝে নিয়ে কবিতাটির তৃতীয় স্তবকের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় যে, সেখানে 'মধুর মত, দুধের মত' উক্তি আবার দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু কবি আর 'দুধের মত' বলেন নি। তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ও-কথাটা জোলো, ওর কোনো স্বাদ নেই। তাই তৃতীয় স্তবকে লেখা হয়েছিল—

মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো!
নিশাসখানি পড়লে জোরে হতাম গো নিশ্চুপ—
সে প্রেমও ফুরাল।
নিবে গেল নিমেষহারা আলো!
মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো।

তুখের রূপ অধীর করা রূপ নয়। নিজের ভুল সংশোধন করে এই শেষ স্তবকটিতে তিনি অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া দ্বিতীয় স্তবকের 'গান', 'বেপমান', 'প্রাণ', 'তান' ইত্যাদি হলন্ত ন-ধ্বনির মিল বা অনুপ্রাসের মধ্যে আনন্দের রেশের মতো স্মৃতির যে অনুরণন বাজছিলো, শেষ স্তবকের 'ভালো', 'কালো', 'ফুরালো', 'আলো' ইত্যাদি প্রথমে-বিবৃত-পরে-সংবৃত স্বরান্তিক মিলের গুণে সেই সুখ-সম্ভোগের ভূত-কাল যেন বর্তমানের শূন্যতায় পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে গেছে। 'সে প্রেমও ফুরাল', 'নিবে গেল নিমেষহারা আলো'—এইসব ধ্বনি-সংবেদনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ সর্বস্বান্ততার করুণ সংবাদ আছে। দ্বিতীয় স্তবকে কেবল 'তুখের মত'-উক্তিটুকুর পুনরাবৃত্তি না ঘটলে এ লেখাটি সত্যিই বড়ো ভালো হতো!

এ-রকম পুনরাবৃত্তির দোষ একা সত্যেন্দ্রনাথের দোষ নয়। আরো অনেকে করেছেন। আরো নমুনা দেবার আগে, এই অধ্যায়ে পূর্ব-কথিত তিনটি আনুষঙ্গিক সত্যের সঙ্গে পূর্ব অনুচ্ছেদে আলোচিত চতুর্থ সত্যটিও গ্রথিত হওয়া দরকার। আগের অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে, সেই সূত্র ধরে এখন আমার এই ধারণাটি ব্যক্ত করছি যে, হলন্ত ন-ধ্বনির অনুপ্রাস আমাদের মনে যে বেগ সৃষ্টি করে, সেটা দ্রুত-স্পন্দনশীল। ন-ধ্বনিটার মধ্যেই কেমন এক রকম স্পন্দন আছে; সেটা মোটেই প্রশান্ত নয়। তার আগে এবং পরে যথেষ্ট দীর্ঘ স্বর যোগ করলে তবে তার উচ্ছলতা নিবৃত্ত হয়। 'ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা'-র বহু স্বরময়তা সত্ত্বেও সেই উচ্ছলতা সুস্পষ্ট। হলন্ত অবস্থায় তার অনুরণন বেড়ে যায়। তখন স্তব্ধতার আকাঙ্ক্ষাও অশেষ গুঞ্জন হয়ে ওঠে। সেটা কবিতার ব্যঞ্জনা বাড়িয়ে দেয় বটে,—কিন্তু মনকে বিস্তারের দিকে এগিয়ে দেয় না, নিজের মধ্যেই

সংবৃত রেখে অনুরণিত করে। এবং এই মন্তব্য শুধু 'ন'-এর পক্ষেই নয়, সাধারণ ভাবে সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পক্ষেই প্রযোজ্য।

দিন যদি হল অবসান
নিখিলের অন্তর-মন্দির-প্রাঙ্গণে
ওই তব এল আহ্বান।[৮]

—রবীন্দ্রনাথের এই ক'লাইনের মধ্যে যে প্রাঙ্গণে আত্মার মিলনের কথা বলা হয়েছে, উচ্চারিত ধ্বনিসংবেদনের দিকে নিবিষ্ট হয়ে ভেবে দেখলে সেটিকে খোলা উঠোন মনে হয় না,—মনে হয়, সংসার-প্রান্তের নিবিড় একটি বিন্দু,—যেখানে দিনাবসানের স্তব্ধতার মধ্যে অন্তরের মন্দিরে অফুরান এক মর্মগুঞ্জন ধ্বনিত হচ্ছে! সেই গুঞ্জন মনকে গভীর বেদনায় নিয়ে যায়। তাকে প্রশমিত করতে হলে স্বর-ধ্বনির সাহায্য দরকার। তাই পরের অংশে বলতে হলো—

কর্মের-কলরব-ক্লান্ত
করো তব অন্তর শান্ত।
চিত্ত-আসন দাও মেলে, নাই যদি দর্শন পেলে
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ—

কঠোরতা, লালিত্য, ঘর্ষণ, গুঞ্জন বা বন্ধনের দিকেই ব্যঞ্জন বর্ণের ঝোঁক! ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমুচিত স্বরের সমাবেশ ঘটিয়ে তবেই প্রশান্তির অনুকূল ধ্বনি-বাহন লাভ করা যায়। তা না হলে মনে দেখা দেয় অসংগত বোধ। চুপ করে যে ছবি দেখা দরকার, বাচাল বাগ্‌যন্ত্র সেটার বিষয়ে হয়তো চেঁচিয়ে উচ্ছ্বাস জানায়,—যে রূপ দেখে রূপসাগরে ডুবে যাবার কথা, সেই রূপের সামনে মন কখনো বা রায়বেঁশে নাচ শুরু করে দেয়! 'সমুচিত' কথাটা লক্ষণীয়। ঔচিত্যের বিধি কবির বোধের গোচর। বাইরে থেকে কবিকে কোনো চরম নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া মূঢ়তা। স্বরে মুক্তি, ব্যঞ্জনে বন্ধন; ধ্বনির এই সাধারণ

স্বভাব অবলম্বন করে কবির অনুভূতি তার অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছে থাকে। প্রসঙ্গত সেই কথাটাই এখানে বলা গেল। ধ্বনিপ্রধান ছন্দে জগদানন্দের একটি পদে শ্রীরাধিকার রূপের বর্ণনার মধ্যে স্বর এবং ব্যঞ্জন-বর্ণের এই লীলাকৌশলের চিহ্ন আছে। পদকর্তা লিখেছিলেন—

দশন কুন্দ-কুসুম-নিন্দু
বদন জিতল শারদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে
প্রেমসিন্ধু প্যারী ॥
অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্ধ
মন্দ মন্দ হসনানন্দ
নন্দন-সুখকারী ॥

এই উদ্ধৃতির দুই বিভাগে প্রথম তিন লাইনের প্রত্যেকটিতে ছ'মাত্রার দুটি করে পর্ব আছে এবং ব্যঞ্জনের উপলাঘাতে নাচতে-নাচতে এর ধ্বনিপ্রবাহ যেন অতিরিক্ত খুশির ঝোঁকে এগিয়ে চলতে রাজী। কিন্তু এর বিষয়টি ঠিক নাচের প্রেরণার পক্ষপাতী নয়; সুদতী শ্রীরাধিকার হাসি কুন্দাধিক শুভ্র,—তাঁর মুখের শ্রী শরৎকালের জ্যোৎস্নাকেও জয় করে,—পথ চলার শ্রমে তাঁর দেহে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে,—এবং তিনি প্রেমস্বরূপা। এই রূপ,—এই মন্দ-মন্দ হাসি দেখে মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু 'দশন কুন্দ-কুসুম-নিন্দু'-ধ্বনিপ্রবাহের বেগ যেন উৎফুল্ল ভাবের চেয়ে আরো বেশি তীব্র হয়ে উঠেছিল। 'অমরাবতী'-র দীর্ঘ আ-ধ্বনি, 'হেরি হেরি'-র এ-ধ্বনি ক্ষিপ্রগতি মনের বেগ সংযত করে বিস্তারের শ্রুতি-সংকেত দেখিয়েছে। তেমনি ঘটেছে 'নন্দন-সুখকারী'-তে। সে যেন ঝম্-ঝম্ নাচের

মধ্যে ভক্তের ভূমিষ্ঠ প্রণতি! ভক্ত জগদানন্দ সেই উল্লাসের অতিরিক্ত বেগটা প্রশমিত করেছেন 'প্রেমসিন্ধু প্যারী'-তে পৌঁছে। ব্যঞ্জন-গতির ঝংকার ঐ অবধি এসে ছড়িয়ে গেছে বিস্তীর্ণ সিন্ধুর ব্যাপ্তিতে,—অমর্ত্য নন্দনের বিস্তারে। দীর্ঘ স্বরের এই গুণটি জগদানন্দের কাজে লেগেছিল। অঙ্গকান্তির নহরে পড়ে যে রূপোল্লাস অতিশয় ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছিল, তাকে যেন বিশাল রূপনারায়ণে মিশতে দেওয়া হলো। রাধিকার রূপের সেই অলৌকিক পরম ভাবটি ঐ স্বর-সমাবেশের গুণেই মনের গোচরে এলো। 'প্রেমসিন্ধু প্যারী'-অংশটুকুই বিশেষ ভাবে সেই আশাতীত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—'আকার স্বরটাই বাংলায় বড়োত্বের সুর লাগাইবার জন্য আছে।'[১] আমার মনে হয়, শুধু আ-কার নয়, কেবল বাংলাতেই নয়,—দীর্ঘ স্বরের কাজই তাই।

মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে এসে পড়া গেছে! আনুষঙ্গিক কথা নিয়ে আর কালক্ষেপ করা সংগত হবে না। সুতরাং এবার ফেরা যাক। কবিতার কোনো বিশেষ শব্দ বা শব্দসমষ্টির অকারণ পুনরাবৃত্তি যে একটি দোষের কথা, এবং রবীন্দ্র-যুগের অনেক কবিই যে সে দোষে দোষী, সেই প্রসঙ্গ অনুসরণ করে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নমুনা দেওয়া হয়েছে। এইবার অন্যান্য কবির লেখা থেকে আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

একটি পুরো লাইন অথবা কিছু শব্দসমষ্টি বার-বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করবার অভ্যাস এ যুগে দুজন কবির মধ্যে খুবই বেশি দেখা যায়। একজন হলেন কালিদাস রায়; দ্বিতীয় জন বুদ্ধদেব বসু। আপাতদৃষ্টিতে এই দুজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা গেলেও কবিতার শিল্পকর্মে সজ্ঞান, নিরলস নিষ্ঠার গুণে দুজনের সাদৃশ্য অস্পষ্ট নয়। তবু পার্থক্য আছে বৈ কি! ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে অল্প-

বিস্তর প্রভেদ থাকাটাই তো প্রত্যাশিত। রুচির পার্থক্য ছাড়া এঁদের বয়সের পার্থক্যও ধর্তব্য। এই দু'জনের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। এখন শব্দ ও শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তির ক'টি নমুনার জন্যে প্রথমেই কালিদাস রায়ের 'বৃন্দাবন অন্ধকার', 'দুঃখী দেবতা', 'কবির নিমন্ত্রণ', 'বাপ পিতা মো'র ভিটে', 'সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ' ইত্যাদি রচনার উল্লেখ করা চলে।[১০] এইগুলির মধ্যে অধিকাংশই তরল পদ্য। সব রচনা থেকে টুক্‌রো-টুক্‌রো উদ্ধৃতি তুল্‌লে অনর্থক গ্রন্থের কলেবর-স্ফীতি ঘটবে। সুতরাং এই ক'টির মধ্যে কাব্যরসে এবং জনপ্রিয়তায় যেটি শ্রেষ্ঠ, সেই 'বৃন্দাবন অন্ধকার'-এর দ্বিতীয় স্তবকটি আগে তুলে দেওয়া যাক। ওর প্রথম স্তবকের কিঞ্চিৎ অংশ ভিন্ন প্রসঙ্গের দৃষ্টান্ত হিসেবে এর আগেই ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে তিনি লিখেছিলেন—

শিখীরা আর মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা,
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার।
রুচে না কারো নবনী সর, হেলায় লুটে অবনী' পর
করে না দধিমন্থ বধূ নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার

মোট চারটি স্তবকে 'বৃন্দাবন অন্ধকার' সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রথম এবং তৃতীয় স্তবকের মাপ দ্বিতীয় এবং চতুর্থের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি। প্রতি স্তবকের শেষে পাওয়া যাচ্ছে 'বৃন্দাবন অন্ধকার'-ধ্বনির ধ্রুব ঝংকার। কালিদাস রায় বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে বৃন্দাবনে নন্দ-পুরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতি-জাত শূন্যতার বেদনা প্রকাশ করেছিলেন। 'বৃন্দাবন অন্ধকার'—শোকব্যাকুল এই ধ্রুব ভাবনাটাই ওখানকার মর্মকথা। তাই ধ্রুবপদটি ভালোই লাগে। আগেই বলা হয়েছে যে, ব্যঞ্জন-বর্ণের অনুকূল সমারোহ কবির প্রকাশের মধ্যে ধ্বনির

অপরূপ স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে। 'বৃন্দাবন অন্ধকার'-লেখাটির মধ্যে অনুপ্রাসের কৌশলে তেমনি স্পন্দন, লালিত্য, বেগ ও নিবিড়তা সঞ্চারিত হয়েছে। 'গোপললনা নায়কহীনা শোকশায়কে শায়িতা দীনা' কিংবা 'চিৎকুমুদী ঢুলিছে মুদি' কিংবা 'নয়ননীরে বাড়ায় ব্যথা-পাথার ভানু-নন্দনার' এই সব ধ্বনি-সমাবেশের নিজস্ব এক রকম স্পন্দন-শক্তি আছে। মন তাতেই অনেকটা জারিত বা পরিপৃক্ত হয়ে পড়ে। তারপর সেই অবস্থায় ঢুল্‌তে-ঢুল্‌তে প্রসঙ্গের কাছ থেকে ঈষৎ সমর্থন পেলেই আরো অনেকটা কাজ হয়ে যায়। 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাতে সেই রকম ব্যাপার ঘটেছে। একে তো ব্যঞ্জন-সমারোহের আনুকূল্য ;—তার ওপর বাঙালীর অনেক দিনের প্রিয় কাহিনী বৃন্দাবনে কৃষ্ণের অনুপস্থিতি,—তার পরেও ভক্তিমান পাঠক আর কী-ই বা চাইতে পারেন ? ১৯৩০-এর আগে ঐটুকুতেই কবি অনেক সাধুবাদ পেতেন। সে যাই হোক্‌, এ কবিতায় এই সব নানা কারণে ধ্রুবপদ-টি উৎরে গেছে। কিন্তু 'কুসুম-শয়ন' নামে তাঁর আর একটি রচনায় তেমন হয় নি। আহ্বান-সূচক 'লো' অব্যয়টি বিশ বছর আগেও বাংলা সাহিত্যে অপাংক্তেয় হয়নি। তাঁর অনেক রচনাতে যেমন, 'কুসুম-শয়ন'-এও তেমনি 'লো' বিদ্যমান। লেখাটির প্রথম স্তবকে সখীকে ডেকে বলা হয়েছে—

আজি সখি, আমাদের কুসুমশয়ন।
মধুগন্ধে ভরপুর বায়ু বয় ফুর-ফুর,
হিয়া ছুটি দুর-দুর,—অলস নয়ন !
আজি সখি আমাদের বিলাস-শয়ন।

কখনো 'সখি', কখনো 'প্রিয়ে' সম্বোধনে একবার 'কুসুম-শয়ন,' অন্যবার 'বিলাস-শয়ন'-এর দিকে সখীর মনোযোগ আমন্ত্রণ করা হয়েছে। কুসুমের বিলাস-শয়নে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই এখানকার

ধ্রুব ভাব। সেই ধ্রুব কথাই বার বার এসেছে। কিন্তু এখানে না আছে পূর্ব-দৃষ্টান্তের সমধর্মী ব্যঞ্জন-ধ্বনির প্রশ্রয়, না আছে সত্যিকার অনুভূতির প্রবলতা। ফলে, এমন সব কথা বলা হয়েছে যা শুনলেই মনে হয় বানানো। যেমন তিনি লিখেছেন—

মানস-কুমুদ বনে চলো যাই সন্তরণে
উচ্ছলিত সন্তাড়নে অচ্ছোদ-তড়াগে,
মিলাইব চখাচখী বারিচর সখাসখী
বউ-কথা-কও গাবে সুরভি বেহাগে।

এই ভাষা অকৃত্রিম মিলনাকাঙ্ক্ষার ভাষা নয়! প্রিয়াকে একই সময় অচ্ছোদ-তড়াগে 'সন্তরণে' এবং চখাচখীর প্রতি 'উচ্ছলিত সন্তাড়ন' প্রয়োগের যৌথ কর্তৃত্ব বরণে আহ্বান করা মোটেই দোষের নয়। প্রেমিক মানুষরা প্রেমের শাসনে চলেন। তাঁরা অন্যথা নিরঙ্কুশ। কিন্তু সে অবস্থায় এ-রকম ভাষা আসে না। এ ভাষা ব্যাকুল আমন্ত্রণের ভাষা নয়। পর-পর দু'বার মূর্ধন্য ধ্বনির তাড়না মোটেই মনকে সুখী করে না। এতে 'অচ্ছোদ', 'মানস-কুমুদবন,' 'চখাচখী', 'বউ-কথা-কও' ইত্যাদি প্রথাসিদ্ধ অনেক সুখের উপাদান আছে,—উপকরণের কোনো ত্রুটি রাখেন নি কবি। শুধু 'সন্তাড়ন' আর 'তড়াগ' এসে উৎপাত ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঐ অচ্ছোদের কথাই কী চমৎকার কথা দিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন! তিনি বলেছিলেন—'অচ্ছোদ-সরসী-নীরে'। কালিদাস রায় তাঁর ঐ কবিতারই শেষ দিকে বলেছেন—

চন্দ্রমল্লী সীধু পানে চকিত চকোর গানে
বিধু পরিবেষ গায়ে পড়িবে গড়ায়ে!

সেখানে 'ড়'-এর ধ্বনি আরো মিহি, আরো মসৃণ; এবং সেই কারণেই সেটা আপত্তিকর নয়। কিন্তু চন্দ্রমল্লীর সীধু পানের এবং চকিত চকোরের গান শোনবার প্রস্তাব আজ থেকে বিশ-তিরিশ বছর

আগে বাংলা দেশের মানুষকে এই রকম সব শব্দের মধ্য দিয়ে যে স্বাদ দিতো, আজ নিঃসন্দেহে তা দেয় না। আজ মনে হয়, ও-সব ভুল সুর, ভুল কথা। এইভাবে নানান কাঁটায় জর্জর মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে, এ লেখাটির ধ্রুবপদে যে ভাবনাটা ব্যক্ত হয়েছে, সেটা সত্যিই সে যুগে অকৃত্রিম ছিল! 'আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন'—কথাটা ওখানে বড়োই কাব্যকথা বলে মনে হয়!

অথচ সত্যিই সে আমলের মনোভাবে ও-রকম বাক্-ভঙ্গির সমর্থন ছিল। তা না হলে, চাঁদ, আফিম-ফুল, শিরীষ ফুল, 'আ-লুলিত তনু' ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে একা কালিদাস রায়ই হয়তো ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্য রকম। বুদ্ধদেব বসুর 'পৃথিবীর পথে' ১৯৩৩-এর জুলাই মাসে প্রথম ছাপা হয়। ১৯২৬ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে সেই বইয়ের কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল এবং কবি নিজে সেগুলিকে 'প্রেমের কবিতা' নামে চিহ্নিত করেছিলেন। বাংলা কবিতায় সেকালের অন্তত একদলের বাক্-ভঙ্গি এবং বিষয়-রুচির নমুনা হিসেবে সে-বইয়ের 'বৈশাখী পূর্ণিমা' থেকে এখানে একটু অংশ তুলে দেওয়া হলো—

বৈশাখী পূর্ণিমা এলো বৈশাখী পূর্ণিমা এলো,
বৈশাখী পূর্ণিমা এলো আজ,
নদীর চঞ্চল জলে পল্লব-অঞ্চল-তলে
নব-জ্যোৎস্না কাঁদিছে সলাজ।
আজিকে উতলা বায় তনু তরু শিহরায়
মেলি দেয় লতার আঙুল,
রজত বসন পরি' নামিয়াছে বিভাবরী
আলুলিত করি তার চুল।

উপকরণের উল্লেখযোগ্য মৌলিকতা নেই এখানে। এখানেও সেই

গতানুগতিক প্রেমের গতানুগতিক লালিত্য! কালিদাস রায় 'আলুলিত তনু-'র কথা বলেছিলেন, বুদ্ধদেব তনু-র সঙ্গে 'শিহরিত তরু'-র একাত্মতা দেখিয়ে তরুর হাতে 'লতার আঙুল' বসিয়েছেন। সে সময়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—

আমার দেশের ব্যথিত পবন যদি কভু যায় ভেসে,
আদরের মত লুটায় তোমার লুলিত আকুল কেশে—[১১]

'বৈশাখী পূর্ণিমা এলো' একটি গভীর, ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস! কবিতা তো কবির ব্যক্তিগত বাণী-ই! কিন্তু মাত্র বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যেই এই কবিতা কেমন যেন পুরোনো, সাধারণ জিনিস বলে মনে হচ্ছে। 'বৈশাখী পূর্ণিমা এলো'—এই উচ্ছ্বাসটি পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হয়েও কালের জীর্ণতার ধূলি-কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছে না। শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তি এ-কবিতার নানা জায়গায় দেখা গেছে। আর একটু নমুনা দেখা যাক্—

আমারে ডাকিবে তুমি, আমারে ডাকিবে তুমি,
আমারে ডাকিবে তুমি আজ,
উতলা বাতাসে সখি, এই কথা কয়েছো কি?
দুরু-দুরু কাঁপে হিয়া-মাঝ!

তিনি আবার বলেছেন—

যদি করো অভিমান, যদি করো করো অভিমান,
যদি করো অভিমান আজ,
তোমার নয়ন-পরে সুশীতল স্নেহভরে
স্বপ্ন সম করিবো বিরাজ।

সব ক্ষেত্রে ঠিক একই শব্দসমষ্টি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করাতেই যে এঁদের আসক্তি ছিল, তা নয়। কোনো কবিরই সে-রকম

গোঁড়ামি থাকে না। আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্র-যুগের বাংলা কাব্য-প্রকৃতির একটি উল্লেখযোগ্য মুদ্রাদোষ হিসেবে শব্দ বা শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তির কথাই এখানে সাধারণ ভাবে বলা হচ্ছে। বুদ্ধদেব বসুর এই রকম পুনরাবৃত্তির মধ্যেও রকমফের ছিল। যেমন তাঁর 'বাসর রাত্রি' কবিতায় 'স্নেহের সুরা', 'নবীন মধু', 'লাবণি-মাখা' ইত্যাদি পুনরাবৃত্তির নমুনাগুলি। সেকালের আবেগের মধ্যেই পুনরাবৃত্তির ঐ ঝোঁকটা টিঁকে ছিল। স্তবক-বন্ধের কলাবিধিতেও সেই ঝোঁকই আত্মপ্রকাশ করেছে। 'বাসর রাত্রি'-র প্রত্যেক স্তবকে ঐ জাতীয় পুনরাবৃত্তি অন্তত একবার করে দেখা না দিয়ে পারে নি। সে কবিতাটির শেষ স্তবকে তিনি লিখেছিলেন—

রজনী তোমার উৎসব-বেশে
সাজিবে না কি?
আলোর পরশে জ্বালাবে না শত
তারার আঁখি?
ওগো ছোট কীট, ওগো ভীরু পাখী
তোমরা সবে,
মিলিবে না আসি' এই ক্ষণিকের
মধূৎসবে।
আজি যে মোদের শুভ-মিলনের
বাসর রাতি,
বাসর রাতি—
রজনী, জ্বালাও তোমার লক্ষ
তারার বাতি।
ধন্য যে আমি প্রিয়ার অঙ্গ—
পরশ মাখি',

আজিও, রজনী, উৎসব-বেশে
সাজিবে না কি ?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'সাগর-সংগীত' ১৯১০-এর দশকের বই। সেটি 'প্রেমের কবিতা' নয়। তবু তাতেও সে-কালের ঐ পুনরাবৃত্তির ঝোঁকটা দেখা গেছে। ঐ বইয়ের ২৮-সংখ্যক উচ্ছ্বাসটি এইভাবে শুরু হয়েছে —

ওগো কত কাল ধরে বহিতেছ তুমি
এ গীত বেদনারাশি হৃদয় ভরিয়া।
কত জন্ম জন্মান্তর
কত যুগ যুগান্তর।—
ওগো কত যুগ হতে ওই চিত্ত চুমি
এ গান ধ্বনিছে বিশ্ব পাগল করিয়া।—
কত যুগ যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর।

যাঁর সমবেদনা আছে, তাঁকে বলে দেবার দরকার নেই যে, এইসব স্বাদহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে সত্যিই কবির এক রকম দুর্বলতা ব্যক্ত হয়। বুদ্ধদেব বসু হয়তো যুগের খেয়ালে পড়ে তাঁর প্রথম দিকের অনেক কবিতায় অনেক শব্দ বার-বার বলেছেন। তিনি যথার্থ আবেগবান মানুষ। তাই তাঁর 'বৈশাখী পূর্ণিমা এলো' প্রভৃতি পুনরাবৃত্তি, যুগের মুদ্রাদোষ বলে মনে হলেও সেগুলি সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ভাবা যায়না। তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুগের রুচি বা প্রথা বেশ মানিয়েই গিয়েছিল। কিন্তু দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন তাঁর ঐ ২৮-সংখ্যক উচ্ছ্বাসে পর-পর চার বার 'কত যুগ যুগান্তর' ইত্যাদি বলে কবিতার আন্তরিকতার ব্যাপারে সেখানে তাঁর অনবধানেরই পরিচয় রেখে গেছেন। অথচ চিত্তরঞ্জন আবেগের মহাসমুদ্র ছিলেন। কিন্তু

আবেগ-প্রবণ স্বভাব থেকে আবেগ-সমৃদ্ধ কবিতার সম্ভাবনা ঠিক বর্ষার প্রাদুর্ভাবে ব্যাঙের মক্-মক্ আওয়াজের মতো সহজ, নিশ্চিত ব্যাপার নয়। কবিকে তাঁর আবেগের সমুচিত ভাষাটা আয়ত্ত করতে হয়।

যুগের মুদ্রাদোষ এবং কবিদের মধ্যে একই যুগপ্রথার রসসাফল্য ও রসবিরোধিতা সম্পর্কে এই মন্তব্য থেকে কবির আবেগের সঙ্গে কবিতার আবেগের সম্পর্ক কী রকম, সে কথা কতকটা অনুমান করা যাবে। আসল কথাটি আরো গভীর। কবির ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্তি, হৃদয়ের অনুভূতি, মস্তিষ্কের চিন্তা, পূর্ব-অভিজ্ঞতার স্মৃতি ইত্যাদি বিচিত্র চৈতন্য-লক্ষণ, সবই একযোগে উপযুক্ত ভাষা, ভঙ্গি, অলংকার, ছন্দ প্রভৃতি আবিষ্কার করে নেয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় রাজা বড়ো সুখে আছেন! যাঁরা রাজার ভেতরের খবর জানেন তাঁদের বলে দিতে হয় না যে, রাজকার্যটা মোটেই আরামের ব্যাপার নয়। কবির সৃষ্টিকার্য আর রাজার রাজকার্য অবিশ্যি পরস্পর তুলনীয় এক জাতের কৃত্য নয়। তবু, কবি-কৃত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে, এই অসম্পূর্ণ সাদৃশ্য-সংকেত থেকেই খানিকটা ধারণা পাওয়া যাবে। চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ পুনরাবৃত্তির প্রথাটি বাইরে থেকে দেখেছিলেন। তাই তাঁর ঐ কবিতার মধ্যে তিনি শুধু পুনরাবৃত্তির জড় দেহই গড়ে গেছেন, তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন নি।

কবিদের সমাজে সব যুগেই এরকম নকল, মুদ্রাদোষ, বাজেকথা, মিছে ভঙ্গি, ভুল সুর ইত্যাদি ঘটে থাকে। রবীন্দ্র-যুগের আগের যুগেও এরকম ব্যাপার কম ঘটেনি। বিহারীলাল, মধুসূদন, ভারতচন্দ্র —তাঁরও আগে বৈষ্ণব কবিরা—সকলেই এরকম প্রমাদের অল্প-বিস্তর নমুনা রেখে গেছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের একটি লাইন [Frailty, thy name is Woman] স্মরণ করে বিহারীলাল তাঁর 'প্রেম-

প্রবাহিনী'-র মধ্যে এক সুখী প্রণয়ী-দম্পতির সুখ-বিলুপ্তির বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, একদা যাঁদের প্রেম ছিল 'ক্ষীরসমুদ্র সমান,' সুধাময়, তুফানহীন,—হঠাৎ কী এক প্রবল বাতাসে তাঁদের সেই শান্ত সমুদ্র বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

> বিক্ষিপ্ত পর্বত-সম উৎক্ষিপ্ত তুফান
> প্রচণ্ড আঘাতে তট করে খান্ খান্।
> কোথায় অমৃত ? জল লুণ দিয়ে গোলা,
> কোথায় রতন ? তল পাঁকে ঘোর ঘোলা।[১২]

সবই বোঝা গেল। কিন্তু শান্ত সমুদ্রে ঝড় উঠে যে এমন দশা ঘটাতে পারে, সেটা সত্যিই তুষ্কল্প্য ব্যাপার। সমুদ্রের শান্তি-ভঙ্গ ঠিক এই চেহারাতে দেখা দেয় না। বিহারীলাল মজা-ডোবাতে খানিকটা নুন ঢেলে তাকে সমুদ্র নাম দিয়ে তারই পাঁক তুলেছিলেন! সমুদ্রে তুফানের চেহারা শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও দেখেছিলেন। তাঁদের বর্ণনা অন্যরকম। বিহারীলাল কিন্তু পাঠকের দৃষ্টিশক্তির স্বাধীনতা হরণ করে এই অবিশ্বাস্য মিথ্যা সমুদ্র বানিয়েছিলেন। পাঠকের হয়তো তাতে আপত্তি ছিল না, কারণ, এই ধরনের বহু নমুনার জোরেই বলা যায় যে, সে-কালে পাঠকরা কবিকে সত্যিই সত্যনিষ্ঠ মনে করতেন না! তাঁরা বিহারীলালের মধ্যে তবু তো যা-হোক নতুন কিছু পেয়েছিলেন। সে যুগের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট ছিল। মধুসূদনের শব্দের সমারোহ, প্রসঙ্গের গুরুত্ব, আর মহাকাব্যের ভার বাংলাদেশের সেকালের কাব্য-পাঠকের মনে একটু হালকা হবার, সহজ হবার, কাছের মানুষের অচিন সত্য শোনবার ইচ্ছা জাগিয়েছিল। সেই সুযোগটি গ্রহণ করে বিহারীলাল খুবই সহজ ভাষায় তাঁর এই 'প্রেম-প্রবাহিনী'র শেষ দিকে বলে ফেলেছিলেন—

কিছুতেই যখন তোমারে না পেলেম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম।'[৩]

বলা বাহুল্য, পৃথক ভাবে দেখলে এই শেষের দুটি লাইন যেমন অন্তরোত্তাপহীন মনে হয়, ওর আগের কয়েক ছত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে দেখলেও তেমনি নিরুত্তাপ মনে হয়। যে কোনো উক্তি জলের মতো সহজ, সরল হলেই তা মহৎ কাব্য হয়না। কবিতা এক রকম সরল-বক্রোক্তি, এই বল্‌লেই কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে বোধ হয়, সংক্ষেপে সত্য কথাটার ইশারা দেওয়া যায়!

যাই হোক্, রবীন্দ্র-যুগের কবিদের যুগ-রুচি-বশ্যতার আর-এক লক্ষণের কথায় আসা যাক্। সবাই জানেন যে, পুরোনো কথার স্বাদ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। নতুন শব্দের জন্যে তাই বার-বার অনুভূতির তাগিদ দেখা দেয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্যেই হোক্ আর, অন্য যে-কোনো রকম শব্দের সাহায্যেই হোক্, কবিকে তাঁর অনুভূতির দাবী মেটাতে হয়। কোনো কোনো সময় উদ্ভট বা চমকপ্রদ কিছু একটা বলে কবি তাঁর পাঠকের মনে যে আদৌ তাক লাগাতে না চান, সে কথা বলা যায় না! কিন্তু সে বঞ্চনা বেশিদিন চলে না! উৎকট শব্দ, অদ্ভুত ছন্দ, পাণ্ডিত্যের জাঁক, আধ্যাত্মিকতার অভিনয়, রাজনীতির লেবেল, অসার ঠাট্টা ইত্যাদি নানান্ জৌলুস দেখিয়ে কোনো-কোনো কবিতা-নামধারী রচনা পাঠককে বিভ্রান্ত করবার স্পর্ধা দেখিয়ে থাকে বটে, কিন্তু সে সব ভ্রান্তি যথার্থ কাব্য-রসিকের কাছে বাধা বলে গণ্য নয়। যিনি কবিতার সমালোচক, তাঁর নিজেরও কতকটা কবিপ্রাণ থাকা চাই। সেই প্রাণের গুণে তিনি কবিতায় বাজে-শব্দের উৎপাত এবং বাঙ্খিতের নতুনত্বের মধ্যে সত্যিকার পার্থক্যটি যে কোথায়, তা ঠিকই ধরতে পারেন। অদূরদর্শী কবিরা শুধু কি শব্দেরই জাঁক দেখিয়ে তাঁদের

পাঠকদের বিহ্বল করতে চান? উৎকট প্রসঙ্গের দৃষ্টান্তও কিছু কি কম চোখে পড়ে? প্রসঙ্গের বেলাতেও যেমন ভেজাল ধরা পড়ে, খাঁটি আর মেকি শব্দের বেলাতেও সমালোচকের বোধের গুণে সত্যিকার পার্থক্য ঠিক একইভাবে ধরা পড়ে। প্রসঙ্গের সঙ্গে কবিতার অন্যান্য অঙ্গের অবিচ্ছেদ্য যোগের কথা বার-বার বলা হয়েছে। এখানে কাব্যসৃষ্টির সেই সর্বান্বয়ী প্রকৃতির [organic quality] কথা দ্বিতীয় বার বলবার দরকার নেই। তার ব্যতিক্রম ঘটলেই সত্যনিষ্ঠ সমালোচক সে কথা জানিয়ে দেন। কবিদের রক্তমাংসের সত্তা তাতে হয়তো আহত হয়। সমালোচকেরও ভুল হতে পারে, কবিরও ভুল হতে পারে। দু'পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব না থাকলে শেষ বিচারের ভার নেন মহাকাল। কিন্তু সে অন্য কথা। রবীন্দ্র-যুগের বাঙালী কবিদের শব্দগত বিভ্রান্তির অবশিষ্ট আলোচনা দীর্ঘ হবে। তার আগে এ-যুগের কবি এবং কাব্যসমালোচকের অপ্রিয় সম্পর্কের নানা স্মৃতি থেকে একটি ঘটনা এখানেই বলে নেওয়া যাক্। বুদ্ধদেব বসু যখন পূর্বালোচিত 'বৈশাখী পূর্ণিমা এলো' প্রভৃতি পৌনঃপুনিক উক্তির সাহায্যে প্রেমের ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশ করছিলেন, সেই সময়ে কুমুদরঞ্জন মল্লিক এক বিখ্যাত মাসিক পত্রে 'কাকের বাসায়' নামে একটি পদ্য লিখেছিলেন। অন্য এক মাসিক পত্রে সে লেখাটির সমালোচনা-সূত্রে বলা হয়েছিল—

> বায়সের কর্কশ কণ্ঠে পায়সের মিষ্টতা আস্বাদন করা কবি কুমুদরঞ্জনের সরস হৃদয়ের দ্বারাই সম্ভব। আমাদের মনে হয় কবি ইচ্ছা করিলেই বাঘের গুহায়ও কাব্যরস পাইতে পারেন, আমরা এদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।[১৪]

সেই সমালোচনার উত্তরে সেই পত্রিকাতেই কুমুদরঞ্জন 'বাঘের

গুহায়' নামে আর একটি কবিতা লিখেছিলেন। তাতে বাঘ বলেছিল—

> সঙ্গ কবির নয়কো মোটেই মুখরোচক রে—
> পাঠিয়ে দিস ত্বরিৎ তোর সে সমালোচককে।[১৫]

কবিতার শব্দগত ভেজাল অনুসন্ধানের কাজে নামবার আগে সমালোচকের পক্ষে এইসব স্বাভাবিক বাধা এবং অস্বাভাবিক দুর্গতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার।

শব্দের যে সব আচার কবিকে মেনে চলতে হয়,—যা তাঁর মানা উচিত, এক কথায় তাকে বলা চলে—শিল্পের শিষ্টাচার। কবিরা যখনই তা লঙ্ঘন করেন, পাঠক তখনই অশান্তি ভোগ করেন। রবীন্দ্রনাথের সময়ে,—রবীন্দ্রনাথের আগে,—এবং আজকের দিনেও কেউ কেউ সেই শিষ্টতা উপেক্ষা করেছেন, করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন বললে অন্যায় হবে না। কাজে-কাজেই শব্দগত অশিষ্টতা বাংলা কবিতার 'আধুনিক' পর্বের কেবল দশ-বিশ বছরের ব্যাপার মনে করা ঠিক হবে না। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কমোহন সেন লিখেছিলেন—

> যেমন সমাজের মধ্যে, তেমন সাহিত্যের মধ্যেও অনেক শিষ্টাচার আছে, যাহা কদাপি লঙ্ঘন করিতে নাই; এবং লঙ্ঘন অপরিহার্য হইলেও শাস্তিটুকুন মানিয়া লওয়াই কর্তব্য। অস্পষ্টতা, অনির্বচনীয়তা অথবা সংকেতশক্তি যে সঙ্গীত এবং চিত্রশিল্পের একটা পরম গরীয়সী শক্তি, তাহা কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি কোন কালে অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু কাব্যের মধ্যে, সারস্বত আচারের মধ্যে নানা দিকে উহার সীমা আছে।

এই সীমাটি সকলের বোধে ধরা পড়ে না। ভূয়োদর্শী সাহিত্য-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেই সীমার কথা বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন—

> বিশেষতঃ শিল্পমাত্রের মাহাত্ম্য চিরকাল স্থান কাল এবং বিবক্ষার উপরেই নির্ভর করে। সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা, অনুরণন বা অস্পষ্টতাও নানা প্রকার হইতে পারে। কোন পদার্থ দূরবর্তী, দূর-দুরান্ত-বিগাহী বা অসীমের নিকটবর্তী বলিয়াই অস্পষ্ট ; কোনটা বা নিজের চারিদিকে ইচ্ছাকৃত ছায়া-কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়াই অস্পষ্ট। কোন পদার্থ নিজের ভাব-সৌন্দর্যের মাহাত্ম্যেই সাধারণের জন্য দুর্গম ; কোনটা বা নিজের চতুর্দিক অযথা কণ্টকাবৃত করিয়াই দুর্গম।[১৬]

সাহিত্য সমালোচনার গুণপনা সম্বন্ধে সে যুগে প্রমথ চৌধুরীর যে খ্যাতি ছিল, শশাঙ্কমোহনের তা হয়নি। কারণ, তাঁর ভঙ্গিটাই গম্ভীর ছিল। কিন্তু আজ আমরা কবিতাতেও আভিধানিক শব্দের প্রচলনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শক্ত শব্দের সাহায্যে চিন্তাশীল গদ্য-লেখকের বিবক্ষা ব্যক্ত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের 'স্বগত' বইখানিতে, এবং ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'-এর অন্যান্য লেখকদের রচনায়। কাজে-কাজেই আজ শশাঙ্কমোহনের 'বঙ্গবাণী' পুনরায় পড়ে দেখবার দিন এসেছে। শতাব্দীর প্রথম পনেরো বছরের বাংলা কবিতার বিষয়ে তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলে গেছেন। এখানে বিশেষ ভাবে কবিতার ভুল কথা আর ভুল সুর সম্বন্ধে আলোচনা সূত্রে তাঁর আর একটি মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলে গেছেন—

> এ কালের সাহিত্যিকগণের যেন নিজের কথা বলিবার প্রয়াস নাই। তাই তাঁহাদের ভাষা স্থানে স্থানে নিতান্ত কপট ও গর্বিত। তাঁহাদের ছন্দ (বাঙ্গালী বড় মানুষের ছেলের ন্যায়)

আপন শরীরের ভার বহন করিয়াও চলিতে পারে না। উহার পেশীসমূহে অণুমাত্র বস্তুভিত্তি, স্বাস্থ্য বা কর্মনিষ্ঠার আভাস নাই। অশিক্ষা, অনুকরণ, ভাবোন্মত্ততা, অসহিষ্ণুতা এবং অতিরিক্ত যশোলিপ্সাই এ সমস্ত দোষের মূল কারণ।[১৭]

এই নির্জলা, অপ্রিয় সত্য নিজের মুখে বলতে দ্বিধা বোধ করাই স্বাভাবিক। শশাঙ্কমোহন রক্ষা করলেন! গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলা দেশের কবিরা এ সত্য বার-বার বিস্মৃত হয়েছেন।

গত শতকে বিশেষভাবে অভিধানবদ্ধ বা আভিধানিক শব্দ সব চেয়ে বেশি দেখা গিয়েছিল মধুসূদনের কবিতায়। তিনি শুধু এক জাতের শব্দই ব্যবহার করেননি; তিনি সমান উৎসাহে নানা জাতের শব্দ ব্যবহার করে গেছেন।

জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম সঞ্চালনে![১৮]

কিংবা—

লক্ষ রক্ষঃ-শিল্পী আশু নির্মিলা মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;[১৯]

—ইত্যাদি শব্দ-সমাবেশের দৃষ্টান্তে মধুসূদনের বিশেষত্বের পরিচয় আছে। এই দুটি উদাহরণের কোনোটিতেই অবিশ্যি বিশেষভাবে অভিধানবদ্ধ শব্দ নেই; প্রথমটিতে 'খেদান' এবং দ্বিতীয়টিতে 'পাটিকেলে' আমাদের কানে লাগছে। ঐটুকুই এখানকার বিশেষত্ব। 'খেদান' তৎসম শব্দ নয় বলেই যে ওটিকে কান একটু পৃথকভাবে পাচ্ছে, তা নয়। যদি শুধু সেই কারণেই হতো, তাহলে 'যেমতি'-তেও লাগতো। কিন্তু তা নয়।

বাংলা কবিতায় 'যেমতি' শব্দটি অনেকদিন থেকে চলে আসছে।

কিন্তু 'খেদান' ঠিক সে রকম নয়। 'খেদ' ধাতু অবিশ্যি আগেও ছিল। কিন্তু তা থেকে অধম পুরুষের সম্মানসূচক 'খেদান' রূপটি বানিয়ে নিয়ে তার আগে 'জননী', এবং পরে 'মশকবৃন্দ', 'সুপ্ত', 'সুত', 'করপদ্ম' এবং 'সঞ্চালন' এতোগুলি তৎসম শব্দ পাশাপাশি বসাবার রেওয়াজ ছিলো না আগেকার আমলে। কঠিন আভিধানিক শব্দ হলেই কান যে পৃথক ব্যবহার করে, তা নয়। এই আলোচনায় এর আগে যে কথাটি বার-বার বলা হয়েছে এখানে শব্দের প্রসঙ্গেও সেই কথাটি পুনরায় বলা দরকার। ১১৬-১৭ পৃষ্ঠায় অডেনের মন্তব্যের যে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে এ-বইয়ের ৮০-র পৃষ্ঠায় রিচার্ডসের যে মন্তব্য স্মরণ করা হয়েছে সেটিও মিলিয়ে দেখা চাই। কবিতার প্রত্যেক শব্দ পারিপার্শ্বিক অন্যান্য শব্দের সঙ্গে তার নিজের রস-সম্পর্কটি সংগত হতে দেবে, প্রত্যেক শব্দের কাছে তাই তো প্রত্যাশিত! 'খেদান' এবং 'পাটিকেলে' এদিক থেকে উভয়েই আমাদের নজর দাবি করে। এখানে সত্যিই আপত্তিজনক গুরু-চণ্ডালী সমাবেশ ঘটেছে। আবার মধুসূদনের একই কাব্যে যখন দেখা যায়—

বিদ্যুৎঝলা-সম চক্‌মকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শনশনে![২০]

—তখন তৎসম শব্দ 'কলম্বকুল'-এর ওপরেই আমাদের নজর পড়ে। ওটি যেন বেশি উৎকট। উনিশের শতকে মধুসূদনের দেখাদেখি এই ধরনের শব্দ-প্রয়োগ অনেকে মেনে নিয়েছিলেন।

বিশের শতকের প্রথম অবধি বাংলা কবিতার সমালোচনার ক্ষেত্রেও পণ্ডিতরা সংস্কৃতের পরিভাষা ব্যবহারেই বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। মধুসূদনের সমালোচকদের মধ্যেও সেই আদর্শই দেখা

গেছে। তাঁরা শব্দ-বিশেষত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'নিহতার্থতা', 'অবাচকতা', 'চ্যুত-সংস্কৃতি', 'ক্লিষ্টতা', 'অধিকপদতা', 'ন্যূনপদতা', 'অর্ধান্তরৈকপদতা' ইত্যাদি সংস্কৃতের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। দীননাথ সান্যাল, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ প্রভৃতি টীকাকার অধুনা-অচল এই পুরোনো রীতিতেই মধুসূদনের শব্দ বিচার করেছেন। যেমন, দীননাথ বলেছেন যে, মেঘনাদবধকাব্যের ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মীকে 'জগদম্বা' নামে অভিহিত করে মধুসূদন 'নিহতার্থতা' দোষের পরিচয় দিয়েছিলেন,—শব্দের অপ্রচলিত অর্থে প্রয়োগ-জনিত দোষের নাম 'নিহতার্থতা'; 'নিকষে যথা অসি' বলাতে 'অবাচকতা দোষ হয়েছে, কারণ, 'নিকষ' মানে তলোয়ারের খাপ নয়, মধুসূদন বোধ হয় 'নিষ্কাশ' শব্দের ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ ওটি ব্যবহার করেছিলেন; 'শিরোপরি' কথাটা সংস্কৃতের 'শিরস্' এবং 'উপরি' এই দুটি শব্দের প্রথমটিকে 'শির' ধরে নিয়ে সেই ভুল বানানের ওপর নির্ভর করে ভুল আইনে তৈরি সন্ধিপদ,—অতএব ওর নাম 'চ্যুত-সংস্কৃতি'; সমুদ্রের তট অর্থে 'যাদঃ-পতি-রোধঃ' এই কষ্টকর শব্দ ব্যবহারের ফলে 'ক্লিষ্টতা' ঘটেছে; 'অবগাহে' বললেই জলে দেহ ডুবিয়ে স্নান করার অর্থ ব্যক্ত হয়,—সে জায়গায় 'অবগাহে দেহ' বলাতে 'অধিকপদতা' দোষ হয়েছে; 'শঙ্খ, চক্র, গদা, চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ' বলাতে তিন হাতের খবর পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু পদ্মধারী বিষ্ণুর চতুর্থ হাতটা অনুক্ত থেকে গেছে, তাই একে 'ন্যূনপদতা' বলা হয়; তারপর 'সন্দেশবহ', এই পুরো শব্দটাকে ভাগ করে নিয়ে এক চরণের শেষে 'সন্দেশ' বলে নিয়ে পরের চরণের শুরুতে 'বহ' বললে একপদের অর্ধান্তর ঘটে,—তারই নাম 'অর্ধান্তরৈকপদতা'। এইভাবে আমাদের দেশে নানান নামের সাহায্যে শব্দের বিভিন্ন দোষের পরিচয় বহুকাল থেকে ব্যক্ত হয়ে আসছে। বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখলে একথা বলতেই হবে

যে, পুরো এক-একটি কবিতার বা কাব্যাংশের মধ্যে অভিপ্রেত অর্থ এবং ব্যঞ্জনা, দুয়েরই সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রেখে এইসব দোষের কথা ভাবা দরকার। বাংলায় সংস্কৃতের আইনে 'চ্যুত-সংস্কৃতি' বিচার করাটা সব ক্ষেত্রে যুক্তিসহ নয়। কবিরা 'চ্যুত-সংস্কৃতি' অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন কেবল সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে ব্যাকরণের আইন লঙ্ঘনের ফলে ভাষার লোকব্যুৎপত্তি, কাব্যব্যুৎপত্তি ইত্যাদি সব পক্ষেরই বিরোধিতা উদ্রেক করে তাঁদের অভিপ্রেত অর্থ বা ব্যঞ্জনা বাধাগ্রস্ত হয়। আসল কথা হলো—কবির অভিপ্রায় এবং পাঠকের ভাষাবোধ এই দুইয়ের মধ্যে মসৃণ যোগাযোগ রাখতে হবে।

'শিরোপরি' কথাটা বাংলা 'লোকব্যুৎপত্তি'তে দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠতা তো শুধু বাইরে থেকে অনুষ্ঠানের মিল মিলিয়ে দেখবার জিনিস নয়। 'তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি' বল্‌লে তাম্রের সঙ্গে থালা-র সমাবেশ আপত্তিকর মনে হয়না। প্রথমটি তৎসম ; দ্বিতীয়টি তা নয়। বাংলায় প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত, সাধারণত ইত্যাদি শব্দে বিসর্গ উচ্চারণের রেওয়াজ না থাকলে বানানে বিসর্গ রক্ষা করবার কষ্টসাধ্য কৃত্রিম প্রথাও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হবে ; সেটাই স্বাভাবিক। সমাসে যদি 'তাম্রথালা' চলতে পারে, সন্ধিতে তাহলে বহু প্রচলিত 'শিরোপরি' তিরস্কৃত হওয়াটা সংগতির বিরোধী। 'বাংলায় সংস্কৃতের সব আইন এবং সব শব্দ ব্যবহার হয় না' বল্‌লে কেউ ভুল ধরবেন না ; কেবল গোঁড়া পণ্ডিতরা 'ব্যবহার' কেটে হয়তো 'ব্যবহৃত' বসাতে চাইবেন। আমরা 'দিল্লীশ্বর' বলি, কিন্তু 'কোটাবৃত' বলিনা। 'মতান্তর হলেও মনান্তর হয়নি' বল্‌লে চ্যুতসংস্কৃতির অভিযোগে 'মনান্তর' আক্রান্ত হবে কি? পদে পদে ব্যাকরণ লঙ্ঘন করবার উচ্ছৃঙ্খলতা ভালো নয়, —কিন্তু 'ইতিমধ্যে' বা 'ইতিপূর্বে' বাংলায় এতো বেশি ব্যবহৃত হয়েছে

যে, আজ ও-সব শব্দ ভুল বললে বাড়াবাড়ি হবে। যাই হোক্, কবির অন্তরের দিকে নজর না রেখে 'অধিকপদতা' দোষটিও যদি কেবল অকাট্য আইন হিসেবে ধরা হয়, তাতেও বিভ্রান্তি অবধারিত। কবিতায় সমস্ত পুনরাবৃত্তিই তো এক পদ বা অভিন্ন পদসমাবেশের অধিক প্রয়োগ। 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে' বল্‌লে ফুল যে ফুটবেই, সেই অবধারিত ভবিষ্যতে মনের দৃঢ় বিশ্বাস ধ্বনিত হয়ে থাকে। তেমনি কোনো বিশেষ বোধের ব্যাকুল, দৃঢ়, বিশদ, বিস্তারিত প্রকাশের অভিপ্রায়েই কবিরা অর্থ-প্রকাশের অতিরিক্ত কিছু-কিছু পদ ব্যবহার করে থাকেন। সকল ক্ষেত্রেই কবির অনুভূতি, অভিপ্রায়, বেদনা বা আনন্দের দিক থেকেই কবিতার দোষ-গুণ বিচার করা বাঞ্ছনীয়। একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে—

অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে!
আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি,
আমার সমস্ত সুখদুঃখের পরিণাম—
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী,
সকল-পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে॥

—রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট'-এর প্রসিদ্ধ 'পৃথিবী' কবিতা থেকে এই যে ক'টি লাইন তুলে দেওয়া হলো, তাতে 'অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষ' অংশের 'অসংখ্য' কথাটা নিশ্চয় স্থূল অর্থের দিক থেকে বাহুল্য বলতে হবে। তারপর, 'সকল পরিচয়-গ্রাসী' বিশেষণটির মধ্যেই 'নামগ্রাসী' এবং 'আকারগ্রাসী'-র অর্থ নিহিত আছে। কিন্তু এইসব বাড়তি শব্দও এ-কবিতার দরকারি শব্দ। চৈতন্যের যে মগ্ন

শ্লোকে কবিতার উৎস,—কোনো কবিতায় একই অর্থের শব্দগত আধিক্য ঘটলে সেই অনুভূতিবেদ্য গহনের দিকে পাঠককেও অবহিত হতে হবে। সেই গহনে যাঁর শ্রদ্ধা আছে তিনিই জানেন, শব্দকায় হলেও কবিতা মোটেই শব্দমাত্র বা শব্দার্থসর্বস্ব নয়। এ-রাজ্যে প্রাণহীন কায়া আমাদের ভাবনার বহির্ভূত উদ্ভট তর্ক বা জল্পনা মাত্র। এক বা একাধিক সুরের সাহায্যে এবং উপযুক্ত শব্দ-পর্যায় অবলম্বন করেই কবির মনের প্রক্ষেপ ঘটে থাকে। কবিতা শুধু সুরও নয়, কেবল শব্দও নয়। কবিতার মানে হয় বটে, কিন্তু মানেটা ঠিক শব্দের অভিধানগত অর্থ বা বাক্যের অন্বয়ার্থ মাত্র নয়। তবে সে কী রকম? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুটি কলি মনে পড়ে—

> কে সে আমার কেই বা জানে—কিছু বা তার দেখি আভা,
> কিছু বা পাই অনুমানে, কিছু তাহার বুঝি না বা।[২১]

রসের দিক থেকে,—অর্থাৎ কবির বোধ বা উদ্দেশ্য বললে যা বোঝায়, সেই দিক থেকেই সমস্ত ব্যাপারটি লক্ষ্য করা দরকার। করুণানিধানের 'ঝরা ফুল'-এর ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—

> করুণানিধান বাবুর কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় যেন তিনি প্রকৃতির দুলাল,—প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডারের চাবি চুরি করিয়া তিনি তাহার সমস্ত লুকানো ঐশ্বর্য দেখিয়া আসিয়াছেন ও বালকের ন্যায় সরল প্রাণে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গীতে ছন্দে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

এ-প্রশংসা কালের বিচারে সমর্থিত হবে কি না,—দেশ, কাল এবং রচয়িতার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিশ্চয় সে প্রশ্ন আজ আমাদের মনে দেখা দিয়ে থাকে। করুণানিধান প্রকৃতির মধ্যে কী দেখেছিলেন,

কী-ই বা পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে জানতে হলে কোনো সমালোচকের মন্তব্যের ওপর ভরসা রাখার চেয়ে মূল কবিতাগুলি পড়ে দেখাই সংগত। যা-কিছু পাওয়া সম্ভব, কবির কথা আর সুরের মধ্য দিয়েই তা পেতে হবে। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও তাঁর প্রশংসাপত্র লেখবার সময়ে সে-ভাবনা ত্যাগ করতে পারেননি। করুণানিধানের শব্দ-নির্বাচনের দিকে তাঁকে বিশেষ নজর রাখতে হয়েছিল। তিনি ঐ ভূমিকার মধ্যেই জানিয়ে গেছেন—

> প্রকৃতির দুলাল ব্যতীত আর কেহ কি এরূপ কবিতা লিখিতে পারেন? 'চেলীর ঝিলিমিলি', 'চুলের তারার মালা', 'পাখীর গানে কাঁকন বাজে', 'অলক-ঢাকা কোমল পলক' প্রভৃতিতে যে ভাব এবং শব্দের সামঞ্জস্য, যে মিলন-মাধুর্য রহিয়াছে, নিপুণ শিল্পী ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা এ সামঞ্জস্য রক্ষা, এ মাধুর্য-বিকাশ সম্ভবপর নহে;—কবি তাঁহার কবিতায় বাছিয়া বাছিয়া যে শব্দগুলি বসাইয়াছেন, কবিতাটির অঙ্গহানি না করিয়া একটিরও পরিবর্তে আর একটি শব্দ যথাস্থলে প্রয়োগ করা আর কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয়না। এইখানেই 'ঝরা ফুলে'র মালাকরের অশেষ গুণপনা।

সুধীন্দ্রনাথের এই প্রশংসা পুরোপুরি সমর্থন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কবিতার শব্দ-বিচারের মান বা নিরিখটি তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। শব্দের 'সামঞ্জস্য' এবং 'মিলন-মাধুর্যের' ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। সেই দুটি বিষয়ে চিরকালই আমাদের বিশেষ হিসেবী হতে হয়। কেবল এক বা একাধিক বিশেষ শব্দ আঁকড়ে ধরে কবির বোধ বা অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় না। রচনার সমস্ত শব্দের প্রবাহের মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দের সামঞ্জস্য,—এমন কি কবির অভিপ্রেত কিঞ্চিৎ বিরোধ রক্ষা করেও রসের নিশ্চিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা

দরকার। সব কবিকে সকল অবস্থাতেই ভাবের যাবতীয় ঐশ্বর্য তো শব্দেরই সাহায্যে, শব্দেরই মাধ্যমে বাহিত হতে দিতে হবে। কিন্তু কবিতায় শব্দের বিশেষত্ব এই যে, ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, ধ্বনি ইত্যাদি সব কিছুই বহন করে থাকে শব্দ। সেজন্যে কবিতায় শব্দ আর শব্দবাহিত ভাবের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায় ; এতো ঘনিষ্ঠ যে কেউ যদি বলেন কবিতায় শব্দই ভাব, ভাবই শব্দ,—তাহলে তাতে বাহক-বাহনের অভেদত্ব দোষ ঘটেছে বলা রসিকের কর্তব্য নয় ; যিনি প্রকৃত কাব্যরসিক তিনি হয়তো পূর্ব কথা সংশোধন করে বলবেন—রসই শব্দ, শব্দই রস ; এবং সেই সঙ্গে একথাও বলতে ভুলবেন না যে, বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে কোনো একটি বিশেষ শব্দে সেই রসধর্মের পূর্ণ দ্যুতি বা দ্রুতি দেখা যাবে না,—সমস্ত রচনাটির আদ্যন্ত বিস্তারেই তার পরিব্যাপ্তি! অর্থাৎ, একটি, দুটি পৃথক বা বিচ্ছিন্ন শব্দ নয়,—শব্দ-সমাবেশই রস, রসই শব্দ-সমাবেশ! এইখানে কোল্‌রিজের কথা মনে পড়তে পারে ; তিনি বলেছিলেন, ভালো গদ্যের উপযুক্ত সংজ্ঞা এই যে, তাতে ঠিক জায়গায় ঠিক কথা বসে,—আর ভালো কবিতায় যথার্থতম শব্দগুলিই যথাস্থানে বসে থাকে। কোনো এক সকালের অভিজ্ঞতার কথা বল্‌তে গিয়ে করুণানিধান লিখেছিলেন—

পরণে বসন লাল
খোলা কুন্তলজাল
কাছে এল এক বালা ;

গ্রীবাটি বাঁকায়ে ধরি
দাঁড়াইল সুন্দরী—
আননে করুণা ঢালা।

পায়ের আল্‌তা লাল
চুম্বিল কেশজাল
নত করিল সে মাথা
গৌর-কণ্ঠে তার
ভাতিল দীপ্ত হার
শুভ্র শেফালী গাঁথা।[২২]

এ নমুনাকে শব্দের সামঞ্জস্যের নমুনা বললেও যেমন অন্যায় হবে, এটিকে ভাব এবং কথার মিলন-মাধুর্য বললেও তেমনি অসংগতি ঘটবে। 'খোলা কুন্তলজাল' মোটেই ভালো শোনাচ্ছে না। বালিকাটি মাথা নত করেছে শোনা গেল, কিন্তু তার ভঙ্গি অস্পষ্ট। 'ভাতিল' ক্রিয়া-র সঙ্গে গলার শেফালী মালা-র সংগতি রক্ষার জন্যে মাথা তো নত হয়েইছে,—তবু ছবিটা স্বাভাবিক হয়নি। রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাতেও 'বালা', 'চুম্বিল' ইত্যাদি শব্দ বার-বার চোখে পড়ে। তাতে রসহানি ঘটে নি। শব্দের বিশেষ কোনো শ্রেণী বা জাতি বা রূপ নিয়ে আপত্তি ওঠবার কথা নয়। 'পায়ের আলতা লাল চুম্বিল কেশজাল'—এই বাড়াবাড়ি যদি সত্যিই কবির কল্পনার সমর্থন পায়, তাতেও আপত্তির কথা নেই। কিন্তু সবটা মিলিয়ে দেখলে,— কবি যে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি এবং আনুষঙ্গিক মননের সাহায্যে এই পদ্যাংশটি সৃষ্টি করেন নি, সে কথা বোঝবার জন্যে, অতীত-বিদ্বেষী উগ্র 'আধুনিক' হবার দরকার নেই। করুণানিধান তাঁর কবিনেত্র দিয়ে ও-ছবি দেখেন নি। তিনি ওটি বানিয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী এইসব দেখেই বলেছিলেন, 'প্রিয় কবি' হতে হলে 'জোর করা ভাব, আর ধার করা ভাষা' চাই। সে উক্তিটি এ-বইয়ের ৪৯-এর পৃষ্ঠায় ছেপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী বিদ্রূপ করেই ও-কথা বলেছিলেন। জোর করা ভাব আর ধার করা ভাষার জোরে

সত্যিকার প্রিয় কবি হওয়া যায় না। সে সময়ে 'সবুজ পত্র', 'ভারতী', 'মানসী', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা ছিল,—কম-বেশি শক্তিমান কিছু-কিছু কবিও ছিলেন। কিন্তু বাংলার কাব্যলোকে সেই নানা সমালোচনার বিচিত্র ভ্রান্তিময়, অনুকরণ-প্রধান অতি-লালিত্যের মধ্যে নজরুল যখন হঠাৎ এসে বললেন—

নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।[২৩]

—তখন সে কবিতার বিষয়টা কি রকম, তার ভাষাটা কেন নতুন, ইত্যাদি অসংগত অভিযোগ জাগেনি রসিকের মনে। রসিক ব্যক্তিও অবাক বোধ করেন—নতুন কথা তাঁর মনেও ধাক্কা দেয়। আনন্দের হুকুম পেলে,—দরকার হলে তিনিও শক্ত বা অচেনা শব্দের অর্থ নির্ণয়ের জন্যে অভিধান খুলে থাকেন। কেবল প্রথা-বশীভূত অরসিক মানুষই নিজের সংস্কারের মধ্যে নিজের অহংকার নিয়ে বসে থাকে। এ-কবিতার আগেও বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় নজরুলের অন্য লেখা বেরিয়েছিল। ইস্‌লামী শব্দ তাঁর আগে সত্যেন্দ্রনাথই বেশ চালু করে গিয়েছিলেন,—সত্যেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে মোহিতলাল আরো এগিয়েছিলেন। হাফেজ-এর প্রতি আমাদের অনুরাগও অনেক দিনের। ১৩২৬-এর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার' শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর 'মুক্তি'-কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। আজহার উদ্দীন খান সাহেবের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' বইখানির মধ্যে সে কবিতার কয়েক লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৩২৬-এর 'সওগাত'-এর আশ্বিন সংখ্যায় 'কবিতা—সমাধি' নামে তাঁর আরো একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। ঐ বছরেই 'প্রবাসী'তে তাঁর লেখা হাফেজের অনুবাদ 'আশা' কবিতা ছাপা হয়। এই তিনটির একটিতেও যথার্থ স্বাতন্ত্র্য ছিলো না। প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে হাফেজের সেই অনুবাদটি ফেরৎ পেয়ে

পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'প্রবাসী'-র চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন। চারুচন্দ্র সেটি ছেপেছিলেন, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ছাপেন নি। কারণ—

বসেই আছে, তেমনি বিভোর থাক রে প্রিয়ার আশায়,
তার অলকের একটু সুবাস পশ্‌বে তোরও নাসায়।[২৪]

—ইত্যাদি কথার মধ্যে বা সুরের মধ্যে না ছিল নবাগত ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশের সুযোগ, না ততোধিক কোনো দাবি। কিন্তু পরের বছর যখন 'মোহর্‌রম' বের হলো, তখন আর তাঁর অভিনবত্বের বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না। তাঁর 'সঞ্চিতা'-র মধ্যে এ-কবিতাটি থাকা উচিত ছিল; দুর্ভাগ্যের বিষয়, নেই। এ-কবিতার কথাও বানানো নয়, সুরও বানানো নয়—জোর করা ভাবের জিনিস নয়, ধার করা ভাষার চটক নয়। এই অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে এক হয়ে বিদ্যমান রয়েছে স্রষ্টার সেই উল্লাস,—যে কথা পরে ব্যক্ত হয়েছিল 'দোলনচাঁপা'র প্রসিদ্ধ একটি কবিতায়—

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে।[২৫]

নজরুলের সমস্ত লেখার সর্বত্রই যে কথা আর সুরের নিখুঁৎ সামঞ্জস্য ঘটেছে, সেকথা তাঁর অন্ধ ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ বলবেন না। সে কথা নয়। শব্দের ঔচিত্য কবির বোধ অনুভূতি, মনন, প্রেরণা ইত্যাদি আন্তর উৎসাহের কষ্টিতেই যে বিচার্য, সেই প্রসঙ্গটিই এই সূত্রে পুনরায় বলে নেওয়া গেল। এই পুনর্ব্যাখ্যান মনে রেখে যখন দেখা যায় কেউ লিখেছেন—

আছয়ে পড়ি শঙ্খ এক মহাসাগরতীরে
জীবনহীন, শুষ্ক কায়া, বালুকা তারে ঘিরে—
অদূরে তার সিন্ধু নাচে
আকাশ নানা বরণে সাজে,

স্তব্ধ হয়ে পাতাল পানে নুইয়া-পড়া শিরে—
শঙ্খ প'ড়ে আছয়ে সহি আতপহিমনীরে ![২৬]

তখন সুরের ঝোঁকে পড়ে 'আতপহিমনীরে'-র মতন কৃত্রিম শব্দকে মন স্বীকার করে বটে,—কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না। আমাদের শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকের মানুষ ছিলেন এই কবি। তাঁরই আর একটি লেখাতে যখন একাধিকবার 'নিশ্চয়'-অর্থে 'নিচয়' শব্দটার প্রয়োগ দেখা যায়, তখন মন আরো ক্ষুব্ধ হয়। এবং যখন তাঁর বিশেষ মুগ্ধ অবস্থাতেও তিনি বলেন—

নীল জল, নীলাকাশ, দ্রাণ রৌদ্রভার,
গম্ভীর জেলের ছেলে মৎস্যের শীকার ![২৭]

কিংবা—

সমুদ্রের বালুকার শুক্তিশেষ খেলা
আর নানা প্রকারের মৎস্যহাড় মেলা ![২৮]

—তখন সত্যিই 'দ্রাণ' কথাটা ছাপার ভুল না অন্য কিছু, সেই সব পাঁচ রকম ভেবে বিহ্বল বোধ করতে হয়; আর মনে হয় 'খেলা' কথাটা বড়োই বেমানান হয়েছে। আমাদের শতাব্দীর আগেও এরকম বেমানান শব্দ অনেক চলেছে; আর, এখনো চল্‌ছে। কবিদের শব্দ-শিক্ষা হয় নি বল্‌লে কড়া শোনাবে। বরং সাধারণ ভাবে এই কথাই বলা ভালো যে, তাঁদের শব্দবোধ তাঁদের জীবন-বোধেরই প্রক্ষেপ। জীবনের স্রোতে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রগত, সমাজগত এবং নানা বিদ্যাগত বিচিত্র অভিজ্ঞতা পেতে পেতে জীবনও পরিণত হয়, শব্দও পূর্ণ হয়ে ওঠে। কবিতার শব্দ বিচারের কাজে নেমে আমি এই সত্যই দেখতে পাই। তিরিশের দশকের পূর্ব মুহূর্তে যতীন্দ্রমোহন বাগচী একটি বর্ষার কবিতাতে লিখেছিলেন—

জাগে ধরণীর গায়ে কাঁটা রস রভসে
পাশে সরসী আরসি সম হাসে হরষে ;
জল কাঁপিয়া উঠে
ঢল ছাপিয়া ছুটে
সুখে চক্ চক্ করে চোখ পুলকরসে ![২৯]

তারই কাছাকাছি সময়ে নতুন কালের জনগণের কবিও এক ফাঁকে বলে নিয়েছিলেন—

সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে,
পথ আজি নির্জন ;
বাদলা-পোকার ফুর্তি নিয়ে
জাপানি লণ্ঠন।
কদম্বে আজ শিথিল রেণু
সুবাসে ভুর-ভুর,
বর্ষা শেষের বাদল বাজায়
আজ বেহায়া সুর ![৩০]

এবং সে-সময়ের একজন সাধারণ ছাত্র-কবি লিখেছিলেন—

দুরন্ত পূরব বায়ে পদ্মা উতরোল,
কাঁদে হায় হায়।
তটের মনের কথা তটিনী আজিকে
জানিবারে চায়।[৩১]

তিনটিই বর্ষার কবিতা। তিনটির একটিও অ-কবিতা নয়। তিনটিতেই মন অল্প-বিস্তর আকর্ষণ বোধ করে। কিন্তু কোনটিতেই ভাষা বা সুরের ঐকান্তিক তেমন কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিলো না, যাকে দেখলেই মন তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে—'পোহালো, পোহালো

বিভাবরী।' এই সব নমুনার মধ্যে কথারও ভুল হয় নি, সুরেরও ভুল হয় নি। না, এসব ভুল কথাও নয়, ভুল সুরও নয়। বর্ষা তিন জনের মনে তিন রকম মর্জি জাগিয়েছিল,—যেমন সদৃশ বস্তু অসংখ্য মনে বিচিত্র ভাব উদ্রেক করে থাকে। প্রথম উদ্ধৃতির মধ্যে শব্দে-সুরে ঝংকারে-সীৎকারে এক হিল্লোল বেজেছে,—দ্বিতীয়টিতে সার্সির কাঁচে জল-সারেঙের টুং-টাং, জাপানি লণ্ঠনের চারদিকে বাদলা-পোকার ফুর্তি ইত্যাদি ব্যাপার যেন লোভনীয় রকম হালকা একটা সুর তুলে সময়ের আশ্চর্য রঙীন এক বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছে,—আর, তৃতীয়টিতে এক নবীন কাব্য-শিক্ষার্থীর অস্ফুট আত্মপ্রকাশ শোনা যাচ্ছে নির্জন বর্ষার পদ্মাতীরে।

তাহলে কি রকম শব্দ দিয়ে স্বাতন্ত্র্য দেখানো সম্ভব? আরবী-ফারসী শব্দের সাহায্যেই কি নতুনত্ব হয়? নতুনত্ব কি আভিধানিক শব্দের সমারোহে? গ্রাম্য শব্দ দিয়ে? বাজার-চলতি শব্দের কৌলীন্য ঘটিয়ে? ধ্বন্যাত্মক শব্দে?

এই সব বিচিত্র প্রশ্নের একমাত্র অবধারিত জবাব হলো—না, না, না! শব্দ স্বাতন্ত্র্যের বাহক বটে, কিন্তু শুধু শব্দের বাহার, আড়ম্বর অথবা কারসাজির নাম স্বাতন্ত্র্য নয়।

কেবল আটপৌরে শব্দের জোরে, কিংবা কেবল সাধারণ ভাবনা বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটলেই যার-তার যে-কোনো কথা 'কবিতা' হয় না। হরিশচন্দ্র নিয়োগীর 'মালতীমালা'-র মোট তিরিশটি কবিতার মধ্যে সারল্যের ফাঁকে-ফাঁকে অল্পশ্রুত শব্দের ধ্বনিবিলাস এবং দীর্ঘ সন্ধি-সমাসের অতিদৈর্ঘ, দুই-ই আছে। সে বইখানি ছাপা হয়েছিল বাংলা ১৩০৬ সালে। তার প্রথম রচনা 'উপহার'-এ 'পিক-রুত অলিরাবে মুখরিত সমীরণ' লাইনটি লক্ষ্য করা গেছে। 'আবাহন'-নামে আর একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—'শ্যামানন্তনীলাকাশ

সজল জলদে ভরি—'। সেই সময়ের আর একজন কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের নাম অনেকেই জানেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছেন, সেগুলি 'মিত্রকাব্য' নামে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। অল্প বয়সের অক্ষমতার চিহ্নে সে-সব লেখা বড়োই কণ্টকিত। কিন্তু প্রবীণ বয়সে ১৩০৮ সালের পয়লা বৈশাখ, ৩০।৫ মদন মিত্রের গলির নব্যভারত প্রেস থেকে 'প্রেমানন্দ' নাম সই করে তিনি 'মাতৃমঙ্গল (ভজন কাব্য)' নামে যে অদ্ভুত অসার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, সেটির কথা এই সূত্রে মনে পড়া অনিবার্য। সংসারের সব কথাই কি যেমন-আছে, তেমনি বলে গেলেই কবিতা হয়? আটপৌরে ব্যাপারও রীতিহীন হলে চলে না। রীতি চাই, বিন্যাস চাই, কলাকৌশল চাই। মাতৃবিয়োগে কাতর হয়ে 'প্রেমানন্দ' রীতির অপ্রকাশনীয় দারিদ্র্য প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। নিজের 'প্রেমানন্দ' সত্তাকে সমর্থন করে বইখানির ভূমিকায় আনন্দচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন—

> এই কাব্যের রচনায় তাঁহার নিজের যত্ন বা প্রয়াস অতি অল্পই ছিল। অনিবার্য ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তিনি এই সকল কবিতা লিখিয়াছেন। এই সকল কবিতার প্রায় সমস্তই কলিকাতার রাজপথে, কার্যালয়ে বা বিচার-মঞ্চে লিখিত হইয়াছে।

আনন্দচন্দ্রের অবিন্যস্ত আন্তরিকতার একটি নমুনা দিলেই এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের ছেদ টানা যাবে। তিনি লিখেছিলেন—

অবসান হলে বেলা আসিবে যমের চেলা
ভীষণ কেশরীগুলা ভ্রূকুটি করিয়া;
ঐ তার পদচিহ্ন পথমাত্র নাহি অন্ত
নখে করি ছিন্ন ভিন্ন খাইবে ধরিয়া।[৩২]

এসব তো শতাব্দীর প্রথম দশকের সূচনা-পর্বের উদাহরণ। পরবর্তী কবিরাও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন না।

আমাদের শতাব্দীর বিশের শেষে, তিরিশের দশকের প্রথম দিকে আরবী-ফারসী, আভিধানিক, ধ্বন্যাত্মক—বাংলায় এই তিন রকম শব্দই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। জসীমউদ্দীন তখন প্রচুর গ্রাম্য শব্দের সাহায্যে প্রচুর গ্রাম্য কাহিনী পরিবেষণে ব্যস্ত। কালিদাস রায়ের সঙ্গে যাঁর কতকটা তুলনা চলে, সেই অধুনা বিস্মৃত-প্রায় কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ একই সময়ে বর্ষা-র বিষয়েই ধ্বনিসর্বস্ব তৎসম শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে এই রকম সব লাইন তৈরি করেছিলেন—

> দিছে যৌতুক বন বনশ্রী সর্জনীপের গন্ধ
> উশীরস্তম্ব ককুভদ্রুম কন্দলীদল কন্দ ;[৩৩]

আর চল্‌তি কথা তো অনেক দিন থেকেই চলছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'য় চলতি কথা দিয়েই অনেক আপাত-ক্ষণিক কিন্তু আসলে-গভীর কথা ব্যক্ত হয়েছিল। আর হাস্য-পরিহাসের রাজ্যে দ্বিজেন্দ্র-লাল-ই কি চলতি-কথা কিছু কম ব্যবহার করেছেন! শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এক 'অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' তাঁর অধুনা-বিস্মৃত একখানি বইয়ের মধ্যে সাধু ক্রিয়াপদ বজায় রেখে সংসারের আটপৌরে কথা সরস পদ্যে বলবার সুখকর উদাহরণ রেখে গেছেন। প্রথমে 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় সে লেখা ছাপা হয়; তারপর মূল লেখাটি তিনি কিঞ্চিৎ বাড়িয়েছিলেন। লেখকের নাম, চন্দ্রশেখর কর। তিনি নামের সঙ্গে তাঁর উপাধি জুড়ে দিতে ভোলেন নি—বি-এ এবং কবীন্দ্র,—দুটিই ছিল। বইখানির নাম 'সেকাল-একাল'। তাতে 'সেকালে'র সুখ এবং 'এঁকালের' দুঃখের কথা আছে। আমাদের অধুনাতন একালের পরিবর্তিত

বিশ্ব-পরিস্থিতির মধ্যেও চন্দ্রশেখরের পুরোনো রীতির অন্তর্নিহিত স্বাদটুকু আমার মতন হয়তো আরো কারো-কারো ভালো লাগবে। তিনি বীণাপাণির বন্দনা করে কবিতা শুরু করেছিলেন—

হইয়াছে অভিলাষ এ দীনের মনে
রচিতে কবিতা কিছু প্রাচীন ধরণে।
বীণাপাণি বীণাপদে করি নমস্কার
আন মা লেখনী মুখে সেকেলে পয়ার।

পুরোনো কালের প্রবাদ মনে পড়েছিলো তাঁর—নিরাশ্রয় অবস্থায় পণ্ডিত, বনিতা এবং লতা, এরা কেউই জীবন কাটাতে পারে না। নিজের যুগের সঙ্গে সেই প্রবাদলব্ধ সত্যের গরমিল দেখে দুঃখ করে তিনি বলেছিলেন যে, একালে পণ্ডিত তো 'খাটে বসে কাল কাটায়',—মেয়েরা 'গাড়ি চড়ি ফেরে নিজে সহর বাজার,'—কেবল প্রকৃতির বশীভূত বলে লতারা বোধ হয় নিতান্তই নত হয়ে আছে—

"উদ্ভিদ বলিয়া শুধু লতা আছে নত
অদ্যাপি আশ্রয় চাহে সেকালের মত।

দুঃখ করে চন্দ্রশেখর জানিয়েছিলেন—

বেশী নয়, আশীবর্ষ পূর্বে এই দেশ
কি ছিল, কি হল এবে বলি সবিশেষ।
ছিল না তখন রেল, ট্রাম কিংবা তার
বিঘোষিত বিশ্ববার্তা দূত রয়টার।

তখন ডাকঘর ছিলো না,—লোকে পায়ে হেঁটে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন যেত,—খবরের কাগজ ছিলো না,—এমন কি নিকেলের আনিও ছিলো না—সেকালের এইসব অভাবের শান্তির কথা বল্‌তে-বল্‌তে আটপৌরে বিষয়ের তাগিদেই বোধ হয়, সাধু ক্রিয়াপদ চলিত

রূপ নিয়েছে,—উচ্চারণে পয়ারের তান লেগেছে, 'একানি'-র মতো নিরাভরণ সাধারণ শব্দও পংক্তিতে সসম্মানে স্বীকৃত হয়েছে—

নাহি ছিল হা(ও)য়া গাড়ি কি বাইসিকেল
চেনেনি অনেকে আজো একানি নিকেল্।

সেকালে বায়স্কোপ বা বাঘের সার্কাস ছিলো না,—তবে যাত্রা চপ, কবি, পুতুলের-নাচ ইত্যাদি ছিল ; আর—

হাতে ছড়ি, মুখে বিড়ি, বুকে চেন ঘড়ি
পথে ঘাটে না ছিল বাবুর ছড়াছড়ি।

এবং—

গব্যঘৃত পাঁচ সের টাকায় মিলিত
খাঁটি তেল বারসের বাড়ি বয়ে দিত।
তণ্ডুলের মূল্য ছিল আট আনা মণ
পয়সায় পেত লোকে পান দুই পণ,

কিন্তু চন্দ্রশেখরের সমকালীন বাংলাদেশে—

মধ্যবিৎ ভদ্র এবে খাদ্যাভাবে মরে,
রোগে বৈদ্য ডাকিবার অর্থ নাহি ঘরে।
জলো দুধ খেয়ে মলো শিশু ছেলে যত
সাজ পোষাকের ব্যয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

চন্দ্রশেখরের বিস্মৃত নামটি একটু বেশিক্ষণ মনে রইলো। তাঁর এইসব উক্তিকে কোনো মতেই উল্লেখযোগ্য কবিতা বলা চলেনা। বর্তমান আলোচনার প্রথম দিকে 'কবিতার আকাশ আর পৃথিবীর মাটি' নাম দিয়ে কাব্য-সাধনার দুটি পৃথক প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। সেখানে দাশরথি রায়, মুকুন্দরাম এবং হেমচন্দ্রের লেখা থেকে যে নমুনাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তার আগের অধ্যায়ে কবিতার সঙ্গে 'অকবিতা'র পার্থক্য নির্ণয়সূত্রে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে

বর্ধমানের বাজারের যে বর্ণনা তোলা হয়েছে, সেইসব অংশের সঙ্গে উনিশ-শ'দশের দশকের এই সামাজিক খেদোক্তির,—এই সাধারণ বাস্তবতার সাদৃশ্য আছে। মুকুন্দরামের সময় থেকে আমাদের এই সুদীর্ঘ চার-শ' বছরের ব্যবধানেও মাটির দাবি অণুমাত্র কমে নি। রবীন্দ্র-যুগের মধ্যে সে দাবি যে হঠাৎ ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস বা হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল বা দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অথবা 'প্রথমা-র' প্রেমেন্দ্র মিত্র—কিংবা আরো সাম্প্রতিক কালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি তথাকথিত 'সমাজ চৈতন্যময়' কবিরাই বিশেষ ভাবে মেনেছেন,—অথবা রক্ত-মাংসের বাস্তবতার যন্ত্রণাবোধ যে নিতান্তই বৈজ্ঞানিক-নৈরাত্মদৃষ্টির মৌলিক অর্জন, এই ভ্রান্ত জনমতের বিরুদ্ধ-প্রমাণের জন্যেই চন্দ্রশেখরের 'সেকাল-একাল'-এর বিষয়ে একটু বেশি মনোযোগ দেওয়া গেল। এই দীর্ঘ উল্লেখের এই হলো প্রথম কারণ। যে-সব কবির নাম করা হলো, তাঁদের খ্যাতির কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে।

দ্বিতীয়ত কেবল আটপৌরে শব্দের জোরেই কবির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না,—এবং এই রবীন্দ্র-যুগের মধ্যেও সেরকম শব্দ এবং আটপৌরে বিষয় যে অনেকেই ব্যবহার করেছেন, তারও উদাহরণ হিসেবে চন্দ্রশেখরের কথা বলা গেল। তথাকথিত 'সমাজ চৈতন্যের' জোরে কিংবা বাস্তব দুঃখকষ্টের হুবহু বর্ণনার জোরে চল্‌তি বুলি কাব্য হয়ে ওঠে না। বই অকারণে বেড়ে যাবে বলে দৃষ্টান্ত উহ্য রাখতে হচ্ছে। তবু, ১৩১৬ সালের আশ্বিনে প্রথম-ছাপা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক-এর 'জাতীয় মঙ্গল (সামাজিক কাব্য)', বইখানির কথা বলা দরকার। ১৩২৪-এর মধ্যে সে বইয়ের তিনটি সংস্করণ বেরিয়েছিল,—সে অবিশ্যি সরকারি পাঠ্যতালিকায় জায়গা পাবার সৌভাগ্য-গুণেই ঘটেছিল। যাই হোক্ তাতে বাংলার

মুসলমানের প্রতি দরদী শুভার্থীর সমাজ-হিতৈষা ছিল। কায়কোবাদের মতন ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্ত। তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশে মুসলমান বালক বারো বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হয়,—অতঃপর আরো বেশি বয়সে মোক্তবে যায়,—তারপর—

মোক্তবের শিক্ষা হলে
কেহ হুগলী যায় চলে
সাজিতে মৌলবী গুরু পড়ি মাদ্রাসায়
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' যে বছর বের হয়, সেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দেই কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন—

রে কবিতা সুভাষিণী, নাচিস্ কোথায় ছন্দে ?
খুঁজে বেড়াই বন-বাদাড়ে, খিড়কি-ঘাটে আর পাহাড়ে,
লোলুপ শেয়াল বেড়ায় যেমন কাঁঠাল পাকার গন্ধে।

ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় শনি, বসে যেন রন্ধ্রে।
যখন আমি ভাবে মেতে বেরিয়ে পড়ি দুপুর রেতে,
লোকে বলে, আস্ত দানো আছে আমার স্কন্ধে।

ঘরের লোকে পাগল বলে ; সময় কাটে দ্বন্দ্বে
আহার খোঁজাই সেরা কর্ম ? বোঝে না কেউ তোমার মর্ম !
চুপি চুপি খুঁজব তোমায় এবার পূজার বন্ধে।

ঘরে যারা আনে টাকা ভাবে মহানন্দে
এ সংসারে তারাই কর্মা। ও পথে না চলেন শর্মা !
আহাম্মকেই সোনা কুড়ায় খনির খানাখন্দে।

শুনে আমার তত্ত্বকথা চক্ষু পেলে অন্ধে ;
কিন্তু "কার-ও" পদ্মপলাশ নেত্র হল জলের গেলাস।
ঐ কবিতা দিল ধরা নারীর আঁখির ছন্দে।[৩৪]

সেদিনের ঐ 'কার-ও' সর্বনামের অন্তরালবর্তিনীকে আজকের কালান্তরের পাঠকও কৃতজ্ঞতার প্রণাম জানাবেন। কৌতুকপ্রবণ বিজয়চন্দ্রের অনুভূতিতে তাঁর পদ্মপলাশ-নেত্রের এক কমনীয় দৃষ্টি রয়ে গেছে। ওই কবিতার কথাতে-সুরেতে সেই জীবনানুভূতির স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। সেইটিই একমাত্র কথা। তাঁর এ রচনার নাম ছিল 'কবিতার সন্ধান'। যেখানে কবিতার সন্ধান, কবিতার ভাষার উৎসও সেইখানেই ;—সেই অনুভূতিরই আনন্দে, বিস্ময়ে, সংশয়ে, জিজ্ঞাসায়, তর্কে, সমর্পণে!

রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যে কবিতার কথা এবং সুরের এই চিরসত্য সম্বন্ধেও দেশের মানুষ বার-বার সংশয়ে ভুগেছে। প্রথম যুগে উনিশের শতকের শেষ দিকে,—অন্যান্য কারণে তো বটেই, তাছাড়া এই কারণেও তাঁকে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের দল বুঝতে পারেন নি,—বিশের শতকে বোঝেন নি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ ;—রাগ করে আরো কেউ-কেউ বোঝেন নি,—বুঝলেও কতকটা অন্য টানে পড়ে মাঝে মাঝে তির্যক কটাক্ষ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। শেষ নামটিতে অনেকে হয়তো অস্বস্তি বোধ করবেন। সমালোচককে তাঁদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। যথাস্থানে সে কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে।

এই অভিযোগের পাত্রদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং প্রমথ চৌধুরী, এঁরা দুজনেই বিশেষভাবে আলোচ্য ; কারণ দুজনেই সত্যিকার সাহিত্যপ্রাণ মানুষ ছিলেন,—দুজনেই ছিলেন স্রষ্টা। স্রষ্টারও ভুল হয়? স্রষ্টারও কার্পণ্য ঘটতে পারে? তা ঘটে বৈ কি! তাঁরাও তো

রক্ত-মাংসের মানুষ। আর, কথার ভুল বা সুরের ভুল তো কবিরাই ঘটাতে পারেন। যেমন দুষ্ট সন্তানের জন্ম দেওয়া একমাত্র মায়েদের পক্ষেই সম্ভব। পরের ছেলেকে নিজের ছেলের চেয়ে নিরেশ ভাবাটাও মাতৃজাতির একাধিপত্যভুক্ত না হোক্, তাঁদের আংশিক সংরক্ষিত এলাকা!

এ কথার বিস্তারের জন্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা ভাবা দরকার। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের আলোচ্য পঞ্চাশ বছরের অনেক দিকের অনেক ভাবনার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু প্রধানত তাঁর কবিতা এবং কাব্যচিন্তার কথাই এখানে বিবেচ্য; এবং সেজন্যে কিঞ্চিৎ ব্যক্তি-পরিচিতি প্রয়োজন। কিন্তু কবিদের জীবনী পরিবেষণের উদ্দেশ্য নিয়ে এ বই লেখা হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিপরিচয়ের প্রস্তাব এখানে একটি আনুষঙ্গিক কৃত্য মাত্র। স্রষ্টার সংশয়ের কথাই পরের অধ্যায়ে প্রধানত বিবেচ্য।

১। নানাকথা : সমর সেন ; 'খোঁয়ারি' থেকে।

২। 'ব্রাহ্ম মুহূর্তে'—রেখা : যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

৩। আবোল-তাবোল : সুকুমার রায়চৌধুরী।

৪। ১১৬-১১৭ পৃষ্ঠায় অনূদিত মন্তব্যটির মূল পাওয়া যাবে W. H. Auden-সম্পাদিত The Poet's Tongue (1938) বইখানির ভূমিকায় :—'Similes, metaphors of image or idea, and auditory metaphors such as rhyme, assonance, and alliteration help further to clarify and strengthen the pattern and internal relations of the experience described.'

৫। 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ'-এর 'কলাবিধি' দ্রষ্টব্য।

৬। 'মরগরল'-এর 'সত্যেন্দ্রনাথ' কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

৭। 'রঘুবংশম্'—ত্রয়োদশ সর্গ দ্রষ্টব্য।

৮। 'গীতবিতান' দ্রষ্টব্য

৯। 'ভাষার ইঙ্গিত'—শব্দতত্ত্ব : রবীন্দ্রনাথ।

১০। সবগুলিই 'আহরণ'-এ পাওয়া যাবে।

১১। 'কল্লোল', বৈশাখ, ১৩৩৫।

১২। 'প্রেম-প্রবাহিনী' ; প্রথম সর্গ দ্রষ্টব্য।

১৩। ঐ ; পঞ্চম সর্গ দ্রষ্টব্য।

১৪। 'মানসী ও মর্মবাণী', শ্রাবণ, ১৩৩৫ দ্রষ্টব্য। ১৩৩৫-এর আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কুমুদরঞ্জনের 'কাকের বাসায়' প্রকাশিত হয়।

১৫। 'মানসী ও মর্মবাণী' আশ্বিন, ১৩৩৫ দ্রষ্টব্য।

১৬। 'বঙ্গবাণী' : শশাঙ্কমোহন সেন ; পৃঃ ১৭৯।

১৭। ঐ, পৃঃ ১৭১।

১৮। মেঘনাদবধ কাব্য, ষষ্ঠ সর্গ।

১৯। ঐ, নবম সর্গ।

২০। ঐ, প্রথম সর্গ।

২১। 'গীতবিতান' দ্রষ্টব্য।

২২। 'পাগলিনী'—'ঝরা ফুল' : করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৩। 'অগ্নিবীণা'র শেষ কবিতা 'মোহর্‌রম' দ্রষ্টব্য।

২৪। 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' [১৩৬১]—আজহার উদ্দীন খান, পৃঃ ১৫-১৬ দ্রষ্টব্য।

২৫। 'দোলনচাঁপা'র 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' দ্রষ্টব্য।

২৬। সতীশচন্দ্র রায়ের 'শঙ্খ'। 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' ১৩১৯ সালে শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয়।

২৭। ঐ, 'রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি'।

২৮। ঐ।

২৯। প্রথম প্রকাশ : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক, ১৩৩৬—'বর্ষামিলন'।

৩০। 'প্রথমা' [প্রেমেন্দ্র মিত্র] দ্রষ্টব্য।

৩১। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা প্রমথনাথ বিশীর কবিতা থেকে নেওয়া। 'হংসমিথুন' [১৯৫১]-এর অন্তর্ভুক্ত। এ-সময়ের নবীন কবিদের মধ্যে নিশিকান্ত, সজনীকান্ত দাস, মণীশ ঘটক, অমিয় চক্রবর্তী, জগৎ মিত্র, হেমচন্দ্র বাগচী, সুকুমার সরকার, প্রণব রায়, অসিতকুমার হালদার, হুমায়ুন কবীর এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম একাধিক কারণে স্মরণীয়। তাঁদের সম্বন্ধে এ বইয়ের অন্যত্র মন্তব্য আছে, এবং সেখানেই বিশদভাবে বলা হয়েছে। আমাদের বৃহত্তর জাতীয় জীবনে তো বটেই, তাছাড়া কেবল কবিতার ক্ষেত্রে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলেও দেখা যায় যে, উদ্দীপনার আকাঙ্ক্ষা, নতুনের প্রতীক্ষা, মননের অভিনবত্ব-সন্ধান ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের শতকের কুড়ির দশকের শেষ দিকটা বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুশীলকুমার দে, হেমেন্দ্রলাল রায় এবং আরো বহু কবি নতুনত্বের সন্ধান করেছেন ঐ সময়ে। কিন্তু আমাদের স্মৃতি বড়ো কৃপণ। নগদ হাততালি বা সুখ্যাতির কথা ধর্তব্য নয়। নজরুলের সমকালীন সেদিনের কতো কবির নাম আজ আমরা প্রায় ভুলে গেছি! গিরিজাকুমার বসুরও ভক্ত পাঠক ছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও কবিতা লিখতেন। নরেন্দ্র দেব অনেক দিন কবিতা লিখেছেন, এখনো লেখেন। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' এবং 'মেঘদূত' ছাড়া তাঁর মৌলিক রচনার সংখ্যাও কম নয়। শান্তি পাল তখনো লিখেছেন, এখনো লেখেন। 'ভারতী'র হেমেন্দ্রকুমার রায় কুড়ির দশকের শেষেও অনেক লিখেছেন। কৃষ্ণদয়াল বসু, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, রাধাচরণ চক্রবর্তী ইত্যাদি কবির কীর্তি আজ ক'জন মনে রেখেছেন? হেমলতা দেবী, চণ্ডীচরণ মিত্র, উমা দেবী [বাতায়ন], নিরুপমা দেবী, লীলা দেবী ['যমুনা' পত্রিকায় লিখতেন কুড়ির দশকের প্রথম দিকে] একালের পাঠকের কাছে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি বা ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর চেয়েও বিস্মৃত নাম!

সে সময়ে সমালোচনাও সরস ছিল, তীব্র ছিল। ১৩৩৩-এর শ্রাবণের 'বঙ্গবাণী'-তে মোহিতলাল মজুমদারের 'সোমপায়ীর গান' বেরিয়েছিল। সে সম্বন্ধে ভাদ্রের 'মানসী ও মর্মবাণী'তে এই সমালোচনা (?) ছাপা হয়েছিল :—'সোমরস পান করিয়া সবে মাত্র একটু একটু 'গোলাপী' নেশা আরম্ভ হইয়াছে, এই রকম অবস্থার সোমপায়ী যে খেয়াল দেখিতেছেন তাহাই কবি এই কবিতাটিতে প্রকাশ করিয়াছেন। সোমপায়ীর খেয়াল—কাজেই ইহাতে মানে না থাকিলেও মজা আছে। তবে কবি যেমন ইরাণ, তুরাণের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে মজবুত, প্রাচীন ভারতের আবহাওয়া সৃষ্টিতে তেমন দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই।' ১৩৩৩-এর আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে সজনীকান্ত দাসের 'বেদনা-সুখ' ছাপা হয়। সে কবিতাটির বিষয়ে মন্তব্য ছিল—'চলনসই কবিতা'। জ্যৈষ্ঠের 'বসুমতী'-তে কালিদাস রায়ের 'হিমাদ্রি' ছাপা হয়। সে কবিতার বিষয়ে মন্তব্য ছিল—'হিমাদ্রির মতই বিশাল, উচ্চ ও গম্ভীর। হিমাচলকে মন্থন-দণ্ড করিয়া কবি সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাসসাগর মন্থন পূর্বক অনেক বহুমূল্য রত্নসম্ভার পাঠককে উপহার দিয়াছেন।' প্রিয়ম্বদা দেবীর 'বনফুল' কবিতা পড়ে সমালোচক স্পষ্টই বলেছিলেন—'নিরাশ হইলাম। লেখিকার যশের উপযুক্ত হয় নাই।'—এবং ঐ বছরের 'সবুজ পত্রের' শ্রাবণ সংখ্যায় কোনো কবিতা ছিল না দেখে সেই নির্ভীক, রসিক ব্যক্তি বলেছিলেন—'সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি সমালোচক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।' সে সময়ে শুধু 'মানসী ও মর্মবাণী'-তেই নয়, অন্যান্য একাধিক পত্রিকাতে এই ধরনের কটু-কষায় 'সমালোচনা' ছাপা হতো। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনরাও রেহাই পেতেন না। ১৩৩৬-এর অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে মোহিতলালের 'নিশি-ভোর' পড়ে সোজাসুজি জানানো হয়েছিল—'বিশ্বকবির সুবিখ্যাত 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতাটির প্রভাব হইতে নিস্তার

পাইবার আশায় ভিন্ন পথে চলিয়া কবি মোহিতলাল এমন বিপদে পড়িলেন।' আবার, ঐ বছরে জ্যৈষ্ঠের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দাসের 'বিলাস-পরিচয়' সম্বন্ধে বলা হয়েছিল—'কবিতাটি সুকবি মোহিতলাল মজুমদারের 'চুড়ির আওয়াজ' কবিতাটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।' এই সরস, তীব্র, স্পষ্ট ব্যঙ্গবচনের ধারাতেই উত্তরকালে 'শনিবারের চিঠি' বিশেষ স্বাক্ষর রেখেছিল। ১৩২৭-এর পৌষ সংখ্যার 'উপাসনা'-তে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের একটি কবিতার 'সমালোচনা' ছাপা হয় এই রকম—'কবিতাটির সমালোচনা কবির ভাষাতেই করা যাইতে পারে—

ধোঁয়ার পরে ছুটছে ধোঁয়া
মেঘের পরে মেঘের ছোটা
ফাঁকে ফাঁকে নীলের বুকে
রবির হাসির উজ্জ্বল ফোঁটা।'

বাহুল্য ভয়ে বেশি নমুনা তুললাম না। এই সামান্য বর্ণনা থেকেই রবীন্দ্র-প্রভাবের সর্বব্যাপী প্রতাপ, নবীনের ব্যাকুল পথ-সন্ধান, পাঠকের সতর্কতা ইত্যাদি সে-যুগের কালস্বভাব বোঝা যাবে। এবং এও মনে রাখা দরকার যে, কবিদের মধ্যে দলাদলি, ঈর্ষা ইত্যাদি এ-কালের দুর্লক্ষণ সে-কালেও [illegible] ছিল না।

৩২। 'কবির স্বপ্ন'—আনন্দচন্দ্র মিত্র।

৩৩। 'বর্ষাবতরণ'—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; 'মাসিক বসুমতী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ দ্রষ্টব্য। ব্যঞ্জনবর্ণের কসরত, তালের ঝোঁক, মিলের চমক ইত্যাদি ব্যাপার সে সময়ে আমাদের কবিদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'শিবতাণ্ডব' ১৩৩৫-এ প্রথম ছাপা হয়। তার কটি লাইন এখানে তুলে দেওয়া হলো—

নাচে নাচে শঙ্কর চির বিষ জর্জর,
প্রলয়ঙ্কর তাতা থৈয়া!
জ্বালার নবৌষধি নবনীত উঠে যদি

স্বষ্টির পচা দধি মইয়া
রয় কত সইয়া ?
ত্যয় তাতা থৈয়া
ত্যয় তাতা থৈয়া
তা থৈ তা থৈয়া !

১৩৩৫-এর শ্রাবণের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'জীপ্‌সী' লেখাটিতেও মিলের দিকে লেখকের বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে' রাধারাণী দত্তের [বর্তমানে রাধারাণী দেবী, সর্বসাহিত্যিকসুহৃৎ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের পত্নী] 'আকাশ-কুসুম' কবিতায় 'শুভারম্ভিয়া' শব্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য এই সূত্রে স্মরণীয়। অনেক নমুনা তোলা যায়। কিন্তু নমুনার পাহাড় জমিয়ে তোলা নিষ্প্রয়োজন। বাঙালীর কান-মন গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাচের ঝোঁকে, তালের চমকে, ব্যঞ্জন বর্ণের 'ব্রেক' কষবার মজাতে কেমন যেন বিভোর বোধ করেছে। সে যুগে এবং তার পরেও যাঁরা গভীর মনে গভীর সুরের স্বাদ পেয়েছেন তাঁরাও আমাদের এই ব্যাপক জাতীয় ব্যসনে স্থানে-অস্থানে আত্মসমর্পণ করেছেন। কবিতার ভাষা সাধারণ মৌখিক ভাষার এবং স্বাভাবিক আলাপের সুরের দিকে এগিয়ে যাবার পথে এই ঝোঁকটা একটা বড়ো বাধা। লোকসাহিত্য লোকচিত্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, এ তো খুবই সংগত কথা। বাংলা কবিতা যতোই গণজীবনের নিকটবর্তী হচ্ছে, এই গণব্যসনের দ্বারা ততোই তার অভিপ্রেত প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

৩৪। 'হেঁয়ালি'—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্রষ্টার সংশয়

স্রষ্টার সংশয় থেকেই সৃষ্টির যাবতীয় অক্ষমতার উদ্ভব। সংশয় কথাটি অবিশ্যি অর্থের দিক থেকে একটু বেশি ব্যাপক বলে মনে হয়। 'সংশয়' শব্দের মানে হলো দ্বৈধজ্ঞান বা সন্দেহ। সন্দেহের নানা প্রকৃতি। শব্দ,—চিত্র,—সমাবেশের রীতি,—উদ্দেশ্যের ধারণা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কবির মনে অস্পষ্টতা,—এমন কি অন্ধতাও থাকতে পারে। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, ভাবের আকাশেই কবিতার বেশি নিষ্ঠা থাকা উচিত ; আবার কোনো কবি মনে করতে পারেন যে, জগতের মাটি ছুঁয়ে থেকে শুধু হাসি-ঠাট্টা, বাগ্মিতা, দেশপ্রেম, মানব-প্রীতি, কুসংস্কার-দমন ইত্যাদি সুজনসাধ্য সু-প্রচারের দায়িত্ব পালন করাই কবির কাজ। এই রকম কোনো বিশেষ ধারণা যখন কবিকে পেয়ে বসে, তখন অভ্যাসলব্ধ, অর্জিত দক্ষতার জোরে তিনি কবিতার মর্মসত্যের বিরোধিতা করতে থাকেন। তিনি খাঁটি আনন্দ বা অনুভূতি থেকে প্রকাশের দিকে এগোবার চিরকালের রাস্তা উপেক্ষা করে তাঁর বিশেষ সংস্কার বা বিশেষ বিশ্বাসকে শব্দ-ছন্দ-অলঙ্কারের পোষাক পরিয়ে প্রচারের সাধু সেবক করে তোলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি স্বেচ্ছাসেবক, সন্দেহ নেই। ভ্রান্তির স্বেচ্ছাসেবক! অবিশ্যি তখনকার মতন তাঁর চৈতন্যে ভ্রান্তিই সত্য রূপে দেখা দেয়। আমি কবির ভ্রান্তিকেও 'সংশয়'-এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি। জগৎ স্বপ্নের মতো—এ ধারণাও সংশয়, আবার জীবনে স্বপ্ন একেবারেই নেই—এ ধারণাও বাড়াবাড়ি,—এও সংশয়।

এই পূর্বকথা মনে রেখে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাক্।

উনিশের শতকের শেষ দুটি দশকে তো বটেই, তাছাড়া বিশের শতকের প্রথম দশক অবধি বাংলা সাহিত্যের আসরে গদ্যে পদ্যে

হাসির জোগান দিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সাধারণী', 'পঞ্চানন্দ', 'বঙ্গবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় 'পঞ্চানন্দ' বা 'পাঁচুঠাকুর' ছদ্মনামে দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে তিনি হাসির ঝোঁকে লঘু-গুরু নানা কথা লিখে গেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর বর্ষীয়ান সমসাময়িক; যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর ভক্ত শিষ্য। আমাদের সেই যুগে হাসির প্রাচুর্য, বোধ হয়, এখনকার তুলনায় অনেকটা অব্যাহত ছিল। ভারতচন্দ্র থেকে কবিওয়ালাদের সময় অবধি দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে বহু গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে বটে,—অনেক অন্ধকার, অনেক দেয়াল, অনেক অনতিক্রমণীয় বাধা এসে আমাদের চৈতন্যের সহজ স্ফূর্তির সম্ভাবনা খর্ব করেছে; তবু হাসির অভ্যাস যায়নি। তারও আগে ভাঁড়ু দত্ত আর দুর্বলা দাসী দেখা দিয়েছিলেন। হীরা মালিনীর কথায় ছিল হীরার ধার! ইন্দ্রনাথ গদ্যে-পদ্যে কতকটা সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন অনেক দিন। দীনবন্ধুর এবং গিরিশ ঘোষের লেখায়,—এমন কি সে যুগের বিলিতী মনোভাবের মনস্বী মধুসূদনের প্রহসন দু'খানিতেও সেই পুরোনো হাসিরই রকমফের সঞ্চিত আছে। কেশব সেন-কে কটাক্ষ করে ১৮৭২-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' লেখার পরে ১২৭৯-র 'বঙ্গদর্শনে'-র চৈত্র সংখ্যায় সে-বইয়ের সমালোচনা-সূত্রে সেকালের প্রহসন জাতীয় রচনা সম্বন্ধে অপ্রিয় কিন্তু অভ্রান্ত মন্তব্য করা হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বইখানির প্রশংসা করলেও সমালোচক সেকালের বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত প্রহসন-প্রাচুর্যের নিন্দা করেছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত 'প্রহসন' নামের আড়ালে অশ্লীলতাময় 'অপকৃষ্ট নাটক' তখন বাজার ছেয়ে ফেলেছিল; দ্বিতীয়ত সমালোচক বলেছিলেন—'Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, Mistake

ব্যঙ্গের যোগ্য' ; প্রথমটিকে বলা হয়েছিল 'ভ্রান্তি';—'বাঙ্গালার কথার অপ্রতুল হেতু' দ্বিতীয়টির প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রমাদ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' আরো জানিয়েছিলেন—

> ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ, ক্রিয়ার অপরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। পুণ্যের উপযোগী চিত্তভাবকে অধর্ম বলি, এবং ভ্রান্তির উপযোগী ভাবকে অজ্ঞানতা বলি। এই তিন ব্যঙ্গের অযোগ্য। আমরা দুইটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়াছি, আর একটি ব্যবহার করিলে অধিক দোষ হইবে না। Mistake যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, Follyও তদ্রূপ।

ইন্দ্রনাথের শেষ বয়সে আমাদের সাহিত্যের এই অতি-উপদ্রুত অঞ্চলেও সূক্ষ্মতর মনন ও রুচিবিবেচনার প্রহরী প্রবেশ করলো। 'বঙ্গবাসী'-তে পঞ্চানন্দের লেখা ছাপা হওয়া কেন যে বন্দ হয়ে গেল, তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ অনেক কথা বলেছিলেন। সুরুচিপন্থীদের সম্পর্কে কিছু ঝাঁজ ছিল তাঁর কৈফিয়তে। তাছাড়া আরো একটি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছিলেন তিনি। পাঁচু ঠাকুরের প্রদর্শিত সেই কারণটি হলো :—

> চুল পাকিল, দাঁত পড়িল,
> নাত্‌নী দিল দেখা
> কেমন কেমন ঠেকে মনে
> রসাভাসের লেখা ॥
> সবাই বেজার, পূজার বাজার
> হয়নি মনোমত
> এমন করে একা মানুষ
> মন জোগাবে কত ॥[১]

১৯১১ সালে যখন ইন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা'

'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্দ্র' ও 'আলেখ্য'—এই পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ তখন সাহিত্যানুরাগী-সমাজে বিশেষ পরিচিত; 'ত্রিবেণী' ছাপা হয় সেই ঘটনার অল্পকাল পরেই। ১৯১২-র ৫ই নভেম্বর ১৩০৯ সালের কার্তিক-সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' 'মন্দ্রে'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'অবলীলাকৃত ক্ষমতা'র কথা,—তাঁর 'প্রবল আত্মবিশ্বাস' এবং 'অবাধ সাহসের' কথা।

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের অন্য স্মরণীয় অংশটি হলো :—'তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য, বিস্ময় কখন কে যে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই।' 'মন্দ্রে'র কবিতাগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার ভেবেছেন 'নর্তনশীলা নটী'-উপমান, আবার পরমুহূর্তেই বলেছেন, 'ইহার হাস্য, বিষাদ, বিদ্রূপ, বিস্ময় সমস্তই পুরুষের।' তাছাড়া 'আশীর্বাদ' এবং উদ্বোধন', বিশেষভাবে এই দুটি কবিতার ছন্দের অভিনবত্বের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, 'ছন্দকে একেবারে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দোরচনা করা হইয়াছে। তিনি যেন সাংঘাতিক সংকটের পাশ দিয়া গেছেন—কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই দুঃসাহস কোন ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।'

এইসব ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, ইন্দ্রনাথ ঐ যে বলেছিলেন, 'এমন করে একা মানুষ মন জোগাবে কত', সে-কথা ঐতিহাসিক কারণেই অপ্রতিষ্ঠিত মন্তব্য মাত্র। ইন্দ্রনাথ অনেক দিন হাসির আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। সেজন্যে তাঁর কাছে পাঠকের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু ১৯০৫-এর দেশব্যাপী গুরু উত্তেজনা সত্ত্বেও বাঙালীকে হাসির গান শোনাবার শিল্পীর অভাব হয়নি সেকালে। বরং আগের যুগের তুলনায় আরো মার্জিত, আরো

উঁচু দরের হাসি-ই আমরা হেসেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সেই আনন্দের প্রধান পরিবেষক,—রজনীকান্ত প্রভৃতি লেখকরা তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্য। ১৮৭৮-এর পরে ইন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বাদর্শ মনে রেখে আবার কেশবচন্দ্রকেই কটাক্ষ করে তাঁর 'অবতার' প্রহসন খানি লিখেছিলেন। সে হলো ১৮৮১-র ঘটনা। তার পরের বছর, ১৮৮২-তে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কবিতার বই 'আর্যগাথা' ছাপা হয়। ১৮৯৯-এর ডিসেম্বর মাসে 'আষাঢ়ে' (ব্যঙ্গকাব্য) এবং ১৯০০-তে তাঁর 'হাসির গান' বই দু'খানি বেরিয়েছিল। ঐ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর 'পাষাণী' (গীতিনাটিকা) ছাপা হয়। 'মন্দ্র' বেরিয়েছিল ১৯০২-এর সেপ্টেম্বর মাসে। কালীপ্রসন্ন ১৮৭৬-এ প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর গোঁড়া সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে সংস্কৃত কাব্য এবং ব্যাকরণের পাঠ নিয়েছিলেন। দ্বারকানাথই তাঁকে 'কাব্যবিশারদ' উপাধি দিয়েছিলেন। মানুষ হিসেবে কাব্যবিশারদ তেজস্বী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। উভয়েই রসিক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই কতকটা সেকেলে মানুষ। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজিতে এম্‌-এ পাশ-করা একালের মানুষ! 'বীরবলে'রও উল্লেখযোগ্য ঋণ ছিল তাঁর কাছে।

অজস্র হাসির খোরাক, এবং শব্দ ও ছন্দের অভিনবত্ব, এই দুটি বিশেষত্ব ছাড়া আরো স্মরণীয় পদার্থ ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়। স্বাধীনতা এবং স্বাদেশিকতার উন্মাদনায় আকুল হয়ে উঠেছিল তাঁর নাট্যরচনাবলী। জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণচিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমুচিত প্রকাশের শিল্পসামর্থ্য। হাসির আলো জ্বেলে তিনি যেমন দেশের অন্ধকার হাল্‌কা করেছিলেন, তেমনি গভীর ভাবের গহন লোকেও তাঁর উদ্দীপনার স্পন্দন পৌঁছেছিল। আশা, বিশ্বাস এবং

ভালোবাসার শক্তি সঞ্চারণেও তাঁর কার্পণ্য ছিল না। সেই সঙ্গে মেকি-র প্রতি তীব্র বিরূপতা উচ্চারিত হয়েছে তাঁর নাটকে, প্রহসনে, কবিতায়। দেশপ্রেমের আবেগে ব্যাকুল হয়ে ঐতিহাসিক নাটক লিখতে বসেও ইতিহাসকে তিনি যে বহুভাবে উপেক্ষা করেছেন, সেকথা অস্বীকার করা অসম্ভব; কৌতুকের দিকে বেশি আগ্রহ থাকার ফলে ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার দৃষ্টান্তও তাঁর লেখায় অল্প নয়; তবু, আবেগসমৃদ্ধ, কৌতুকময়, বলবান বিশ্বাসের জাদু আছে তাঁর লেখায়। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ধ্যানলোকের সঙ্গে সে বিশ্বাসের সাদৃশ্য খোঁজা বৃথা প্রয়াস! রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ-প্রয়াসী সমকালীন লেখকদের স্বপ্ন, সাধনা, সম্ভাবনা এবং কিছু কিছু পরিণতিও তিনি সযত্নে লক্ষ্য করে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজের পৃথক পথ তিনি পরিহার করেন নি। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে যে তুমুল পক্ষ-প্রতিপক্ষের বিবাদ দেখা দিয়েছিল, সে সময়ে লাখুটিয়ার জমিদার ও সাহিত্যসেবী দেবকুমার রায়চৌধুরীকে তিনি একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন—

> রবিবাবুর এইসব অন্ধ স্তাবক এবং অনুকারকদের মধ্যে তাঁর দোষগুলির বড়ই বেশি প্রতিপত্তি বেড়ে চলল এবং রবিবাবুর প্রতিভার যে রকম দুর্দম্য প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই পরিণামে এসব দোষ আমাদের সাহিত্যে অধিকাংশ নবীন লেখকদের মধ্যে অল্পাধিক সংক্রামিত হয়ে পড়বে।[২]

সুরুচির বিচারে 'আনন্দবিদায়'-এর ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের ঝাঁজ কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে না-হোক, অন্যান্য সাহিত্যে এ-রকম রচনার আদৌ যে নজির নেই, তাও বলা যায় না। আর, এও ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণধর্মী তৎকালীন নব্যতন্ত্রের কবিরা গুরুর গুণ অনুকরণ করতে গিয়ে

নিজেদের লেখাতে দুর্বল প্রতিধ্বনির দোষই যে বহু পরিমাণে পুঞ্জিত রেখে গেছেন, স্রষ্টার আসন থেকে সে-কথা দ্বিজেন্দ্রলালই সে-কালে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন।

মধুসূদনের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মোহিতলাল তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'মধুসূদন যেমন বিজাতির সাহিত্যিক আদর্শ নিজের আত্মায় আত্মসাৎ করিয়া বাংলা কাব্যকে নবকলেবর দান করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও আর এক ক্ষেত্রে, সেই ধরনের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন—বিলাতী গীতি-সুর নিজ প্রাণে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বাংলা ছন্দে ও বাংলা সঙ্গীতে রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুরের সেই অভিনবত্বই বাংলা ভাষায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান।'[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মন্দ্রের' সমালোচনায় বহুকাল আগেই মোহিতলালের এই উক্তির পূর্বাভাস জানিয়ে গেছেন। ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ ছিল, তার নিদর্শন আছে তাঁর কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় এবং তাছাড়া অন্য কয়েকটি লেখাতেও। নিজের কবিতায় মৌখিক উচ্চারণের প্রচলিত রীতি বজায় রেখে 'মাত্রিক' নাম দিয়ে তিনি তাঁর এক ধরনের ছন্দ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন 'আলেখ্য' বইখানির ভূমিকায়। 'ত্রিবেণী'-র ভূমিকায় আবার আর এক দফা ছন্দ ব্যাখ্যানের প্রয়াস ঘটেছে। চতুর্দশপদীর চেয়ে দশপদী কবিতায় সনেটের কাজ বেশি হওয়া অসম্ভব নয়, কথাসূত্রে, এমন মন্তব্যও তিনি করেছেন। বলা বাহুল্য, এসব কথা তলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এইসব মন্তব্যের পক্ষেও যেমন, বিপক্ষেও তেমনি ভিন্ন-ভিন্ন সমজদারের পৃথক-পৃথক গোষ্ঠী গজিয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

পণ্ডিতমহলে এ রকম পক্ষ-প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব সবাই জানেন। আর একথাও সকলেই জানেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা, গান, নাটক এক সময়ে বাংলা দেশের মনোহরণ করেছিল আপন গুণে।

সেজন্যে কোনো ব্যাখ্যাতার মধ্যস্থতা দরকার হয়নি। মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি উনিশের শতকের মধ্যপর্বের কবিদের লেখার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য কবিদের লেখাও তিনি অনেক পড়েছেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজিতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃষি-শিক্ষার্থে 'স্টেট্ স্কলারশিপ' নিয়ে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন এবং সেখানে 'Lyrics of Ind' নামে স্বরচিত এক ইংরেজি কবিতার বই প্রকাশ করেন। সে হলো ১৮৮৬-র ঘটনা। বিলেত থেকে ফেরবার পরে সমাজ তাঁকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান দিতে রাজি হয়নি। এই সময়ে ১৮৮৭ সালে তাঁর বিবাহ হয়। সমাজের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে 'এক ঘরে' নামে একখানি নক্‌শা লিখেছিলেন তিনি। তাঁর হাসির গানে দেশসেবক 'নন্দলাল', ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থকার 'চণ্ডীচরণ', 'হ্যাট্টা-কোট্টা'-ধারী 'চম্পাটির দল', বিলাত-ফের্তা ক'ভাই, ইরাণ দেশের কাজি, তানসেনের শ্রাদ্ধ, রামচন্দ্রের বনবাস ইত্যাদি ব্যক্তি ও বিষয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন 'বলি ত হাস্‌ব না, হাসি রাখতে চাই ত চেপে',—কিন্তু না হেসে উপায়ান্তর ছিল না।—

> যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে,
> যবে কেউ মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙ্গে গড়ে;
> যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরেন হরির মালা
> তখন ভাই নাহি ক্ষেপে; হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে কোন্—

শেষ অনুক্ত পদটি রসিক পাঠক নিজগুণে পূরণ করে নেবেন! দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের Pope-এর অভাব পূরণ করেছিলেন। ব্যক্তি-জীবনে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ, সেট্‌লমেণ্ট-অফিসারের কাজ,—বার বার বদ্‌লি,—চাকরিজীবনে কতকটা অস্বস্তির যন্ত্রণাই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। ১৯০৩ সালে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে।

১৯০৫ সালের দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে পূর্ণিমা-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। তার আট বছর পরে ১৯১৩-র ১৭ই মে কলকাতায় তাঁর শেষ জীবনের বাসস্থান সুরধামে'ই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেললেন।

অনেক দুঃখেও শেষ পর্যন্ত হার মানেন নি তিনি। বাংলা দেশের বহু দুর্যোগময় একটি সুদীর্ঘ কালপর্ব মুখর হয়ে উঠেছিল তাঁর নানা কথায়, নানা গানে। তাঁর হাসির গানে আছে ভারতবর্ষের নির্মল, অবারিত সূর্যকিরণ। তাঁর প্রাণে ছিল ভারতবর্ষের পূত আদর্শ। গানে তিনি বলেছিলেন—

> চোখের সামনে ধরিয়া রাখিব
> অতীতের সেই মহা আদর্শ
> জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে,
> রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !

সংসারে 'যেমনটি চাই তেমন হয় না',—এ হলো তাঁরই কথা। এই মর্মান্তিক বাস্তব সত্য তিনি বুঝেছিলেন, কিন্তু আদর্শের দিকে তাঁর প্রাণের উর্ধ্বগতি তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। বৃথা স্বপ্নে, মিথ্যা মায়ায়, মোহের বিভ্রমে তিনি আত্মহারা হবেন না,—এই ছিল তাঁর একান্ত প্রতিজ্ঞা। হাসিতে, গাম্ভীর্যে—নানা সুরে, তিনি এক সুনিশ্চিত ভালোবাসার কথাই বলে গেছেন। অভাবকে তিনি হাসিতে রূপান্তরিত করে গেছেন, আঘাতকে করেছেন আনন্দের প্রেরণা।

প্রমথ চৌধুরী 'পদচারণে' সে কথা আমাদের সকলের তরফ থেকেই অভ্রান্তভাবে জানিয়ে গেছেন :—

> যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে বিলিয়ে
> যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,

মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
রহিবে সেথায় চির, তার ধূপছায়া।[৪]

আগেই বলে নেওয়া গেছে যে বোধের প্রয়োজনে ভাষার ব্যাকরণ লঙ্ঘন করলে কবিতায় সেটা দোষের ব্যাপার বলে গ্রাহ্য নয়। যেখানে রসের বিরোধিতা, সেখানেই পাঠকের আপত্তি। সেই বিরোধিতা ঠিক কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সম্ভব, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলবার উপায় নেই। কবিরা অভিধানবদ্ধ শব্দও ব্যবহার করতে পারেন, আবার গ্রাম্য, অসংস্কৃত, আঞ্চলিক এবং গুরুচণ্ডালী শব্দ-সমাবেশেও আপত্তি নেই। 'ভারতী'র কবিদের মধ্যেও চলিত রীতির এবং আটপৌরে বিষয়ের অনাদর ছিল না। কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের—

ওকালতি পাশ করে মুস্কিলে পড়লুম,
কেউ বলে যাও গয়া, কেউ বলে মানভূম,[৫]

কিংবা—

বেল-ফুল চাই না
জুঁই-ফুল দাও!
ও গানটা গেও না
এই গান গাও!
কেন ভালবাসলে
বল—বল না;
হাসলে কেন তুমি
কথা কব না?[৬]

—ইত্যাদি কার না মনে পড়ে?

উনিশের শতকের শেষ দশক থেকে শুরু করে আমাদের শতকের প্রথম দশকের শেষ অবধি প্রায় বিশ বছর রবীন্দ্রনাথের

লোকোত্তর প্রতিভা বাংলার কবিদের অত্যন্ত প্রবল ভাবে আচ্ছন্ন রেখেছিল বল্‌লে অন্যায় হবে না। কারণ, এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যের ভাষা-প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী,—সত্যিকার বোধের তাড়না-প্রসূত দ্বিতীয় কোনো শব্দ-আন্দোলন বাংলায় সত্যিকার কবি-প্রতিভার সমর্থন পায়নি। একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মনে কোনো বিশেষ অতৃপ্ত বোধের দাবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করা দরকার, এই সমসাময়িক উত্তেজনাটাই বেশি ছিল। সেই উত্তেজনা নানা কারণে বেড়ে গিয়েছিল। ১৯০৬-এর কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথের দোষ দেখাবার সজ্ঞান ঘোষণা জানিয়ে ১৯১২-তে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পরিবর্ধিত 'আনন্দ বিদায়' প্রকাশ করেন। 'আনন্দ-বিদায়' প্রথম প্রচারিত হয়েছিল 'বঙ্গবাসী'তে। তারপর সেটি যখন পুস্তিকার আকারে ছাপা হয়, তখন সেই নাটিকার 'প্রস্তাবনা'-তে তো বলাই হয়েছিল যে—

নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে চাঁটিকা ॥
কে রসিক বেরসিক জানি না,
বিদ্বেষ নিন্দাও মানি না,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার
বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা ॥

—তাছাড়া বইয়ের ভেতরের আক্রমণটা প্রধানত ছিল কবিতার বাস্তব-সত্যেরই বিরুদ্ধে। শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই নিজের আলেখ্য'-বইখানির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে, তার মানে দশ জনে দশ রকম বের করে তাঁদের

নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না।' 'আনন্দবিদায়'-এর দণ্ডধারীর দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী মল্লিকা বখে-যাওয়া আনন্দ-'কবি'-র নিচের এই উক্তি পড়ে অনুরাগে মুগ্ধ হয়েছিলেন—

পথে যে ভয়ানক কাদা ;
বাড়ির লোক বলে ঘরেতে বসে থাকা
কেমন আরামটি দাদা···

দণ্ডধারী জিগেস করেছিলেন—'এ কি রকম কবিতা ?'

মল্লিকা তার উত্তরে আর একটি স্তবক পড়েছিলেন—

পথের লোক বলে উহুহু মরি মরি !
গরমে গেল গেল প্রাণ ;
বাড়ির লোক বলে আহাহা কি আরাম
টানুরে টানা পাখা টান।

এই দুটি অংশ শোন্‌বার পরেও রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতাটি কি কাউকে মনে করিয়ে দেবার দরকার হবে ? যাই হোক্ মল্লিকা বলেছিলেন যে, ঐ কবিতা তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল।—'উঃ কি মধুর ! কি গভীর ! কি গভীর !'

তখন দণ্ডধারীকে বাধ্য হয়েই জিগেস করতে হয়েছিল—'গভীর কি রকম ! মানে কি ?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'মানে আবার কি ! এতে বুঝবার কিছু নাই। এ শুধু গন্ধ !'

মল্লিকার এই টিপ্পনীটি একই সঙ্গে ব্যঙ্গপটু দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ-সাফল্যের এবং শব্দার্থের অতিশায়ী কবিতার গূঢ় সত্যে তাঁর অবিশ্বাসের পরিচায়ক। কাব্য 'বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে'—১৩২২-এর মাঘের 'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথ একথা খুবই স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন। সে লেখাটির নাম 'বৈরাগ্য-সাধন'; নাটকের 'সূচনা' হিসেবে সেটি

রে গ্রন্থভুক্ত হয়। ফরাসী সাহিত্যে বদ্‌লেয়ার (১৮২১-১৮৬৭) এবং তাঁর ভাব-শিষ্যদের মধ্যে স্টিফান ম্যালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮), এবং অন্যত্র, মার্কিন কবি ও গল্পকার এড্‌গার অ্যাল্যান পো (১৮০৯-১৮৪৯) শিল্প-সৃষ্টিতে এই বোধ-সত্যের দাবিকেই সবচেয়ে বড়ো জায়গা দিয়ে গেছেন। তাঁরা বাংলা দেশের এসব ঘটনার কাছাকাছি সময়েই পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে সাহিত্য-শিল্পের নতুন প্রবণতা সৃষ্টি করছিলেন।

১৩১৮ থেকে ১৩২০ সালের মধ্যে, অর্থাৎ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে রবীন্দ্র-শিষ্য অজিতকুমার চক্রবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির এই বোধের মহিমা বিশদ ভাবে আলোচনা করেছিলেন। বিশেষত তাঁর 'শিল্প', 'কবিতা' এবং 'সৌন্দর্য ও মহিমা', এই তিনটি প্রবন্ধ এই সূত্রে স্মরণীয়। 'বাতায়ন'-বইখানির মধ্যে এই প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছিল। উনিশের শতকের রবীন্দ্রবিরোধীরা কবিতার বোধমূল্যের চেয়ে অর্থমূল্যেরই বেশি দাম দিতেন।

রবীন্দ্র-ধারার পাশাপাশি ভিন্নধর্মী কবিদের ভিন্ন শব্দের সন্ধান বা তৎপ্রাসঙ্গিক অন্যতর প্রয়াস নিতান্তই সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি কবির কালানুক্রমিক সন্ধানের মধ্যেই সে সাধনার ইতিহাস লক্ষণীয়।

একই যুগের ভিন্ন ভিন্ন কবির শব্দ-প্রকৃতির পার্থক্যের কিঞ্চিৎ নমুনার জন্যে আমাদের এই শতকের তিরিশের দশকের কয়েকজন কবির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৩২-এ প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা',—১৯৩৩-এ বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি', বুদ্ধদেব বসুর 'পৃথিবীর পথে',—১৯৩৫-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' ছাপা হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই সময়ের কয়েকটি কবিতায় সুপরিচিত, সুবোধ্য (সব সময়েই তিনি সুবোধ্য শব্দের ভক্ত) শব্দের মধ্যেই কিঞ্চিৎ সত্যেন্দ্র-মোহিতলাল-নজরুলের শব্দরুচির

প্রভাব ছিল। 'দেওয়ানা দেয়া',—'দরিয়াতে আজ কই দাহুরি' ('মেঘলা মোহ'),—'নাই পেয়ালায় বুজরুকি', 'পুঁথির পাতায় ধাপ্পাবাজি',—'প্রিয়ার ঠোঁটের গুল্‌বাগে ভাই ইজারা যে দুই দিনের' ('ইহবাদী'—প্রথমা, নতুন সংস্করণ ১৩৬১) ইত্যাদি প্রয়োগের মধ্যে সেই প্রভাবের চিহ্ন আছে। 'ঝিউড়ি মেয়ে ঘষ্‌তেছে পা খেজুর-গুঁড়ির পাটে', 'মৌটুসকি টুসকি মারে ফুলে', 'মহুয়াবন মাৎ করে ওই মৌমাছিদের পাল'—কিংবা 'প্রথমা'র 'নটরাজ'-কবিতাতে 'বৎসহারা কোন্ সাহারা হাহা করে, কোথায় হাহা করে' এবং শেষ ক'লাইনে সেই 'তাতা থিয়া তাতা থিয়া' ধ্বনির মধ্যে সত্যেন্দ্র-নজরুলের প্রতিধ্বনি অনুমান করলে অপরাধ হবে না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরও এই ধরনের শব্দের দিকে ঝোঁক ছিল। 'বিদ্যুল্লতা' শব্দটি তখন কোনো কোনো কবির বোধ হয় খুবই ভালো লেগেছিল। বুদ্ধদেব বসু 'ওগো বিদ্যুল্লতা' নাম দিয়ে একটি কবিতাই লিখেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঐ সময়ের একটি কবিতায় 'বিদ্যুল্লতা ছুঁয়েছে যে তার ভস্ম বাসনাগুলি' লাইনটি দেখা ('স্মৃতি'—প্রথমা, নতুন সংস্করণ) গিয়েছিল। সেকালের একদল কবির প্রিয় শব্দাবলীর একটি তালিকা তৈরি করতে হলে কলিজা বা কলেজা, কিংখাব, খুন, খুন্‌রোজী, গরল, চন্দ্রমল্লী, চুল্‌বুল্, জৌলস, ডাগর, দরাজ, দরিয়া, দাহুরী, দিল্‌দার, দিওয়ানা বা দেওয়ানা, নীবি, পেয়ালা, বেদিয়া, বেলোয়ারি, বেহুঁশ, বেঘোর, মিনার, মীনকন্যা, মীনকুমারী, মুসাফির, মোতিমহল, মুসল্লা, রভস, শকুন ও শকুনবধূ, শরাব, শরাই, সাকী, সারেঙ, সার্সি প্রভৃতি শৌখীন স্বপ্নবিলাস বা ভোগসুখ বা হাহুতাশ-ভাবের অনেক শব্দের সঙ্গে অঙ্গার, উল্কা, খোঁচা, কর্ম, ধূমকেতু, নাভিশ্বাস, প্যাঁচ, ফুল্‌কি, বজ্র, বিদ্যুৎ, মরু, মরীচিকা, মরুমায়া, মুমূর্ষু, রুদ্র, হাতুড়ি ইত্যাদি আঘাত-আগুন-যন্ত্রণা-বাচক শব্দও পাশাপাশি জায়গা

পাবে। প্রথম বিভাগে যে ক'টি শব্দ সাজানো হলো, তার প্রত্যেকটি জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা-পালক' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩ সাল) বইখানির মধ্যে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় বিভাগের প্রত্যেকটি আছে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ সাল) বইয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল এবং মোহিতলাল প্রথম বিভাগের সব শব্দই ব্যবহার করে গেছেন। তাঁরাই পথ দেখিয়েছিলেন। অনুবর্তীরা সেই পথে এগিয়েছিলেন। শব্দের আলোচনা মনস্তত্ত্বের দিকে আকর্ষণ করে। বিশের মাঝামাঝি সময় থেকে তিরিশের দশকের শুরু অবধি বাংলা দেশের সাহিত্যকদের মধ্যে একটা যাযাবর-ভাবের উদয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সেই প্রসিদ্ধ কবিতাটি এইসূত্রে মনে পড়া স্বাভাবিক—'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে'। ১৮৮৮-তে তিনি ঐ কবিতাটি লিখেছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৯২০-র দশকে সেই কবিতার অন্তর্লীন দূরায়নী বাসনা বাংলার সাহিত্য-মননের ধারায় নতুন প্রেরণা জুগিয়েছিল। আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দের দিকে সে-সময়ের কবিদের বিশেষ পক্ষপাত শুধু সত্যেন্দ্র-মোহিতলাল-নজরুলের ইসলামী শব্দ-চর্চার একটা আনুষ্ঠানিক অনুবৃত্তি হিসেবে ধরা চলবে না। তার মূলে ছিল বিশেষ কালের বিশেষ অনুভূতি, বিশেষ প্রেরণা। 'অদৃষ্টের বন্ধনেতে' বাঁধা পড়ে কবিরা তখন আর 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী, স্তন্যপায়ী জীব' হয়ে থাকতে চাচ্ছিলেন না। তাঁদের মনে জেগেছিল সেই স্বপ্ন—

> ইহার চেয়ে হতেম যদি
> আরব বেদুয়িন!
> চরণতলে বিশাল মরু
> দিগন্তে বিলীন।

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছে নিশিদিন—
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।[৮]

সেই সঙ্গে ওমরখৈয়মের আবেদন, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনা, রুশ-বিপ্লবের রোমাঞ্চ, ফ্রয়েডের নব-মনস্তত্ত্বজ্ঞান, শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমের প্রতীক-আন্দোলন, সেবাধর্মের চিন্তায় বিবেকানন্দের মহিমার স্বীকৃতি ইত্যাদি দূরের প্রভাব, কাছের প্রভাব সবই ছিল।

যাই হোক্, এখন শব্দের প্রসঙ্গে যে কথা শুরু করা গেছে সেই মূল প্রসঙ্গের দিকে মন রেখে ওপরের শব্দগুলির প্রকৃতি যে কী রকম, সেই কথাটিই বলা দরকার। ওদের অর্থগত শ্রেণী-নির্ণয়ের প্রয়াস আর বিস্তারিত না করে এখানে অবশ্যই এ-মন্তব্য করা [illegible] যে, ওগুলি ঠিক অভিধান-বদ্ধ শব্দ নয়,—অর্থাৎ কবিতা পড়বার সময়ে অভিধান খুলে ও-সব কথার মানে খুঁজতে হয় না।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা'র মোট পঁচিশটি কবিতার মধ্যে দুটি লক্ষণীয় পার্থক্য সকলেরই চোখে পড়বে। প্রথমত, আগে যাঁদের কথা বলা হলো এবং যে-ক'খানি বইয়ের কথা হলো, তাঁদের সেই বইগুলির তুলনায় 'অর্কেস্ট্রা'র কবির তৎসম শব্দের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল; দ্বিতীয়ত, পূর্বে অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত অনেক আভিধানিক শব্দও তিনি ব্যবহার করেছেন। একটি ছোটো শব্দের কথাই প্রথমে বলা যেতে পারে। 'সরম' এবং 'আর্ত' এই দুই পদের

সন্ধিজাত 'সরমার্ত'-শব্দটি 'অর্কেষ্ট্রা'র দ্বিতীয় কবিতা 'চপলা'-তে ব্যবহার করা হয়েছিল। ও-শব্দের অর্থবোধের জন্মে অভিধান খোলবার দরকার হয় না। জীবনানন্দের 'মুসল্লা'-র জন্যেই বরং অভিধানের প্রয়োজন বেশি মনে হবে। 'সরমার্ত' শব্দটি সুধীন্দ্রনাথ যে-ছন্দে ব্যবহার করেছেন, তার চালও বিশেষ গম্ভীর নয়। তবু কথাটার নিজের মধ্যেই কেমন একরকম গাম্ভীর্য আছে, গুরুত্ব আছে। যিনি বলেন—

জনমে জনমে, মরণে মরণে
মনে হয় যেন তোমারে চিনি।
ও-সরমার্ত অরূপ আনন
দেখেছি কোথায়, হে বিদেশিনী ?[১]

—তাঁকে শুধু এই নমুনার জন্যেই যে অদ্বিতীয় মৌলিকতার প্রশংসা-পত্র দিতে হবে, তা নয়। কিন্তু তিনি যে ভিন্ন সুরের, ভিন্ন কণ্ঠের, ভিন্ন ভাষার কবি, সে বিষয়ে কোনো তর্কের প্রয়োজন আছে কি ? তাঁর অনুভূতি স্বতন্ত্র। জীবনানন্দ তখনো তাঁর স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন নি। তিনি সেকালের কবিতার ফ্যাশান-দুরস্ত ভাষাটাই অভ্যাস করতে ব্যস্ত ছিলেন ; প্রেমেন্দ্রও সত্যেন্দ্র-মোহিতলাল-নজরুল-যতীন্দ্রনাথের ভাষাটাই নিজস্ব প্রয়োজনে মানিয়ে নিয়েছিলেন। প্রয়োজন অনুসারে তিনি 'আজ আমি চলে যাই' কিংবা 'ফের যদি ফিরে আসি'-র মতন ঋজু, স্পষ্ট, গম্ভীর কথাও বলতে দ্বিধা করেননি। অজিত দত্ত বিশেষ করে তাঁর 'কুসুমের মাস'-এর সনেটগুলিতে ভাষার নিরাভরণ স্নিগ্ধতা দেখিয়েছিলেন। তখনকার নানা কবির নানান্ লেখা দেখে অন্য সবাইকে অল্প-বিস্তর চঞ্চল, উত্তেজিত, উদ্দীপিত মনে হতে পারে, কিন্তু অজিত দত্তের শব্দ-সমাবেশ ভারী শান্ত,—যেন শীতের মধ্যাহ্ন-স্নিগ্ধতা !

সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু ঠিক সে রকম নন। 'অর্কেষ্ট্রা'-র আগে যখন 'তন্বী' বেরিয়েছে, তখন তাতেও তাঁর স্বকীয়তার লক্ষণ স্পষ্ট দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, এ-সব মন্তব্য আপেক্ষিক। জীবনানন্দের 'ঝরা পালক'-এর চেয়ে সুধীন্দ্রনাথের 'তন্বী'-তে কবির শব্দ-স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ বেশি দেখা যায়,—এই কথাটাই বক্তব্য। 'ঝরা পালকে'র কবির মতো তিনি কখনোই লিখতে পারতেন না—

সে কোন্ ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ-শুঁড়িখানায় বাজে।
চিনিমাখা ছায়ায় ঢাকা চুণীর ঠোঁটের মাঝে
লুকিয়ে আছে সে কোন্ মধু মৌমাছিদের ভিড়ে।[১০]

কিংবা—

ওরে কিশোর,—দূর-সোহাগীর ঘর বিরাগী সুখ!
—টুক্‌টুকে কোন্ মেঘের পারে ফুট্‌ফুটে কার মুখ
ডাকছে তোদের ডাগর কাঁচা চোখের কাছে তার!
—শাদা শকুন-পাখায় যে তাই তুলছে হাহাকার
ফাঁপা ঢেউয়ের চাপা কাঁদন—ফাঁপর-ফাটা বুক।[১১]

না, এ রকম ভাষা সুধীন্দ্রনাথকে মোটেই মানাতো না। অথচ 'ছুঁড়ি' শব্দটাও বেশ চালু হয়েছিল। ১৩৩৫-এ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'ফেমিন রিলিফ'-এ একাধিকবার ঐ আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছিলেন,—যদিও, সেখানকার বিষয়ের এবং সমাবেশের গুণে আপত্তিটা তেমন অনিবার্য বোধ হয়নি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে ও-শব্দ ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল। কারণ, তাঁর তখন আত্মস্থতা এসে গেছে। জীবনানন্দের তখনো আসে নি। 'ঝরা-পালক'-থেকে উদ্ধৃতি তুলতে তাই স্বভাবতই কুণ্ঠা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালের পরিণত জীবনানন্দের সূচনার চিহ্নও 'ঝরা-পালক' থেকেই উদ্ধৃত হতে পারে। সেই রকম একটি উদ্ধৃতি তুলে

সমালোচকের অনিবার্য পাপ-কৃত্যের গ্লানি মোচন করা যাক। 'কবি', 'সেদিন এক ধরণীর' এবং আরো দু'একটি কবিতায় সে চিহ্ন বিদ্যমান। মনে মনে জীবনানন্দের পরিণত কালের বিশেষত্বের সঙ্গে 'কবি'র এই ক'টি লাইন মিলিয়ে দেখা যেতে পারে—

করবীকুঁড়ির পানে চোখ তার সারাদিন চেয়ে আছে চুপে,
রূপসাগরের মাঝে কোন্ দূর গোধূলির সে যে আছে ডুবে!
সে যেন ঘাসের বুকে,—ঝিল্‌মিল্ শিশিরের জলে;
খুঁজে তারে পাওয়া যাবে এলোমেলো বেদিয়ার দলে,
বাব্‌লার ফুলে ফুলে ওড়ে তার প্রজাপতি পাখা,
ননীর আঙুলে তার কেঁপে ওঠে কচি নোনা শাখা!

হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে!
হয়তো শুনেছ তারে,—তার সুর,—দুপুর আকাশে
ঝরাপাতা-ভরা মরা দরিয়ার পাশে
বেজেছে ঘুঘুর মুখে,—জল ডাহুকীর বুকে পউষ-নিশায়
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পূবালি হাওয়ায়!

'অর্কেষ্ট্রা'তে উতল, নীবি, ফেনিল, মদির, রভস, লোর ইত্যাদি সমকালীন প্রিয় শব্দগুলি ব্যবহৃত হলেও আর-এক জাতের শব্দের সঙ্গে, সুরের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সে সব যেন ভিন্ন ভাবে বেজেছিল। প্রমোদ-রাত্রির কথা তখন অনেকেই ভেবেছেন, বলেছেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যে বিশেষ অনুভূতি থেকে সে ব্যবহার ঘটেছিল, সেই অনুভূতিরই স্বাতন্ত্র্য ছিল। পাশাপাশি কয়েকজন কবির কয়েকটি অংশ মিলিয়ে দেখলেই সে পার্থক্য কতকটা বোঝা যাবে। প্রণব রায় সে সময়ে 'কল্লোল'-এর নিয়মিত কবিদের অন্যতম; ১৩৩৫-এর চৈত্রের 'কল্লোলে' তাঁর 'স্মরণ'-কবিতাটি ছাপা হয়েছিল।

তাতে কবিদের চিরাভ্যস্ত বেদনার ভাষাতেই কালের অশেষ প্রবাহে বিশেষ পূর্ণিমা-রাত্রির অবশ্যম্ভাবী বিলুপ্তির কথা ব্যক্ত হয়েছিল—

আজিকার মাধবী পূর্ণিমা
নিঃশেষে মিলায়ে যাবে বিস্মৃতির অমা-অন্ধকারে!
তোমার জগৎ হতে অনাদৃত স্মৃতি মোর পড়ে যাবে খসি'
নিশান্তের গন্ধহারা ছিন্ন-মালা সম!
হৃদয়ের পান্থশালে তব
কবে কোন্ দূরান্তের মুসাফের বেঁধেছিল বাসা,
প্রণয়ের সুরাপাত্র পূর্ণ করি করেছিলো পান—
আর তাহা পড়িবে না মনে!

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর প্রসিদ্ধ 'বিস্মৃতি' কবিতায় কতকটা অনুরূপ স্মৃতি-বিস্মৃতির প্রসঙ্গ অবলম্বন করে লিখেছিলেন—

যাযাবর হাঁস নীড় বেঁধেছিল বন-হংসের প্রেমে
আকাশ-পথের কোন্ সীমান্তে থেমে;
সে কবে আমার মনে
ডুবেছে বিস্মরণে।
আজি শুধু তার শূন্য নীড়টি ঘিরি
হতাশ আশার উদাস অলস মৌমাছি মরে ফিরি।

প্রণব রায়ের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের, অথবা প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের তুলনার প্রস্তাব নয়! এখানে বাংলা কবিতার তৎকালীন ভাষা এবং ভঙ্গির রেওয়াজটি লক্ষ্য করবার জন্যেই প্রায় এক রকম বিষয়ে পর পর কয়েকজনের রচনা তুলে দেখলে আলোচনার সুবিধা হবে। প্রণব রায় সাধু ক্রিয়াপদের কাঠামোতে 'ছিন্নমালা', 'পান্থশালা', 'মুসাফের', 'সুরাপাত্র' ইত্যাদি সাজিয়ে প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'আর তাহা পড়িবে না মনে।' প্রেমেন্দ্র চলিত ক্রিয়াপদের

সঙ্গে 'ঘুরি', 'ফিরি' ইত্যাদি কাব্যিক ক্রিয়ারূপ যোগ করে 'যাযাবর', 'আকাশ-পথ', 'শূন্য-নীড়', 'হতাশ আশা', 'উদাস অলস মৌমাছি' ইত্যাদি ভাবের সাহায্যে প্রণয়-বোধের সর্বম্-অনিত্যম্ ভাবনাটিই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ কতকটা একই অভিজ্ঞতার কথা ভিন্ন ভঙ্গিতে লিখেছিলেন—

প্রেয়সী, আছে কি মনে সে-প্রথম বাত্ময় রজনী,
ফেনিল মদির-মত্ত জনতার উল্বণ উল্লাস,
বাঁশীর বর্বর কান্না, মৃদঙ্গের আদিম উচ্ছ্বাস.
অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি ?
আছে কি স্মরণে, সখি, উৎসবের উগ্র উন্মাদনা,
করদ্বয়ে পরিপ্লুত, চারিচক্ষে প্রগল্ভ বিস্ময়,
শূন্য পথে দুটি যাত্রী, সহসা লজ্জায় পরাজয়,
প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আশ্লেষের যুগ্ম প্রবর্তনা ?

এই অষ্টকের পরে জীবন-দার্শনিকের গভীর মর্মবেদনা উচ্চারিত হয়েছিল অনুরূপ সংহত ভাষায়—

সে-শুদ্ধ চৈতন্যখানি বৃথা তর্কে অ জি দিশাহারা,
বন্ধ্য স্পর্শে পরিণত স্বপ্নপ্রসূ সে গাঢ়-চুম্বন।
ভ্রাম্যমান আলেয়ারে ভেবেছিলো বুঝি শুকতারা,
অকূল পাথারে তাই মগ্নতরী আমার যৌবন।
মরে না দুরাশা তবু ; মনে হয়, এ-নিঃস্ব জগতে
এতখানি অপচয় ঘটাবে না বিধি কোনোমতে॥

কবিতাটির নাম 'অপচয়'। সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেই বিশের শতকের রবীন্দ্রেতর বাঙালী কবি-সমাজের অপচয়-বিরোধিতার প্রথম সার্থক নিদর্শন চোখে পড়লো। শব্দের অতি-প্রগল্ভতা, ছন্দের অতি-ঝঙ্কার, ভাবের ফেনস্ফীতি অথবা প্রথালব্ধ এবং সাময়িক জনরুচির (তা সে

কবিতার ক্ষেত্রেই হোক্ আর ব্যাপকতর জীবনের ক্ষেত্রেই হোক্) আনুগত্য তাঁর ধাতে সয়নি। 'কল্লোলে'র কবিরা ছিলেন অংশত মোহিতলালের কাছে ঋণী, অংশত যতীন্দ্রনাথ-নজরুলের কাছে। বুদ্ধদেব বসু এক জায়গায় সে কথার ইশারা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরও বিচারে অসম্পূর্ণতা আছে। তিনি লিখেছেন—

> মোহিতলালের চরিত্রলক্ষণযুক্ত 'বিস্মরণী' যখন বেরোলো, ততদিনে, যতদূর মনে পড়ে, যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' দুটোই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা 'কল্লোলের' অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হয়ে শুনছি 'বিস্মরণীর' বড়ো-বড়ো তাল, ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে—সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্র মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব কষে গরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার মত সুর।

তারপর তিনি বলেছেন—

> যতীন্দ্রনাথের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার জাত যায় না। 'মরীচিকা'য় তিনি যে-তিন মাত্রার ছন্দকে অনেকটা গদ্যের ভঙ্গিতে বন্ধুরভাবে ব্যবহার করেছিলেন, সে ছন্দেরই একটি নির্দিষ্ট, সুপরিমিত প্রকরণ নিয়ে গড়ে উঠলো অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যার' কবিতাবলী।
>
> আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত, প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্কের

ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক একটি আলো-জ্বলা, রেশ-তোলা পংক্তি ('রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা')—বিরল বলেই তাদের চমৎকারিত্ব যেন বেশি। দ্বিতীয়, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ভিন্ন মানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন থেকে ভিন্ন। যেমন রবীন্দ্রনাথের অবিরল অতীন্দ্রিয়তার পরে মোহিতলালের নির্ভয় দেহাত্মবোধে আমরা উৎসাহ পেয়েছিলাম, তেমনি, অন্য দিক থেকে যেন একটা নিশ্বাস-ফেলা নিষ্কৃতি ছিল যতীন্দ্রনাথের সরল বৈঠকী দুঃখবাদে।[১২]

বুদ্ধদেব চমৎকার ভাবে কথাটা জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এ উক্তির মধ্যে অসম্পূর্ণতার লক্ষণ একাধিক। প্রথমত অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'র আরো নিকট সাদৃশ্য পাওয়া যাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'-র কয়েকটি কবিতার ('যাযাবর হাঁস নীড় বেঁধেছিল' ইত্যাদি) 'ফর্ম' বা রূপবন্ধের সঙ্গে। প্রেমেন্দ্র মিত্রই আগে ঐ নমুনা দেখিয়েছিলেন; অচিন্ত্যকুমার অল্পকাল পরে হয়তো পূর্বাদর্শের সজ্ঞান অনুসরণ ব্যতিরেকেই প্রচুরতর পরিমাণে সেই রূপেরই সদ্ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয়ত বাংলায় আটপৌরে শব্দে এবং আপাত-অপরিশীলিত ভাষায় সাংসারিক সমতলের কথা বলবার কাব্যপ্রথা কুড়ির দশকের আগেই ঘটেছিল। ঐতিহাসিক কারণেই বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি কবির কথা এবং সেই সূত্রে আরো প্রাচীন দ্বিজেন্দ্রলালের কথা স্মরণ করা দরকার। তৃতীয়ত বুদ্ধদেব ঐ লেখাটিরই পরের অংশে যতীন্দ্রনাথের 'ঈষা মুশা আর বুদ্ধ' ইত্যাদি লাইন তুলে বলেছেন—

এ থেকে কোনো গতিশীল চিন্তার যে সূত্রপাত হতে পারে না সে-কথা অবশ্য না বললেও চলে। মানুষের জীবনে বা বিশ্ববিধানে দুঃখ জিনিসটা ঠিক কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ, সেটা

দেখতে হলে আর্য দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, কবির মধ্যে সেটা সব সময় আশা করাও সংগত হয় না। সমসাময়িক বাংলা কাব্যের উপরে যতীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে রূপের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে নয় ; এতেও বোঝা যায় তাঁর দুঃখবাদ বা নেতিবাদের প্রধান গুণ ছিলো—অনুপ্রেরণার শক্তি নয়, শ্রান্তিহারক রমণীয়তা।

যতীন্দ্রনাথ ঠিক 'শ্রান্তিহারক রমণীয়তা'র কবি নন। কঠোরতার তিক্ত চৈতন্যেই তিনি প্রগল্‌ভ। তাঁর প্রসঙ্গে, শব্দে, বিদ্রূপে সর্বত্র দেখা যায় পরিশীলিত তিক্ততা! বরং প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাসময় স্থূল-সমতল-নিষ্ঠার মধ্যেই একরকম শ্রান্তিহারক রমণীয়তা ছিল।

জাফরি কাটান জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া
সে মিনতি রাখি, সময় যে হায় নাই
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই।[১৩]

—একেই বলা যায় শ্রান্তিহারক রমণীয়তা! যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ সে যুগে বাংলা কবিতার পূর্বকালীন অতি-মাধুর্য এবং কৃত্রিম লালিত্যের পরে বিশেষ অভিনবত্বের গুণে কতকটা শ্রান্তিহারক মনে হয়েছিল ; কিন্তু সে স্বাদ রমণীয় নয় ;—কঠোর, বন্ধুর, পৌনঃপুনিক তিক্ত প্রগল্‌ভতার স্বাদ ছিলো তাতে।

তারই পরে তব কোপ গো বন্ধু, তারই পরে তব কোপ,
যেজন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ।

সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল !
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাব কবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি স্নিগ্ধ সাহারা গোবি ।
তেলে সিন্দূরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয় ;
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু ওঠে দুঃখেরি জয় ।[১৪]

স্বভাব-কবির এবং অনুকরণসর্বস্ব-কবির 'টোপ' গিলতে চাননি যতীন্দ্রনাথ। প্রধানত এইটেই তাঁরবিশেষত্ব,—তাঁর স্বভাব ! 'কল্লোল'-গোষ্ঠী এই কারণেই তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পরের দশকে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার কবিরা আরো এগিয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ 'ক্ল্যাসিক্যাল' অর্থে সনাতন-পন্থী। অপচয়ের বিরোধী তিনি। ভাবের প্রগল্‌ভতা, শব্দের অপচয়, ছন্দের চটক ইত্যাদি যাবতীয় অতি-কথনের তিনি বিরোধী। সংশয়ের দীর্ঘ পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে রবীন্দ্র-যুগের বাংলা কবিতার প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠাকাল সেই তিরিশের দশকেই যেন আসন্ন মনে হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তা চরিতার্থ হয়নি। লগ্ন ভ্রষ্ট হয়েছে। মধুসূদনের প্রয়াস যেমন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-গিরিশচন্দ্রের অপরিণামদর্শী অনুকরণের ফলে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল ! রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ন'-দশ বছর, সেই সময়ে ভারতচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত ইত্যাদির ভক্ত এবং বঙ্কিম-দীনবন্ধুর বিশেষ ভক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

কেন বঙ্গভাষে ! ভাস নয়নের জলে আর ;
যবে দেখিতেছি, সদ্যঃ জনমিলা, অমনি
কবিতাইলা, কত কবি-সুত তব ; তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ

সূতা যোগে যারা গাঁথিয়া গৌড়ীয়া গড্যা
(যার অর্থ মালা) (বেলফুল দলে যেন
নূতন বাজারে কত মালী) পরাইলা তব গলে,
বালে ! বয়স এখন তোর কাঁচা, ওলো ধনি !
এর মধ্যে দত্ত-দত্ত অমিত্রে, তোমার কণ্টক
পদ্যের মিল দেখ পরিষ্কৃত ;—মিউনিসিপালিটির
গুণে দেখ যথা জঙ্গল।[১৫]

অমিত্রাক্ষর ছন্দে মিল-বর্জনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই পরিহাস-বিজল্পিত উৎসাহের ভঙ্গিটি সে-যুগের বাঙালী কবিসমাজের এক অঞ্চলের বিশেষ মর্জিরই পরিচায়ক। আবার, মিল পরিহার করবার ফলে অবশ্যম্ভাবী যে বিপদের আশঙ্কা তাঁর মনে জেগেছিল, ইন্দ্রনাথ সেকথাও বলে গেছেন। যেমন—

স্বাধীনতা কাল হল
কত রঙ্গ দেখাইল
হায় প্রেয়সীর হাত
যে সে এসে ধরে রে।
কবিতা কোমল বধূ
ছিল তো আমার শুধু
শত্রু তারে করে ধরে
দেখে ভয় করে রে।[১৬]

এই দুটি উক্তির কোনোটিতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আসল কৃতিত্বের স্বীকৃতি নেই। মধুসূদন ভাবের স্বাধীন গতির মর্যাদা মেনেছিলেন। সেই নতুনত্বই তাঁর প্রধান কথা। গিরিশচন্দ্র সেটা উপলব্ধি না করেই অন্য কৌশলের চেষ্টা করেছিলেন। ভাবের দিক থেকে না গিয়ে বাইরের উপকরণের বা বহিরঙ্গের কৌশল নিয়ে ব্যস্ত

থাকাটা অন্তর্দৃষ্টির চিহ্ন নয়। এই পূর্বকথা মনে রেখে কথাটি বিশদ করবার জন্যেই এইবার একবার উনিশের শতকের দিকে চোখ ফেরানো দরকার।

ইতিহাসের সময়-ধারার দিকে নজর রেখে মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র,—বাংলার এই তিন কবির কথা ভাবতে বসলে কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের একটি ছবি মনে পড়ে। যৌবনে রাজা দশরথ যখন মৃগয়ায় মেতে উঠেছিলেন, তখন অরণ্যের কোমল পল্লবশয্যায় তাঁর বহু রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে। আর, রাত্রিশেষে পটহধ্বনির মতো হস্তীর কর্ণাস্ফালন-শব্দে তাঁর নাকি ঘুম ভাঙতো! মধুসূদনের যুগেই বাংলার কাব্যজগতে আধুনিক মননের প্রভাত অতিবাহিত হয়েছে। তার আগে ঈশ্বর গুপ্তে এবং তারও আগে রামনিধি গুপ্তের লেখাতে সাধারণ মানুষের লৌকিক জীবনের প্রতি মনোযোগ অকুণ্ঠ হতে দেখা গিয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে উনিশের শতকের এই কবিগোষ্ঠির আবির্ভাব আকস্মিক নয়। ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। পুরোনো কালের ধর্মকথার জের টেনে-টেনে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রের অনুকরণকারী কবিওয়ালার দল লালিত্য ও চটুলতার একরকম সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। সেদিন ভক্তির আকুলতাও কেমন যেন মজে উঠেছিল। দাশুরায় উনিশের শতকের মানুষ। রামপ্রসাদী কথার সঙ্গে বাক্‌চাতুরীর জেল্লা মিশেয়ে তিনি বলেছিলেন—

হৃদয় মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন করবে অন্তর্জলী
তখন আমি মনে মনে তুলবো জবা বনে-বনে
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ধারায় গোপাল উড়ের মালিনী বলেছিল—

ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারিদিকে মালঞ্চবেড়া
ভ্রমরেতে গুন্ গুন্ করে কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া !

মিলের চমক, তালের কায়দা, প্রসঙ্গের গতানুগতিকতা এবং যথার্থ উদ্দীপনার অভাব, এই ছিলো কবিগানের প্রকৃতি। ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলালের রচনায় সে প্রকৃতির প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। তবু এঁরাই মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব-সাধক ! ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে তদানীন্তন 'বীটন-সোসাইটি'র এক অধিবেশন রঙ্গলাল বাংলার কবিতানুরাগী রসিকসমাজের উদ্দেশে বলেছিলেন—

আপনারা আর কাল বিলম্ব করিবেন না···উর্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক। অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহসলিল সেচন করুন, পরিশ্রমরূপ হল চালনা করুন···[১৭]

যেন রাত শেষ হলো। ঘুম ভাঙলো 'গজযূথকর্ণতালৈঃ' ! তারপর সামনে প্রশস্ত পথ, নতুন সূর্যালোক ! হাতীর পিঠে হাওদা চড়বে, হাওদার ওপর অলঙ্কার-আভরণ। অভিযাত্রীর অভিযান শুরু হবে। তাঁর লক্ষ্য শুধু মৃগয়া নয়,—আবিষ্কার ! তিনি শুধু আহরণ-প্রত্যাশী নন—তিনি আনন্দিত সম্রাট ! তিনি সাহসী এবং স্বতন্ত্র।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিশিষ্টতা তাঁর নামে, দৃষ্টিতে, ব্যক্তিত্বে এবং জীবনের সকল কর্মে, বিচিত্র সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। ১৮২৪-এ তাঁর জন্ম ; ১৮২৩ থেকে '৪২ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় ; ১৮৪৩-এ তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন ; ১৮৪৪-এর নভেম্বর থেকে '৪৭ অবধি শিবপুর বিশপ্‌স্ কলেজে তাঁর পাঠাভ্যাস ; তারপর তিনি মাদ্রাজে চলে যান। ১৮৪৭ থেকে '৭৩, এই ছাব্বিশটি বছর তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক। তারই মধ্যে

মাদ্রাজে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ,—সংবাদপত্র পরিচালনা,—শিক্ষকতা,—পর-পর জননী জাহ্নবী দেবী এবং পিতা রাজনারায়ণের মৃত্যু,—১৮৫৬-তে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন,—অতঃপর পুলিশ কোর্টে চাকুরি ;—১৮৬২ থেকে '৬৭ অবধি য়ুরোপ-প্রবাস,—বিদেশে প্রচণ্ড অর্থকষ্ট,—বিদ্যাসাগরের দয়ালাভ ইত্যাদি ব্যাপার ঘটে গেছে। অমিত অমিতব্যয়িতা, অশেষ খ্যাতি, তীব্র নিন্দা-কটাক্ষ এবং শ্রম ও কল্পনাশক্তির প্রভূত স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে গেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদনের বইয়ের প্রচ্ছদপত্রে সেকালে যে সংকেতচিত্র ছাপা হতো, তার একদিকে থাকতো ঐরাবত, অন্যদিকে সিংহ,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সমাবেশ-চিহ্ন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম বাংলা বই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হয়। সেই বছরেই 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় 'তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে'র কিছু অংশ ছাপা হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সংক্ষিপ্ত ভূমিকার মধ্যে লিখেছিলেন—

> ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্যপাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়…।

পাশ্চাত্ত্য কাব্য-পুরাণের বিচিত্র প্রভাব আছে তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে। সেইসঙ্গে প্রাচ্য কাব্যধারার ঐতিহ্যবোধ এবং নবীন সৃষ্টির প্রেরণা, দুই-ই আত্মপ্রকাশ করেছে। তিলোত্তমাসম্ভবের পরে মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম সর্গে ভারতীর বন্দনা করে কবি লিখেছিলেন—

বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে গহন-কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি।

বীণাপাণিকে তিনি আরো জানিয়েছিলেন—

হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্য রত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক! উর তবে উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব মা বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি দাসে দেহ পদছায়া।

এবং কল্পনা-কে তিনি বলেছিলেন—

তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে' মধুসূদনের যে বিস্ময়কর সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, পরবর্তী কাব্যমালায় তারই পরিণতি ঘটেছে। অব্যর্থ বিধিলিপির অকাট্যতা সম্বন্ধে চিন্তা, বিষাদ, দীর্ঘশ্বাস,—বীরের বন্দনা,

—মহাকাব্যের ঝঙ্কার ইত্যাদি বিশেষত্বে তাঁর কাব্যলোক উত্তরোত্তর বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রধানত মহাকাব্যের সাধক হিসেবেই তিনি ইতিহাসে সুচিহ্নিত; তবু তাঁর ব্রজাঙ্গনাকাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী ইত্যাদি গীতিকাব্যের খ্যাতিও কম নয়। মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথন কিংবা তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের চতুর্থ সর্গে তিলোত্তমার রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়।

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কাননপথে। কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া, আহা রাঙা পা-দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ
মোহিত মদন-মদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি;

সুন্দ আর উপসুন্দ, এই দুই অসুরের চোখে পড়েছিল তিলোত্তমার সেই আশ্চর্য রূপ। মধুসূদন বলেছেন সূর্যমুখী যেমন সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে, সুন্দরী তিলোত্তমা তেমনি করে চেয়ে দেখলেন। তখন দুই দৈত্যের মধ্যে অধিকারের কলহ শুরু হলো। তারা 'গ্রহদোষে বিগ্রহ প্রয়াসী'। পরস্পরের আঘাতে আহত হয়ে মুমূর্ষু দানবদের মনে দেখা দিলো অনুতাপ,—বিশেষভাবে মধুসূদনীয় অনুতাপ!—

কি কর্ম করিনু, ভাই পূর্বকথা ভুলি
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে?
বালি-বন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্মাইনু
এত যত্নে?[১৮]

ভগ্নদূতের মুখে, যুদ্ধে সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে রাবণও এইভাবে বিলাপ করেছিলেন—

ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি !
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ![১৯]

মধুসূদনের কাব্যে এবং জীবনে, উভয় ক্ষেত্রেই বীর এবং করুণ, এই দুই রসের প্রাধান্য দেখা যায়। মেঘনাদবধকাব্যের নবম সর্গে পতির সহমরণপ্রার্থিনী প্রমীলার চিতারোহণের বর্ণনায় কারুণ্য এবং বীরত্বের ভাব যেন পরস্পর মিশে গেছে—

মুহূর্তে সংবরি শোক কহিলা সুন্দরী—
কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে !

তারপর—

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব।

মেঘনাদবধকাব্যের এই শেষ সর্গে রাবণের বিলাপের মধ্যে বিধাতার দুর্জ্ঞেয় শাসন-রহস্যের উল্লেখ আছে। রাবণ বলেছেন—

হা পুত্র! হা বীর শ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

সেই মহাপরাক্রান্ত রাবণ স্বয়ং যদি কবি হতেন এবং অশেষ পরাক্রমের মধ্যে শোকমথিত কোনো নিঃসঙ্গ অবকাশে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের জন্যে যদি একটি কবিতা লেখবার তাগিদ জাগতো তাঁর মনে,—তাহলে সে রচনা কি শুধু হাহাকার আর অভিযোগের সমাস হয়ে উঠ্‌তো? মন বলে—'কখনোই নয়; সে অতি অসম্ভব ব্যাপার!' বরং মনে হয়—কঠোরে-কোমলে বহুমিশ্র সেই আশ্চর্য জীবনের শেষে হয়তো নাম্‌তো সন্ধ্যা,—আস্‌তো রাত্রি! তারপর দেখা দিতো বিশ্বব্যাপী শান্তি!—'জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম!' মধুসূদনের রাবণ তাঁর নিজের মতোই প্রবল ব্যক্তিত্বের জীবনব্যাপী জ্বালায় জর্জর। প্রমথনাথ বিশী এ-প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করে ঠিকই দেখিয়েছেন যে—'মেঘনাদবধের রাবণ বাল্মীকির রাবণ নয়। মেঘনাদবধের রাবণের অনুপ্রেরণার মূলে বায়রনের বিদ্রোহী নায়কগণ—আবার তাহাদের মূলে মিল্টনের শয়তান।'[২০] বিশী মহাশয় আরো বলেছেন—'রাবণ-চরিত্র যে কেবল আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয় তাহা নয়—এককালে আমরাই রাবণ ছিলাম।' মধুসূদনের রোম্যান্টিক মনে যুগসন্ধির নবোন্মেষিত ব্যক্তিত্ববোধ চিরবিদ্রোহের অশান্তি বপন করেছিল। সেকালের সেই নতুন ব্যক্তিস্বাধীনতার বোধ জীবনের বাস্তব রসের নিরাভরণ দৈনন্দিন রূপটার প্রতি ততোটা সজাগ ছিল না—যতোটা ছিল তার সমারোহের দিকে। মধুসূদনের সমকালীন কবি হেমচন্দ্র সে দিকটা বরং কিছু দেখেছিলেন। তারপর বিহারীলাল আবার নতুন পথ খুলে দিলেন। জনসাধারণের

সম্পর্কবর্জিত, অথচ আমাদের এক নিকট বস্তুলোক থেকেই তিনি একান্ত ব্যক্তিমনের স্বপ্নে মগ্ন হলেন।

বাস্তব জীবন-প্রসঙ্গের কবিতাতে হয় স্বাদেশিকতা প্রভৃতি আবেগের উচ্ছ্বাস,—নয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রয়াস, এই ছিলো সেকালের প্রবণতা। হেমচন্দ্রের 'বাজী-মাৎ',-এ—ইন্দ্রনাথের বিচিত্র ব্যঙ্গ কবিতায়,—বেনোয়ারীলাল গোস্বামীর 'শ্যালকবিয়োগকাব্যে' (১৮৮১) এবং তার পরে প্রকাশিত তাঁর 'সমালোচককাব্য', 'খিচুড়ি', 'পোলাও' প্রভৃতিতে,—দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, বিজয়চন্দ্র ইত্যাদি কবিদের রচনায় সেই মধ্য-উনিশ শতকী মনোভাব কালে কালে ঈষৎ বদ্‌লে এসেছে।

যাই হোক্, জীবনব্যাপী চাঞ্চল্য, অমিতব্যয়িতা এবং তারই মধ্যে একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার শেষে নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল মধুসূদনের জীবনে। হেনরিয়েটার শোচনীয় মৃত্যু, শিশু-পুত্রদের কষ্ট, দাতব্য-চিকিৎসালয়ে দাক্ষিণ্য ভোগের গ্লানি, ইত্যাদি সত্ত্বেও তিনি সেই শেষ সমর্পণের স্বাদ পেয়ে গেছেন। তাঁর জীবন ছিল বন্ধুর,—তাঁর ছন্দ অমিত্রাক্ষর। উনিশের শতকের বাংলা সাহিত্যে তিনি ছিলেন সংগ্রামরত স্রষ্টা। তাঁর আপন সাধনার মধ্যেই মানুষের অনন্ত সাধনার তিনটি ধারা এসে মিশেছিল। জ্ঞানের পথ, কর্মের পথ, এবং ভক্তির পথ,—এই তিন পথের সঙ্গম ঘটেছিল তাঁর জীবনে। দুঃখের জ্বলনের মধ্যেই তিনি স্রষ্টার শান্তি পেয়েছিলেন। বীণাপাণি সরস্বতীকে তিনি বলেছিলেন—

এ দাস তেমতি
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি!
মার কোল সম, মাগো, এ তিন ভুবনে।[২১]

রঙ্গলাল যখন বাংলা কবিতার নব-যুগের সূচনা সম্বন্ধে লেখক-পাঠককে অবহিত হবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তখন কৈশোর,—আর, নবীনচন্দ্র তখনো শৈশব অতিক্রম করেননি। হেমচন্দ্রের প্রথম কবিতার বই 'চিন্তাতরঙ্গিণী' ছাপা হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। সেই বইখানির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—

> কবিতাকেশরী রায় গুণাকরের পর কবিতা রচনা করিয়া যশঃ লাভ করা অসাধ্য।

তবু, 'চিন্তাতরঙ্গিণীর' পরে 'বীরবাহু কাব্য' প্রকাশিত হলো। সেকালের কবি-সাহিত্যিকের সাধারণ মনোধর্মের মধ্যেই স্বাদেশিকতার দিকে এক ধরনের বিশেষ ঝোঁক ছিল। 'এডুকেশন গেজেটে' তাঁর 'ভারত সংগীত' ছাপা হয়। ১৮৭০-এ তাঁর 'কবিতাবলী'-র প্রথম সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭৫-এর জানুয়ারি মাসে তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য 'বৃত্রসংহার'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের অল্পকাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সে কাব্যের সমালোচনা ছেপেছিলেন। মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা-সূত্রে একদিন হেমচন্দ্র লিখেছিলেন—

> উহার শব্দ প্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটাগর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়।[২২]

তারপর, নিজের বৃত্রসংহারকাব্যে তিনি মধুসূদনেরই অনুসরণ করে গেছেন। মেঘনাদবধকাব্যে যেমন, বৃত্রসংহারকাব্যেও তেমনি দৈবশক্তির সঙ্গে দানবীয় শক্তির সংঘাত বর্ণনা করা হয়েছে। মধুসূদনের প্রদর্শিত পথে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চলেছিল সেকালের কবিদের মধ্যে। 'আশা-কানন', 'ছায়াময়ী' ইত্যাদি গৌণ রচনাবলীর মধ্যেও হেমচন্দ্রের সেই যুগোচিত প্রবণতার নিদর্শন আছে। কিন্তু তাঁর কবিসত্তার আগ্রহ ছিলো দেশ-কালের নিকটতর গণ্ডীতে—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, নতুন আইন-কানুনের

চিন্তায়, রাজনৈতিক ভাব ও কার্যের বিচিত্রতায়। তিনি নিজেই বলে গেছেন—

হায় কি হলো ?—কলম ছুঁতে হাসি এলো দুখে।
ভেবেছিলাম মনের কথা লিখবো ছাতি ঠুকে॥
এলো হাসি—হাসিই তবে ঢেউ খেলিয়া চলে।
ছটাক খানিক রসের কথা—হায় কি হলো বলে![২৩]

'বাঙালীর মেয়ে' সম্বন্ধে একদিন তিনি লিখেছিলেন—

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্তিমান্, চারুপাঠ পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাশুরায়ের ছড়া।

আর-একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে তিনি লিখলেন—

হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন
অই বেশ ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি 'বাঙ্গালীর মেয়ে'
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে।[২৪]

মধুসূদনের সঙ্গে হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের প্রভেদ প্রধানত মর্জি-গত, ব্যক্তিত্বগত। মধুসূদনের রাবণের তুলনায় হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর নিষ্প্রভ,—নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস-কাব্যের দুর্বাসা দুর্বল সৃষ্টি! বাংলার কবিসমাজে মধুসূদন যে লোকোত্তর চরিত্র-মহিমার প্রতি নতুন আগ্রহ সঞ্চার করেছিলেন, হয়তো তারই প্রভাবে নবীনচন্দ্র খ্রীষ্ট-বুদ্ধ-চৈতন্যমহাপ্রভুর লীলা বর্ণনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের পথ স্বতন্ত্র,—মনন মৌলিক। তাঁর

দৃষ্টি ছিল বিশেষভাবে তাঁরই স্বকীয়। সে তাঁর অনন্যসাধারণ স্বভাবের দান। সেকালে মধুসূদনের চেয়ে হেমচন্দ্র সত্যিই বেশি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও সাধারণ পাঠকের অনুমোদন পেয়েছিল। উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্য সত্ত্বেও সেকালের সাধারণ পাঠকের কাছে অন্তত তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' বইখানির বিশেষ আবেদন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের নিষ্কাম কর্মবাদ আর মধুসূদন-হেমচন্দ্রের মহাকাব্য-চর্চা, এই দুই পারিপার্শ্বিক সাহিত্য-ঘটনার প্রভাব অস্বীকার করা সেকালের নবীন কবির পক্ষে সত্যিই দুঃসাধ্য ছিল। তবু তারই মধ্যে নবীনচন্দ্র মাঝে-মাঝে কিঞ্চিৎ নতুন সুর শুনিয়ে গেছেন। তার নমুনা আছে তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনার আপেক্ষিক প্রগাঢ়তায়,—গীতিকবিতার বিরল-শ্রব্য ঝঙ্কারে। নবীনচন্দ্রের কবিতাবলীর মধ্যেই মধুসূদনের যুগ শেষ হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এক যুগাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে অন্য যুগ-সূচনার তরঙ্গ চোখে পড়ে। মধুসূদনের কৃত্রিম-প্রাচীনতার পরে অক্ষয় চৌধুরী-বিহারীলালের নব্য-আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল। নবীনচন্দ্র যেন সেই দুই ভিন্ন রাজ্যের ভাব-যোজক!

মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র—এই তিনজনের মধ্যে মধুসূদনই ছিলেন নেতা। সে যুগের কবিদের সংশয়ের স্বরূপ বুঝতে হলে তাঁর দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। হেমচন্দ্র তাঁর 'চিন্তাতরঙ্গিণী'তে ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলাল উভয়েরই রচনারীতি অনুসরণ করেছিলেন। তারপর উত্তরোত্তর তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর দেশপ্রীতি, মধুসূদনের প্রভাব ইত্যাদির কাজ দেখা গেছে। আর, নবীনচন্দ্র পর পর শিবনাথ শাস্ত্রী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির আনুকূল্য বা প্রভাব স্বীকার করে প্রধানত লিরিক উচ্ছ্বাসে প্রবহমান কাব্য রচনা করে গেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—'নবীনচন্দ্রের কাব্যে মধ্যে

মধ্যে প্রকৃত গীতিকবিতার সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে কিন্তু সংযমের অভাবে তাহা নিরর্থ উচ্ছ্বাসের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। রচনা-রীতিতেও সংযমের এবং পারিপাট্যের অভাব আছে।'[২৫] পক্ষান্তরে মধুসূদন ছিলেন পরম মৌলিকতাময় যুগস্রষ্টা। শব্দে, প্রসঙ্গ চয়নে, কবিকল্পনায় তিনি ছিলেন যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো আপত্তির লক্ষণ হলো অনুর্বরতা। সেই অনুর্বরতার কিছুটা সম্ভবত তাঁর দৃষ্টির অতি-বহির্মুখিতারই ফল। সেই ছিলো তাঁর সংশয়। সুকুমারবাবু সেকথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

বিহারীলাল এবং বলদেব পালিত উভয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৩৫-এ। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার জন্মেছিলেন তার তিন বছর পরে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্মবর্ষ ১৮৩৭; হরিশ্চন্দ্র মিত্রের ১৮৩৮-৩৯। কিন্তু এঁদের অনেকের স্মৃতিই এখন নিষ্প্রভ। অতঃপর অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং তাঁদের অনুসরণকারী কবিদের কলমে বাংলায় রোম্যান্টিক দৃষ্টির পরিব্যাপ্তি ঘটেছিল। তারপর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান সমকালীনদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে দেবেন্দ্রনাথ সেনের নাম। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ('সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র মতে ১৮৫৮-তে) গাজিপুরে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম; ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজিতে এম্-এ পাশ করেন এলাহাবাদ থেকে; এলাহাবাদে তিনি ওকালতি করতেন; মক্কেলমহলে বেশ পশার ছিল তাঁর; তখনকার কলকাতায়,—এখন যে অংশের নাম ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জি স্ট্রীট, সেই অঞ্চলে—'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামে এক স্কুল খুলেছিলেন তিনি। দেবেন্দ্রনাথের শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথও সে বাড়িতে পদার্পণ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়—আরো কতো লেখক, কতো কবি সেখানে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে বসে সে

সময়ের ছবি এঁকেছেন,—'গিয়ে কি দৃশ্য দেখলুম! তিনতলায় ছোট্ট একটি ঘরের ভিতরে ছোট্ট একখানি চৌকির উপরে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ কবি—হাতে বাত, পায়ে বাত, প্রায় পক্ষাঘাত রোগীর মত পঙ্গু! চোখে বিষম পুরু কাঁচের চশমা, দৃষ্টিশক্তি প্রায় অন্ধের মত ক্ষীণ, ভীষণ রোগযন্ত্রণা, কিন্তু প্রসন্ন মুখে তার কোন চিহ্ন নেই, কোন অভিযোগ নেই—নির্বিকারভাবে মুখে মুখেই রচনা করে যাচ্ছেন শ্লোকের পর শ্লোক এবং কাগজ-কলম নিয়ে বসে আর একজন তা লিখে নিচ্ছেন।' হেমেন্দ্রকুমার তাঁর অসাধারণ সহিষ্ণুতার কথা লিখেছেন, প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেছেন, কাব্যপ্রাণ সাধনার অধ্যবসায় স্মরণ করতেও ভোলেন নি—এবং সেইসঙ্গে আরো জানিয়েছেন—'দেবেন্দ্রনাথের আর একটি মহৎ গুণ, তাঁর মনে ছিল না ঈর্ষার নামমাত্র'।

১৮৮০-তে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাসংগ্রহ 'ফুলবালা',—তারপর ১৮৮১-তে 'ঊর্মিলা-কাব্য' ও 'নির্ঝরিণী',—১৯০০-তে তাঁর 'অশোকগুচ্ছ',—১৯০৫-এ 'হরিমঙ্গল',—১৯১২-তে তাঁর রসরচনা 'দগ্ধকচু' এবং আরো চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২০-র ২১-এ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তার বছর সাতেক আগে, ১৯১৩-তে তাঁর অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা-কাব্য ছাপা হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় নিজের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে বিনয় প্রকাশ করে প্রাণেশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের ভাব প্রকাশ করেছিলেন। নিজের সম্পর্কে তিনি জানিয়েছিলেন—

কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে
নহে আর; মাধবী-মণ্ডপ তার, মধুপে মধুপে
নহে আর ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত! শুষ্ক সরোবর।

ফোটে না ফোটে না তথা একটিও পদ্ম-মনোহর
উপমার ঝরি গেছে লতা-পাতা ; ওই দীনস্তূপে
ক্রোটনের পাতা কাঁপে হায় তার কে করে আদর ?
কম্বল-সম্বল-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চুপে।[২৬]

১৩৩৩ সালে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন দেবেন্দ্র-কাব্যের বিস্ময়ের কথা, আনন্দের কথা। উনিশের শতকে গীতিপ্রাণ বাংলা কবিতার নবযুগ-প্রবর্তনার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন—'এই সাধন-চক্রের প্রবর্তক বিহারীলাল এবং সিদ্ধসাধক রবীন্দ্রনাথ। আর যে দুইজন কবি রবীন্দ্রনাথের, সমকালবর্তী ও সতীর্থ, তাহাদের একজন দেবেন্দ্রনাথ এবং অপরজন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল।' দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্বের প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন—'তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া অনাবিল প্রীতির মন্ত্রে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন—কোন প্রকার চিন্তা বা বিচারকে তিনি সে পূজাগৃহে পদক্ষেপ করিতে দেন নাই। 'অসংবিন্যস্ত কবিতারাশি'—কথাটা এই দেবেন্দ্রনাথের লেখার প্রাচুর্যের প্রসঙ্গেই সার্থকতম প্রয়োগ। মোহিতলাল লিখেছিলেন—'এমন অসমতা আর কোনও কবির কাব্যসাধনায় লক্ষিত হয় না।' মোহিতলালের সেই লেখাটিই রবীন্দ্রপ্রভায় অতি-আবিষ্ট বাংলার কাব্যপাঠককে সমকালীন অন্য এক রূপানুরাগীর ঠিকানা জানিয়ে দিল।[২৭]

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি—
রূপের পূজারী।
সারা সন্ধ্যা সারানিশি রূপ-বৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস বিদ্যুতের পরকাশ,
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী।[২৮]

—এ হলো দেবেন্দ্রনাথের আপন-কথা। তাঁর ভক্ত সমালোচক কবি মোহিতলাল এই কবিকথা আমাদের চেতনায় তুলে ধরেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার ক্রমবিকাশের সূত্র ধরে মোহিতলাল চারটি স্তরের কথা জানিয়েছিলেন—প্রথমে সৌন্দর্যস্বাদন, তৎপরে, এবং পূর্বস্বাদনের ফলে, হৃদয়বিস্তার,—তৃতীয়ত প্রীতি, (মোহিতলাল বলেছিলেন—'সৌন্দর্য-সাধনার সোপানবিশেষে কবি যখন হইতে সৌন্দর্যের মধ্যে আর একটি বস্তু অনুভব করিলেন তখন হইতে তাঁহার কাব্যে, প্রীতি-কল্পনার লীলা আরম্ভ হইয়াছে, কেবল রূপ-পিপাসার emotion নয়, রূপাতিরিক্ত একটি সূক্ষ্ম অনুভাব তাঁহার কল্পনার সহিত জড়াইয়া গেল, সৌন্দর্যের মধ্যে মঙ্গলের উপলব্ধি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।'),—এবং পরিশেষে,—'ভক্তি-সাগর-সঙ্গমে কল্পনা-স্রোতস্বিনীর' স্তব্ধ সমর্পণ।

যুবতীর হাসি সম্পর্কে দেবেন সেনের একটি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে আছে—

> Your laughter is a song whose words are drowned in the tune, an odour of flowers unseen.
>
> It is like moonlight rushing through your lip's window when the midnight moon is high up in your heart.[৩৯]

ছ' মাসের শিশুকে মা তাঁর বুক থেকে নামিয়ে আর-একজনের কোলে তুলে দিতে এসেছেন, তাই দেখে সেই ব্যক্তি বলেছিলেন, ও তোমারই কোলে থাক্। ফলে মায়ের মুখে পড়েছিল মেঘের ছায়া,—চোখে দেখা দিয়েছিল 'জলে-বিজুলীতে ভরা' অভিমান। রবীন্দ্রনাথের কলমে এই কবিতার পরের অংশটুকুর অনুবাদ কী আশ্চর্যই না হয়ে উঠেছে—

When the rose-bud, nestling in its branch, smiles to the bent face of the morning, is there any cause for anger if I refuse to steal it from its cradle of leaves. ?

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবিভ্রাতা-সম্বোধনে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এবং তিনি তাঁর 'সোনার তরী' বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের নামে। আর, দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে তো বটেই, তা ছাড়া ছোটো-বড়ো-মাঝারি প্রায় সব সমকালীন কবির উদ্দেশেই তাঁর সানন্দ, সন্তুষ্ট স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরশমনি' পড়ে তিনি লিখেছিলেন—

প্রেমই পরশমণি জগত-ভিতর।
ত্রিলোচন দিগম্বর, গৌরীরূপ নিরন্তর,
নিরখিয়া এক দৃষ্টে, তবুও কাতর।
দারুণ অতৃপ্তি জ্বলে—গৌরীর চরণতলে,
নয়ন মুদিয়া তাই ভোলা মহেশ্বর।[১০]

রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার সুরে তিনি বেঁধেছিলেন 'রাধা'-র গান—

গভীর কালো নীরে, লুকায়ে দেহ
সভয়ে দরশন দেখে বা কেহ।
আজি গো—দ্বার দিয়া, ভিতরে চলি গিয়া,
হেরিব মাধবের রূপের গেহ।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'র ছাঁদে পত্রকাব্য রচনার নমুনা আছে 'অশোকগুচ্ছে'র 'উর্মিলা-কাব্য' কবিতাটিতে।

আবার 'ভুল', 'খোঁপা-খোলা', 'সোহাগিনী ইথে তোর এত

অভিমান', 'নিরলঙ্কারা', 'লক্ষ্মী-পূজা, 'অলক্ষ্মীপূজা', 'পিসিমার খাজা ও সীতাভোগ' ইত্যাদি কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে গার্হস্থ্য রসের দ্যুতি বিদ্যমান। কথ্যভাষার শব্দসম্পদ ছিল তাঁর কবিপ্রেরণার আজ্ঞাধীন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো ইংরেজি শব্দ ছেটাবার অভ্যাস ছিলো তাঁর। অবশ্য গম্ভীর প্রসঙ্গে নয়,—কৌতুকপ্রধান লেখার মধ্যেই সাধারণত এ লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 'বিংশ শতাব্দীর বর' থেকে এমনি একটু নমুনা দেখা যেতে পারে—

সহাস্যে ডাক্তার কন, এ মস্ত ব্যাপারে
নাহি মম হস্ত।
Your son-in-law is sound !
Can't guess why with ropes he is bound.

'মধুনিশি—জ্যোৎস্নালোক—লালে-লাল স্ফুটাশোক',—'প্রতি বক্ষে আশা-পরী হীরার অঙ্গুরী পরি',—'আমিও কুসুম, সখি, সারাটি যামিনী, সঞ্চিয়াছি তব লাগি রূপ ও সৌরভ',—'আন থালা ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়, এক রাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায়'—দেবেন্দ্রনাথের নানান্ কবিতার মধ্যে এমনি অনেক আনন্দকণিকা ছড়িয়ে আছে। জীবনের বিচিত্র সন্ধিতে কোথা থেকে সহসা প্রত্যাগত হয় সেইসব অনাহূত প্রিয়চেতনা,—সেই সব অনিমিত্ত আনন্দ !

'কলঙ্কিনী', 'বিধবা', 'প্রিয়তমা', 'গণিকা', 'রাক্ষসী', দ্রৌপদী' ইত্যাদি স্ত্রীজাতির বিচিত্র অভিব্যক্তির কথা আছে তাঁর অসংখ্য রচনায়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো আন্তর-উত্তাপহীন স্তবের ভঙ্গিতে নয়—এইসব লেখার অধিকাংশই যথার্থ আবেগের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়েছে।

অনেক কবিতা লিখেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। সে সব বিচার-বিশ্লেষণ করে কোনো কোনো সমালোচক দেখিয়েছেন তাঁর সমাসোক্তি

এবং সম্বোধনের বিশেষত্ব, কেউ বা দেখিয়েছেন তাঁর গার্হস্থ্য আবেদনের প্রাধান্য,—মাইকেলের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের ছায়া, এমন কি বিহারী-লালের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া! 'সনেটে' তাঁর বিশেষ রুচির কথাও বিশেষজ্ঞেরা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে খুবই ফুল ভালোবাসতেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর অনেকগুলি বইয়ের নামে। মল্লিকা-ফুলকে সম্বোধন করে তিনি লিখেছিলেন—

তোরি মত আমরাও কুসুমকামিনী!
জীবন, কুসুম; আর সংসার, যামিনী!

—দেবেন্দ্রনাথের বিষয়ে এইসব বিচিত্র কথা ভাবতে ভাবতে চেতনা সংহত হয় তাঁর আর একটি কবিতার অভিমুখে—

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,—
আধ গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে।
চারিধারে গুরুজন চল অন্তরালে;[৩১]

অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস'-এর চতুর্দশপদী পড়বার সময়ে এ-ছবির কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। 'গুরুজনদেব মাঝে' কবিতায় অজিত দত্ত লিখেছিলেন—

গুরুজনদের মাঝে কথা কহিবার অছিলায়
কহিলাম, 'এক গ্লাস জল দেবে? পেয়েছে পিপাসা।'
যারে কহিলাম, সে-ই বুঝিলো কেবল মোর ভাষা,
তবু তার গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠিলো লজ্জায়।

আর দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

আন থালা; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়,
একরাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায়?"

শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে!
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে,
কাঁদে যথা সুকবিতা, গুমরে গুমরে,
মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ-আঁধারে,
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে।
ছাদে চল ; মুক্ত বায়ু ; অদূরে তটিনী ;
দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী!

অনেক দিন পরে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—

প্রতিশ্রুত হাতুড়ি এলো
অন্ধকারে ছুটে,
বাড়ালো হৃৎপিণ্ড তার
চাঁদের মতো মুঠি।
আকাশ জুড়ে উঠলো সোর,
মেঘের ঘোর, জলের তোড় ;
মন্ত্র পড়া অন্তরাল
দিলো না তবু সাড়া।
অসম্ভব দ্রৌপদীর
অন্তহীন শাড়ি।[৩২]

দেবেন্দ্রনাথ অনেক ভালো সনেট লিখেছেন বটে,—কিন্তু আঁটসাঁট অতিমিত শিল্পবাহনের সাধ্যের সীমাটুকুই যে তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, সে কথার ইশারা আছে তাঁর ঐ পূর্ব উদ্ধৃতিতে। প্রমথ চৌধুরীর মতন 'এপিগ্রামে'র ঝোঁক নেই তাঁর সনেটে ; বরং মধুসূদনের মতো তাঁরও চতুর্দশপদীগুলি কিঞ্চিৎ ঢিলে ; তাঁর তুলনায় অক্ষয়কুমার বড়ালের সনেট আরো সংযত।

দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল বিচিত্রের প্রতি উন্মুখ। পায়ের

মলের শব্দ শুনে আড়াল থেকে তিনি প্রিয়তমার পদধ্বনি চিনতেন ('ডায়মনকাটা মল'),—জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিজ্ঞতার মধ্যে পেতেন অপরূপ বিশ্বস্রষ্টার সংকেত। কৃষ্ণ, খ্রীস্ট, গৌরাঙ্গের নামে তিনি মঙ্গলাখ্য কবিতা লিখে গেছেন। একটি সর্বপ্রিয় ভক্তের মন জেগে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যসাধনার দীর্ঘ, বিচিত্র, ধারাবাহিক নিরন্তরতার মধ্যে। হয়তো সেই সঙ্গে নবীন সেনের 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' প্রভৃতির কিছু প্রভাব ছিল। নবীন সেন বর্তমান শতকের প্রথম দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কথা ভাবতে বসলেই মনে জাগে সেই সব পুরোনো কথা। জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব,—এসব কথা তো অনেক কবিই বলেছেন, কিন্তু 'প্রেম বিনা ক্যা হোই'? কথাটি বলেছিলেন মধ্যযুগের অ-বাঙালী ভাবসাধক দাদূ।

দাদু পাতী প্রেমকী বিরলা বাঁচে কোই।
বেদ পুরাণ পুস্তক পড়ে প্রেম বিনা ক্যা হোই॥

—অর্থাৎ, বেদ-পুরাণ সবাই পড়ে, কিন্তু প্রেমের রহস্য কজনই বা বোঝে! প্রেম ছাড়া জীবনে অন্য সমারোহে কী-ই বা হয়?

বিশের শতকের 'ভারতী'-পর্বের কবিদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদারই ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ সরব ভক্ত। 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' নামে ছোটো একটি পদ্যরচনা নিয়ে তিনি বাংলা কবিতার আসরে প্রবেশ করেছিলেন, এবং পরে দেবেন্দ্রনাথের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে তিনি তাঁর শিষ্যকৃত্য পূর্ণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত এবং আরো কেউ কেউ দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর সহজ রীতি এবং আটপৌরে প্রসঙ্গের ভাবুকতাই পরবর্তী সমকালীনদের মনোহরণ করেছিল। তাঁর সনেট-চর্চারও প্রভাব অনুবাহিত হয়েছে।

ডক্টর সুকুমার সেন ঠিকই বলেছেন—বিহারীলালকে বলা চলে 'উদাসীন রোম্যান্টিক কবি'—'বহিঃসংসারের সহিত তাঁহার সংস্রবের ও সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ চিহ্ন নাই'। আর, দেবেন্দ্রনাথকে তিনি বলেছেন 'নব্য রোম্যান্টিক বা গার্হস্থ্য রোম্যান্টিক কবি।' নারী-প্রেমের বৈচিত্র্য ফুটেছিল দেবেন্দ্রনাথের কবিতায়। সুকুমার বাবু আরো জানিয়েছেন—'বিহারীলালের অধ্যাত্মদৃষ্টি ছিল বৈদান্তিক গোছের, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বৈষ্ণবীয়-ভক্তিরসিক। রচনা-শিল্পের প্রতি অমনোযোগিতা দুই কবিরই একটি সমান ধর্ম!'—এবং 'কথ্য-ভাষার শব্দের যোগানে সমসাময়িক কাব্যরীতির কাঠিন্য ভাঙ্গিয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথ কাব্যকলায় শক্তি সঞ্চার করিলেন'; —তাছাড়া, 'ইঁহার গীতি-কবিতায় মাইকেলের ক্লাসিক রীতির সঙ্গে বিহারীলালের রোম্যান্টিক রীতির মিলন হইয়াছে।'[৩৩] রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির নিদর্শন আছে 'পারিজাতগুচ্ছের' 'রবীন্দ্রবাবুর সনেট' কবিতার মধ্যে এবং তাঁর আরো বহু উক্তিতে, আচরণে, কবিতায়! তাঁর এই রবীন্দ্র-প্রীতির তাগিদেই তিনি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'মিঠে-কড়া'র জবাব লিখেছিলেন ১২৯৮ এর আষাঢ়ের 'সাহিত্য' পত্রিকায়। প্রয়োজন হলে ভাবতন্ময় শান্ত মানুষও তীব্র প্রত্যাঘাত করতে পারেন, দেবেন্দ্রনাথের সেই উত্তরের মধ্যেই সে কথার প্রমাণ আছে। কাব্যবিশারদ লিখেছিলেন—

না হয় না হবে মানে
রস চাই—কবিতার।
মিষ্টি হলে বেঁচে যাই
ভাবনা থাকে না আর।
মাঝেতে ইংরাজী কথা
(জানা আছে কত দূর)

চুকায়ে কবির সুখে
বঙ্গভাষা দর্প চূর…

গড়িব নূতন শব্দ
ব্যাকরণ go to hell
অই শুন ইংরাজী
ভারতী বা হয় fail

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'মনোসাধে'-কথাটি যে সংস্কৃত মতে সন্ধিবিভ্রমের দৃষ্টান্ত, 'মিঠে-কড়া'-র দ্বিতীয় কবিতায় সেই হাস্যকর পণ্ডিতীর নমুনাও আছে। তৃতীয় কবিতায় দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের 'পুলক নাচিছে গাছে গাছে' উক্তিটির কটাক্ষময় উল্লেখ! 'মানসী'র 'নিন্দুকের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কাব্যবিশারদের নাম না করেও সে অপ-সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন। আর, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোক্ত জবাবে লিখেছিলেন—

বায়স কহিল হর্ষে শোন পক্ষী সব
আম্রের মদিরা নিয়ে ওই যে ডাকিছে
উহু! উহু! শুনে ওর কুহু কুহু রব
আমার বায়স-প্রাণ ফাটিয়া যাইছে।[৩৪]

দেবেন্দ্রনাথের 'অপূর্ব-নৈবেদ্যে' এই ধরনের ঝাঁঝালো ব্যঙ্গের আরো দৃষ্টান্ত আছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক রচনাবলীর সমকালীন প্রসিদ্ধ একখানি কাব্যগ্রন্থ। উনিশের শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সে বইখানি ছাপা হয়েছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে সে কাব্যের রূপক-সমৃদ্ধির প্রশংসা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে কিংবা রবীন্দ্রযুগের অন্য কোনো কবি সে-কাব্যের

দ্বারা সত্যিই বিশেষ প্রভাবিত হন নি। অবশ্য 'শৈশব-সংগীতে'র দু'এক জায়গায় সে কাব্যের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করেছেন কোনো কোনো সমালোচক।

চল্লিশের দশকের শুরুতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। দশকের শেষে ১৮৪৯-এ জন্মেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' বেরিয়েছিল 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র অল্পকাল আগে। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক গাথাকাব্যগুলিতে ('বনফুল', 'কবিকাহিনী' ইত্যাদি) বোধ হয় 'উদাসিনী'র প্রভাব ছিল। সুকুমারবাবু বলেছেন—'অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, নবীনচন্দ্র সেন ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।'[৩৫]

অক্ষয় চৌধুরী ছিলেন দেবেন্দ্রের বর্ষীয়ান্ সমকালীন। স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসও ছিলেন প্রায় তাঁর সমবয়সী। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৬-তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৭-তে প্রসন্নময়ী এবং ১৮৫৮-তে গিরীন্দ্রমোহিনী জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মবৎসর ১৮৫৫। অক্ষয়কুমার বড়ালের ১৮৬০; বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ১৮৬১; দ্বিজেন্দ্রলাল, মানকুমারী এবং কায়কোবাদ, তিন জনেরই ১৮৬৩; কামিনী রায়ের ১৮৬৪। তারপর ১৮৬৫-তে জন্মগ্রহণ করেন রজনীকান্ত সেন। ১৮৬৮-তে জন্ম নিয়েছিলেন জগদিন্দ্রনাথ রায় এবং প্রমথ চৌধুরী। এঁদের সমবয়সী কবির সংখ্যা অল্প নয়।

বাংলা কাব্যপ্রবাহে রবীন্দ্রকালীন প্রথম রবীন্দ্রানুরাগী কবিদলের মধ্যে সর্বাধিক স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। তাই তাঁর কথা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবেই বলা গেল। বিরোধীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কথাও সেই কারণেই অনুরূপ বিস্তারিত ভাবে বলা

হয়েছে ; ১৮৫৫ থেকে ১৮৬১-র মধ্যে অন্যান্য যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বিষয়েও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ উপেক্ষিত হয়নি। তবে, মানকুমারীর বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবার নেই। কামিনী রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর কথা পরে বলা যাবে। গিরীন্দ্রমোহিনীর আগে অক্ষয়কুমার বড়ালের কথা আলোচ্য। দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ছেদ টানবার আগে এই একটি কথা বিশেষ-ভাবে স্বীকার্য যে, তাঁর মনে সত্যিই তেমন কোনো সংশয় ছিলোনা। কবিতার প্রসঙ্গ বা কলাবিধি বা কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্বকীয় ধারণাতে একনিষ্ঠ ব্রতী ছিলেন। রবীন্দ্রানুরাগী শক্তি-মানদের মধ্যে তিনিই এ-যুগের প্রথম সংশয়হীন স্মরণীয়। তাঁর কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে কথা ও সুরের অসামঞ্জস্য বা অসংগতির কথা উঠলেও তিনি যে স্পষ্টভাষী, আন্তরিক ক্ষমায় এবং স্পর্শকাতর মানুষ ছিলেন, সে কথা স্বীকার করতেই হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় চোরবাগানের এক সুবর্ণবণিক পরিবারে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। বিহারীলাল, অক্ষয় চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে 'রজনী'র মৃত্যুর নামে একটি দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়েছিল। সেইটিই বোধ হয় অক্ষয়কুমারের প্রথম ছাপা কবিতা। ১২৯০ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'প্রদীপ' ছাপা হবার পরে যথাক্রমে 'কনকাঞ্জলি' (১২৯২), 'ভুল' (১২৯৪), 'শঙ্খ' (১৩১৭) এবং 'এষা' (১৩১৯) ছাপা হয়। প্রথম বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে (১৩১৯) সুরেশচন্দ্র সমাজপতির লেখা ভূমিকা ছাপা হয় 'প্রস্তুতি' নামে। 'কনকাঞ্জলি'র তৃতীয় সংস্করণে (১৩২৫) ভূমিকা লিখেছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

'শঙ্খ' বইখানির 'অনুবন্ধ' লিখেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'এষা'র 'পরিচয়' লিখেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। এ-ছাড়া ওমর খৈয়মের আদর্শে 'পান্থ' নামে এক কাব্য লিখেছিলেন তিনি। মোহিতলালের ওমর খৈয়ম-প্রীতি হয়তো সেই সূত্রের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়। চণ্ডীদাসের জীবনকথা অবলম্বনে রচিত একটি অসমাপ্ত নাটকও আছে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। নিজের লেখা বারবার সংশোধন করবার অভ্যাস ছিল তাঁর।

তাঁর কবিতায় 'তৃপ্তির নরকে' অতৃপ্তি সম্বন্ধে যে খেদের কথা আছে, সেকথা স্মরণ করে সুরেশ সমাজপতি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দুঃখবাদের পার্থক্য দেখিয়ে বলেছিলেন যে, 'তিনি দুঃখদাবদগ্ধ হইয়াও আস্তিক, বিশ্বাসী; বিধাতার মঙ্গলবিধানে তাঁহার একান্ত নির্ভর।'

দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার, উভয়েই ছিলেন গার্হস্থ্য অভিজ্ঞতার কবি। এইখানে দুজনের কিছু সাদৃশ্য আছে। অক্ষয়কুমার তাঁর নানান্ কবিতায় যে নারীবন্দনার আকুতি ফুটিয়েছেন, তার মূলে ছিল পত্নীপ্রেম। 'প্রদীপের' 'নারী-বন্দনা'য় তিনি লিখেছিলেন—

রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা!
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে,
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা।

তাঁর পত্নীবিয়োগের কাব্য 'এষা'-র 'নিবেদন'-এ তিনি লিখেছিলেন—

নহে কল্পনার লীলা—স্বরগ নরক;
বাস্তব জগৎ এই, মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক;
মানবীর তরে কাঁদি—যাচি না দেবতা।

'মানবীর তরে কাঁদি'—এই অকৃত্রিম আধুনিকতার জন্যেই বোধ হয়, অক্ষয়কুমার সে-কালের বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ভাবসমারোহে অতি-আবিষ্ট পাঠক, সে-যুগে, কাছাকাছি স্থূলতর, রক্ত-মাংসের সুখ-দুঃখের পৃথক স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন মনে-মনে। একদিকে দ্বিজেন্দ্রলালের গম্ভীর ও কৌতুক-কবিতায়,—অন্য দিকে, দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমারের মধুর, করুণ গার্হস্থ্য কবিতায় রক্ত-মাংসের জীবন কিছু কিছু স্বীকৃত হয়েছে বৈ কি! বিপিনচন্দ্র পাল সে কথার ইঙ্গিত রেখে গেছেন তাঁর ভূমিকায়। তাঁর 'এষা'-তে 'কোন গভীর তত্ত্বদর্শিতার প্রমাণ-পরিচয় নাই' বলেই বিপিনচন্দ্র সেই তত্ত্বকণ্টকহীন শোক-সত্যের তারিফ করেছিলেন; আবার 'শঙ্খ' সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে স্মরণ করে গেছেন এই দুটি চরণ—

দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই।
বুঝেছি এ মরুভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তাই।

এবং এই উক্তিটি থেকে 'আমি', 'তুমি', 'ব্রহ্মানন্দ'—এই ত্রিতত্ত্বের বিশ্লেষণে এগিয়েছিলেন ব্যাখ্যাতা।

কেউ বলেছেন, অক্ষয়কুমার শেলীর মতন,—কেউ বা বলেছেন তিনি ব্রাউনিঙের ভক্ত। ব্রাউনিঙের প্রভাব আছে তাঁর 'প্রদীপ' কাব্যের কবিতা-বিন্যাসের রীতিতে;—মোহিতলাল তাঁর নানা কথার মধ্যে একটি কথায় জানিয়েছেন যে, আধুনিক কাব্যসাহিত্যে খাঁটি বাঙ্গালী-কল্পনার শেষ নিদর্শন হলো 'এষা'!

এসব কথা এ-আলোচনার শেষ কথা নয়। বিশেষত মোহিত-লালের এই শেষের কথাটি এ-কালের কবিতানুরাগী পাঠকের মনে নতুন ভাবনার খেই ধরিয়ে দেয়। হয়তো সত্যিই আমরা, একালের বাঙালী পাঠকরা এবং লেখকরা শুধুই 'জাতিভ্রষ্ট বাঙালী' (মোহিত-

লাল যেমন বলেছিলেন)। হয়তো সেই কারণেই আজ যেসব পুরোনো কবিতা আমাদের কানে কেবল সংবাদ হিসেবে প্রবেশ করে, আজ থেকে মাত্র তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও সেগুলিতে কবিতার বেগ ছিল, আবেগ ছিল! ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ-বুদ্ধির অনধিগম্য আশ্চর্য কোনো রকম আনন্দ ছিল, হয়তো!

পুরোনো কালের সংস্কার বিশ্বাস, ঐতিহ্য একদিকে, অন্য দিকে উনিশের শতকের ইংরেজি কাব্যের উগ্র আত্মকেন্দ্রিকতা,—অক্ষয়কুমার এই দুই আদর্শের দ্বন্দ্ব অনুভব করেছিলেন। এই হলো মোহিতলালের মন্তব্য। কিন্তু এ শুধু আংশিক পরিচয়। 'শঙ্খে'-র সীমানা অবধি মোহিতলাল এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করেছেন। তারপর 'এষা'-র উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন, 'আর আত্মদ্রোহ নাই…'!

এই আত্মদ্রোহহীন সারল্যের গুণেই 'এষা' সেকালের জনপ্রিয় কাব্য হয়েছিল। সেকালের 'সাধারণ পাঠক'রা বইখানি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চের নায়িকা নীরজা রোগশয্যায় ব্যাকুল হয়ে স্বামীকে বলেছিলেন, আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের 'এষা'।

'এষা'তেই অক্ষয়কুমারের নির্দ্বন্দ্ব নিঃসংশয় আন্তরিকতার পরাকাষ্ঠা চোখে পড়ে! 'এষা'র পরে রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' (১৯১৪) ছাপা হয়। স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষে লেখা বাংলা কাব্যগ্রন্থের প্রাচীনতর একটি নমুনার উল্লেখ করেছেন ডক্টর সুকুমার সেন। সে বইখানির নাম 'বিলাপসিন্ধু'—১৮৭৪-এ বিজয়কৃষ্ণ বসু সেখানি ছেপে বের করেছিলেন। পতিবিয়োগের পরে মানকুমারীর প্রথম বই 'প্রিয় প্রসঙ্গ' (গদ্য-পদ্য) বেরিয়েছিল ১৮৮৪-র ডিসেম্বরে। এই সূত্রে সে বইখানির কথাও উল্লেখ করা দরকার। তারপর গিরীন্দ্রমোহিনীর কথা।

পৃথিবী সত্য না স্বপ্ন? যাকে 'সত্য' বলে স্বীকার করা হয়, সে তো স্থায়ী,—সে তো শাশ্বত! যা মুহূর্তে দেখা দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, মানুষের মন তাকে স্বপ্নের মতো অস্থায়ী ভাবে পায়।

মানুষের মনে পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, গান সবই ক্ষণসৌন্দর্যের স্বাক্ষর রেখে যায়! কবিরা অন্তরের আনন্দে কাব্য লেখেন। নদী, আকাশ, ফুল, পাখি তাঁদের মনোলোকে সংকেতরূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। যা কিছু এসেছে, সব কিছুই শেষ হবে। সৃষ্টি চলেছে রূপ থেকে রূপান্তরের দিকে, অবস্থা থেকে অবস্থান্তরের দিকে। এই রূপজগৎকে তবু কোনো এক অমূল্যের সংকেত বলে মনে হয়। মাটির ফুলের দিকে চোখ রেখে রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়ে'র 'কবি' ভেবেছিলেন আর-এক দেশের আর-এক ফুলের কথা—

ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়।[৩৬]

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'ভগ্ন-হৃদয়' বইয়ের আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার আগে বাংলা ১২৮৭ সালের কার্তিক থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় সে কাব্য ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়েছিল। সে ঘটনার বছর সাতেক পরে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' ছাপা হয়। ১৮৮৭ সালে এই কবিতাসংগ্রহের প্রথম সংস্করণ বের হবার তারিখ থেকে ১৯০৪-এর মধ্যে মোট চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তার আগেই তাঁর 'কবিতাহার' (১৮৭৩) এবং 'ভারতকুসুম' (১৮৮২) ছাপা হয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তাঁর জন্মতারিখ। [১৩৩১ এর ৪ঠা ভাদ্র, বুধবার 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় গিরীন্দ্রমোহিনীর মৃত্যুসংবাদের মধ্যে ছাপা হয়েছিল—'১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট কলিকাতা ভবানীপুরস্থ মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়।'] পিতার নাম হারাণচন্দ্র মিত্র। পৈতৃক নিবাস পানিহাটি। হারাণচন্দ্র ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন।

বাড়িতে সাহিত্যের হাওয়া বইতো। কলকাতা বউবাজার অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবারের নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে মাত্র দশ বছর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়েছিল। নরেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাল ছিলনা। ১৮৮৪তে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামীর জীবৎকালেই তাঁর দুখানি কবিতার বই এবং গদ্যে পদ্যে লেখা পাঁচখানি পত্রসংকলন 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' বেরিয়েছিল। নরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, অক্ষয়কুমার বড়ালের সম্পাদনায় তাঁর চতুর্থ বই 'অশ্রুকণা' প্রকাশিত হলো। সে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে 'পরিশিষ্টে' কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর একটি কবিতা ছাপা হয়। তাতে পতিবিয়োগবিধুরা গিরীন্দ্রমোহিনীর উদ্দেশে সান্ত্বনা এবং প্রশংসার কথা ছিল্।

অশ্রুকণা'র পরে 'আভাষ' (১৮৯০)—তারপর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই' (১৮৯২),—অতঃপর 'শিখা' (১৮৯৬), 'অর্ঘ্য' (১৯০২), 'স্বদেশিনী' (১৯০৬), এবং 'সিন্ধু-গাথা' (১৯০৭) ছাপা হয়। সবগুলিই কবিতার বই। 'শিখা' প্রকাশ করেছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। 'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী এবং স্বর্ণকুমারী পরস্পরকে 'মিলন' বলে ডাকতেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার সমকালে ১৮৮৭ থেকে ১৯০৭, এই কুড়ি বছরের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে গিরীন্দ্রমোহিনীর নামটি অনেকেরই শ্রদ্ধা এবং প্রীতি আকর্ষণ করেছে। সাহিত্যিক-সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। 'অশ্রুকণা'র মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম যখন সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তখন তাঁর প্রধান কথা ছিল তাঁর দুঃখের অভিজ্ঞতা,—নরেশচন্দ্রের মৃত্যুতে তাঁর বিধবা পত্নী বড়োই কষ্ট পেয়েছিলেন। সেই দুঃখের ভাবনা মনে রেখে তিনি বলেছিলেন—

মাথা মোর ঘুরে গেল সারাদিন ভেবে ।
এ ধরা স্বপ্ন না সত্য ? কে মোরে বুঝিয়ে দেবে ?
সত্য যদি তবে সব কোথা যায় চলে,
ছায়া-বাজি-সম, ক্ষণ ছায়া-মায়া খেলে।

রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্ন-হৃদয়ের' 'কবি'কেও প্রায় অনুরূপ অবস্থায় পড়ে অনুরূপ খেদোক্তি প্রকাশ করতে শোনা গেছে। মুরলার মৃত্যু যখন আসন্ন, 'কবি' সেই লগ্নেই তাঁর শাশ্বত সত্যালোকের স্থায়িত্বের কথা ভেবেছিলেন—'ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়।'

১৮৮৭-তে 'অশ্রুকণা'য় দেখা গেল গিরীন্দ্রমোহিনীর অনুরূপ ভাবনা—

এ ধরা—স্বপ্ন না সত্য ? কে কবে নিশ্চয় ?
সত্য কভু একেবারে হয় কিরে লয় ?
আহা শুকাইবে ফুল, শুকাইবে তুমি।
মিলাইয়া যাব হায় এ সাধের আমি !

কবিতাটির নাম 'জগৎ'। পরবর্তী জীবনে গিরীন্দ্রমোহিনীর জগতের অন্য বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়নি। তাঁর ব্যাকুলতা প্রশমিত হয়েছিল ; কিন্তু পূর্বস্মৃতি যায়নি। ১৯০২-এর 'অর্ঘ্য' বইখানির 'জীবনসন্ধ্যায়' কবিতাটিতে তিনি বলেছিলেন—

গাহিতে প্রেমের গান, আর ত চাহে না প্রাণ,
হের ম্লান আলোকের ভাতি ;
দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা, ক্ষীণ বাসনার রেখা
নিশি শেষে নিভ'-নিভ' বাতি !

১৯০২ সালের এই কবিতার বইয়ে নরেশচন্দ্রের ব্যক্তিমূর্তি অবশ্য প্রায় বিলুপ্ত,—গিরীন্দ্রমোহিনীর নিজের যৌবনের তখন প্রায় শেষ সীমান্ত,—সুতরাং তখন নিজের সমস্ত স্মৃতি-বিস্মৃতির হিসেব চুকিয়ে

দিয়ে মৃত্যুকে স্বীকার করে নেবার প্রস্তুতি ঘটছিলো তাঁর মনে মনে। মন তারই মধ্যে বলে নিয়েছে,—

অপূর্ণ বাসনা যত   অস্ফুট মুকুল মত
ধূলায় রহিয়া গেল পড়ি !
জীবনের কত ব্রত,   অসম্পূর্ণ চিত্র মত
হেথা হোথা রল ছড়াছড়ি !

এ কবিতা যখন লেখা হয়, তখন তাঁর চুয়াল্লিশ বছর চলছে।

আঁখিযুগ দীপ্তিহীন   জীর্ণ তনু ক্রমে ক্ষীণ,
কৃষ্ণ কেশে শুক্লতা প্রবেশ ;
তেতাল্লিশ হয়েছে নিঃশেষ।

বিধবা তখন শিল্প-সাধনায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন। 'অর্ঘ্য' বইখানির 'চিত্রাঙ্কনে' কবিতায় তাঁর সেই শিল্পচর্চার পরিচয় আছে। তিনি বলেছিলেন—

রং আর তুলি নিয়ে কাটে সারা বেলা ;
গুরুজনে বলে —ওরে এ কি ছেলেখেলা !
চল্লিশ হয়েছে পার,   গিন্নি আখ্যা গৃহে যার,
গৃহধর্ম—কাজকর্ম সব অবহেলা,
দূর করে ফেল দেখি ছাই ভস্মগুলা।

চেনা সংসারের ছোটো ছোটো নানা কথার, নানা অভিজ্ঞতার সমাবেশ দেখা যায় গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায়। সেকালের সম্পন্ন বাঙালী সংসারের বিধবার চোখ দিয়ে দেখা একটি সীমাবদ্ধ জগতের পরিচয় নিহিত আছে তাঁর প্রত্যেকটি বইয়ের মধ্যে। 'অর্ঘ্য' বইখানির মধ্যেই 'ঘুঘু' বলে একটি কবিতা আছে। সে কবিতায় তিনি ঘুঘুর ইতিহাস লিখেছেন। ঘুঘুর ডাক যেন করুণ কোনো

কাহিনীর ইশারা। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিকল্পনা সেই ইশারা ধরে ঘুঘুর পুরো গল্পটি কবিতায় বেঁধে দিয়েছে—

তোমার ও শোক-গীতি অয়ি বিহঙ্গিনী—
ওর সাথে বিজড়িত করুণ কাহিনী!
আছিলে গৃহিণী পূর্বে গৃহস্থের ঘরে;
সুত-শাপে বিহঙ্গিণী ধরার উপরে!
শারদা পূজার তিথি হলে সমাগত
পূজোপকরণ এল ভারে ভারে কত;
কন্যা ও বধূরে দিলে বাছিবারে 'তিল'—
ভরিল কলঙ্কে তাহে সমগ্র নিখিল!
ঝেড়ে বেছে আনে দোঁহে হইয়া হরিষ—
মনে হল অল্প বলে বঁধূর জিনিস;
ক্রোধেতে জ্বলিয়া করি শিলার প্রহার
নাশিলে বালিকা বধূ আঘাতে তাহার!
কাঁদিয়া শাপিলা সুত ব্যথিত অন্তরে—
অমঙ্গলা পক্ষী হবে ভুবন ভিতরে।

কল্পনার স্নিগ্ধ উত্তাপ আছে গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায়। নতুন কালের নতুন চোখ দিয়ে বাস্তব জগৎকে দেখবার সামর্থ্য দেখিয়ে গেছেন তিনি। শুধু পুরোনো কালের অভ্যস্ত রীতির পুনরাবৃত্তি নয়,—তাঁর কবিতায় চারদিকের স্থূল জগৎকে দেখে নেবার সৎসাহস আছে। সেই সঙ্গে অবশ্য গ্রামের মুক্ত প্রকৃতির দিকে তাঁর বিশেষ মনোযোগের স্বীকৃতি আছে। তিনি বলেছিলেন,—

বদলাতে পারি সুর এস যদি কিছু দূর
ছাড়িয়া সুন্দরী রাজধানী

এলায়ে নিবিড় কেশে, প্রান্তরে গ্রামের শেষে
আসন পেতেছে বনরাণী!

কিন্তু সুর বদলাবার খেয়ালে কেবলই পুরোনো কবিপ্রসিদ্ধির দিকে তাঁর লোলুপতা ছিল না। নিজের পারিপার্শ্বিক স্থূল জগৎ সম্বন্ধে কোনো খুঁৎখুঁতে মনোভঙ্গিও ছিল না তাঁর। কবিতার পাত্রে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং জীবনের কঠোরতা-কমনীয়তা দুই-ই যথাসাধ্য ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর শিল্পীমনের সেই আত্মস্বীকৃতি ফুটেছে তাঁর শেষ কবিতার বই 'সিন্ধুগাথা'র একটি লেখার মধ্যে। সে কবিতাটির নাম 'চিত্রে'। কবিতার চর্চা থেকে ক্রমে তিনি ছবি আঁকবার উৎসাহে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। 'অর্ঘ্য' থেকেই সে পরিচয় পাওয়া গেছে। তারপর 'সিন্ধুগাথার' 'চিত্রে' কবিতাতে আবার শোনা গেছে—

ছন্দে বর্ণে যে মাধুরী পারি না ফুটাতে,
চিরপ্রিয় পল্লীদৃশ্য, জলাভূমি পথে,
তুলিকায় সে সুষমা, বর্ণসমাবেশে,
ফুটায়ে তুলিতে চাহি, দিবসের শেষে।
দূরে মিশে শ্যাম ক্ষেত্র আকাশের কোলে;
মৎস্যে ভরি' ক্ষুদ্র তরী বেয়ে যায় জেলে;
গুটায়ে বসন তুলি' পাছে ভেজে নীরে,
হাস্যমুখে জালুবধূ গৃহে যায় ফিরে—
সারা দিবসের লভ্য যত্নে বহি শিরে।
সহস্র চুম্বন রাঙ্গা আকাশের শিরে
রাখি অস্তমান রবি, ধীরে ডুবে নীরে।

জগৎকে তার যথাযথ রূপে ধরবার আগ্রহ দেখা গিয়েছিল গিরীন্দ্র-মোহিনীর এমনি দু'একটি লেখার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকার'

একটি কবিতায় জগৎ-চিত্র সম্বন্ধে প্রায় একই ধরনের কথা বল্‌তে চেয়েছিলেন। মনে পড়ে 'বলাকা'র সেই লাইনগুলি—

যে কথা বলিতে চাই—
বলা হয় নাই
সে কেবল এই
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই…।

মধুসূদনের আমল থেকে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' (১৮৯০) প্রকাশের সময় পর্যন্ত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের বাংলা কবিতার বিচিত্র সন্ধানের অনেক কথাই কতকটা দ্রুতভাবে এখানে বলে নেওয়া গেল। মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রণব রায়, অজিত দত্ত প্রভৃতি বিশের শতকের কবিরা প্রবীণতর দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গ-সান্নিধ্য সম্পূর্ণ এড়িয়ে থাকতে পারেন নি। সময়ের স্রোতে পাশাপাশি যেসব ঢেউ ওঠে, তারা পরস্পরকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এগিয়ে যায়। নবীন-প্রাচীনের সম্পর্ক অস্বীকার করা বাতুলতা। যুগে-যুগে সাহিত্যের বিশেষ-বিশেষ পর্বের আপাত-বিরোধী একাধিক ভঙ্গি, আদর্শ, রীতি ইত্যাদির মধ্যেও গভীরে সম্পৃক্ত এক রকম অন্যোন্য যোগ চোখে পড়ে। 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্র'-'প্রভাস'-এর কবি নবীন সেন এখন মধুসূদন-যুগের শিল্পী হিসেবেই পরিচিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবলগ্নে অক্ষয় চৌধুরীর বা বিহারীলালের কবিতায় যে ভাবোচ্ছ্বাস ঘটেছিল, তার সংক্রাম বা শুভপ্রভাব তিনিও পুরোপুরি এড়িয়ে থাকতে পারেন নি। তেমনি দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে বুদ্ধদেব বা অজিত দত্তের ভাব-ভঙ্গির কিঞ্চিৎ মিল খুঁজে পাওয়াটা আকস্মিক

কিছু নয়। গত শ'খানেক বছরের বাংলা কবিতার ধারা লক্ষ্য করতে বসলে আমাদের জাতীয় কবি-মানসের এই ক্রমগতি বা অন্যোন্য-সম্পর্কের সত্য চোখে পড়ে। বিশেষ পর্বে একদল যতো জোর গলাতেই নিজেদের একান্ত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করুন না কেন, ঐতিহাসিক তাতে কেবল কৌতুক বোধ করেন। আজকের দিনে বাংলা কবিতায় মৌখিক ভাষা ও সুরের যে নৈকট্য কামনা করা হচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর নিজের সময়ের সীমানার মধ্যে সেই একই বিষয়ে যথাসাধ্য অনুশীলন করে গেছেন; প্রমথ চৌধুরীর সমকালে বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেই 'বীরবলী' রীতির সূচনা দেখা গিয়েছিল। অথচ ইন্দ্রনাথকে লোকে বোধ হয় অন্যরকম ভাবে, এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কথা আজ কেউ বোধ হয় বিশেষ ভেবেও দেখেন না! জনখ্যাতি কবিদের কাম্য বটে, কিন্তু সে অনেকটা অদৃষ্টের মতন; কেন যে হয়,—কেন একজন প্রচারিত হন, ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্য পাঁচজনে কেন যে হননা, সে ব্যাপার সত্যিই রহস্য! লোকে কামিনী রায়ের কথা যতো জানে, গিরীন্দ্রমোহিনীর কথা সে তুলনায় খুবই কম জানে। এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে' বলার জন্যে 'দিনেশ দাস বিখ্যাত হলেন, অথচ, আমাদেরই শতকের প্রথম দিকে সতীশচন্দ্র রায় তাঁর 'ভগ্ন বাড়ির দেবতা' কবিতাটির মধ্যে এক জায়গায় রুক্ষ, কাঁকুরে মাটিতে ঘাস গজিয়ে ওঠার বর্ণনার মধ্যে যখন লিখেছিলেন—

> ইষ্টক যত কুঞ্চিত কালো
> কোথাও কঠিন তীক্ষ্ণ ছুঁচালো—
> শুধুই নীরস নীরস ঘাস,
> এর পরে জমিয়াছে বারোমাস
> শুষ্ক মুখের দাড়ির মতন।

—তখন 'শুষ্ক মুখের দাড়ির' সঙ্গে কাঁকুরে মাটির ঘাসের সাদৃশ্য-চিন্তার মৌলিকতা দেখে সত্যিই কোনো আন্দোলন হয়নি। 'আনন্দ-বাজার পত্রিকার' রবিবাসরীয় বিভাগের সাহিত্যপ্রাণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল এবং কবিবন্ধু শ্রীনীরেন্দ্র চক্রবর্তীর মুখে সতীশচন্দ্রের এই উক্তির প্রশংসা শুনে তাই তাঁদের মনোযোগের বৈশিষ্ট্যের কথা মনে হয়েছিল।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সজাগ ভাবটা এতোদিনে বাংলার সাধারণ পাঠকের কাছে আশা করা অন্যায় নয়। 'কবিতা', 'নিরুক্ত', 'একক' প্রভৃতি একালের বাংলা কবিতা-পত্রিকাগুলির উদ্যোগে কবিতার কলাকৌশলের পরীক্ষাদি ব্যাপারে আমাদের মনোভাবটা এখন অনেকটা সহনশীল হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দলা-দলির মনোভাবটা কাটেনি। সেটা সম্পূর্ণ কেটে যাওয়াও স্বাভাবিক নয়। এও মানা দরকার যে, সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যে সহানুভূতির ভূমিকাতে দিনেশ দাসের 'কাস্তে' বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ঝলসানো রুটি' এবং 'চাঁদের' প্রসঙ্গ জনপ্রিয় হয়েছিল, সেরকম কোনো ব্যাপক উত্তেজনার সঙ্গে জড়িত না হওয়া পর্যন্ত কবিদের কপালে জনখ্যাতি জুটবে না। তা না জুটুক্, তবু তাঁদের সত্যিকার কৃতিত্বের কথা জানতে হবে, বুঝতে হবে,—কবিদের সেকথা জানাতে হবে। তাঁরা উৎসাহ পেলে নিশ্চয় খুশি হবেন এবং অন্ধ অনুকরণ আর ধরতাই বুলি বা কায়দার বিষয়ে পাঠকের বীতরাগ ভাবটা তাঁরা সত্যিই যদি বুঝতে পারেন, তাহলে দেশের না হোক্, কাব্যামোদী দশের নিঃসন্দেহে উপকার হবে।

স্রষ্টার সংশয়ের নানা দিকের ধারণা প্রকাশ করতে গিয়ে এই অধ্যায়টি কিঞ্চিৎ শিথিল ও সম্প্রসারিত হয়ে পড়লো। মধুসূদনের অনুর্বরতা হেমচন্দ্রের নানাচারিতা, নবীনচন্দ্রের পারিপাট্যহীন

প্রগল্ভতা, বিহারীলালের তথাকথিত সারল্য ও ফেনস্ফীতি,—তারপর, রবীন্দ্রভক্ত প্রবীণদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের অকৃত্রিমতা সত্ত্বেও কোনো-কোনো জায়গায় ভুল সুরের উৎপাত (এ-বইয়ের ১০৫ থেকে ১১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁর এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের এই দোষের নমুনা দেওয়া হয়েছে), গিরীন্দ্রমোহিনীর মেয়েলি ভাবনার আন্তরিকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে দুটি প্রধান লক্ষণ দেখা যাচ্ছে: প্রথমত, কবিরা অংশত নিজেদের আন্তরিক সুখ-দুঃখ-আশা-নৈরাশ্যের কথা বলে থাকেন,—দ্বিতীয়ত তাঁরা যুগপ্রীতিকর বা সমকালীন রুচির অনুকূল কোনো-কোনো মর্জি, বিশ্বাস, কায়দা বা ঝোঁকের অনুকরণ করেন। রামায়ণ-মহাভারত বা পাশ্চাত্ত্য কোনো মহাকাব্যের প্রসঙ্গ অনুসরণ করে, কিংবা প্রকৃতির গুণগানের ঝোঁকে, কিংবা স্ত্রীর মৃত্যুতে, বা দেশপ্রেমের প্রথা ধরে, অথবা ঠাট্টা-বিদ্রূপের উৎসাহে কবিতা লেখবার এই রকম যুগলালিত মর্জি দেখা গেছে মধুসূদনেরও আগে থেকে শুরু করে আমাদের সময় অবধি। মহিলাকবিরা মহিলা-কবিদের অনুকরণ করেছেন, পুরুষকবিরা পুরুষকবিদের। দু'একজন মহিলা আবার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ক্ষেত্র থেকে প্রেরণা আহরণ করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বঙ্গের মহিলা কবি' বইখানির মধ্যে আদিকাল থেকে শুরু করে আধুনিক পর্ব অবধি বাঙালী মহিলা সাহিত্যিকদের যে পরিচয় সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে মহিলাদের কবিত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রমোহিনীর মধ্যেই মহিলা কবির সামান্য-স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। তাই তাঁর কথা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। উনিশের শতকের মাঝামাঝি সময়ে কৃষ্ণকামিনী দাসীর কবিতার বই 'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৫৬) ছাপা হয়। তাতে 'পুরুষ' ও 'কামিনীর' কথোপকথনের ভঙ্গিতে যথাক্রমে 'ধর্ম' ও 'দয়া'র অন্যোন্য-আশ্রয়ের

কথা বলা হয়েছিল এবং কৃষ্ণকামিনীর ভঙ্গিটি মোটেই দুর্বল ছিলনা। ১৮৭৭-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন প্রথম 'ভারতী' পত্রিকা বের করেন, তখন থেকেই স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে ছিলেন, এবং মোট দু'দফায় ১২৯১ থেকে ১৩০১ অবধি এবং ১৩১৫ থেকে ১৩২১ পর্যন্ত তিনি 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। ১২৮৭ সালে তাঁর 'গাথা' বেরিয়েছিল, ১৩০২-এ 'কবিতা ও গান'; ১৩১২ সালে, অর্থাৎ ইংরেজি হিসেবে ১৯০৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 'দেবকৌতুক' নামে তাঁর 'কাব্যনাট্য' প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারীর 'গাথা'র বছর দশেক আগে প্রসন্নময়ী দেবীর (১৮৫৭-১৯৩৯) প্রথম কবিতার বই 'আধ-আধ ভাষিণী' (১৮৭০) বেরিয়েছিল; তারপর 'বনলতা' প্রভৃতি অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ছাপা হয়। অতঃপর মহিলাকবিদের মধ্যে মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) এবং কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রসন্নময়ী যখন 'আধ-আধ ভাষিণী' লেখেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বারো বছর, তারুণ্যের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে বরং নলিনীবালা দাসীর কতকটা তুলনা চলতে পারে। নলিনীবালা ১২৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করে মাত্র ষোলবছর বয়সে ১৩০৪-এ মারা গিয়েছিলেন। কামিনী রায়ের প্রথম কবিতার বই 'আলো ও ছায়া' ছাপা হয় আরো বেশি বয়সে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে; তখন তাঁর পঁচিশ বছর বয়স। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতা মহিলা; স্বর্ণকুমারীর মতন তিনিও স্বদেশপ্রেমের অনেক কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর 'পৌরাণিকী', (১৮৯৭), 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩) 'অম্বা' (১৯১৫)—প্রথম বই 'আলো ও ছায়া'র সঙ্গে এই তিনখানিও উনিশের শতকের শেষ দিকের রচনা; তাঁর ছোটোদের কবিতাসংগ্রহ 'গুঞ্জন' (১৯০৫) এবং সনেটসংগ্রহ 'অশোক-সংগীত' (১৯১৪) এবং 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯) আমাদের শতকের রচনা। কামিনী রায়ের

রবীন্দ্র-প্রীতির কথাও যেমন সত্য, তাঁর হেমচন্দ্রের প্রতি ভক্তিও তেমনি সত্য। অকৃত্রিম বঙ্গ-মহিলার মনোভাবনাই তাঁর কবিতাবলীর একমাত্র আবেদন নয়। সেদিকে গিরীন্দ্রমোহিনীই সর্বাধিক স্মরণীয়। 'আলো ও ছায়ার' ভূমিকা লিখেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের আগে জনপ্রিয়তার দিক থেকে হেমচন্দ্রই ছিলেন প্রধানতম কবি; মধুসূদন বা বিহারীলাল কোনোদিনই জনপ্রিয় ছিলেন না। কামিনী রায় একদিকে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের সময়ের কাব্যসংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের নতুন ভাবসাধনার প্রভাবও অস্বীকার করতে পারেননি। মোহিতলাল তাই তাঁকে রঙ্গলালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রঙ্গলাল যেমন আঠারোর শতকের ভারতচন্দ্রের ধারা আর উনিশের শতকের মধুসূদনের নবযুগের মধ্যবর্তী যোজক, তেমনি মহিলা হলেও কামিনী রায় ঠিক নিভৃত মহিলা-মহলেই অন্তরীণ ছিলেন না, তিনিও সংশয়ে ভুগেছেন। উনিশের শতকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথের পরিণতির যুগে কবিতার যে ধারা-বদল ঘটেছিল, মোহিতলাল তার লক্ষণগুলি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

> পরিবর্তন যুগের কবিতার দুইটি লক্ষণ প্রধান; (১) ভাষা ও ভাব দুইই বাহুল্যপূর্ণ ও উচ্ছ্বাসময়; (২) জাতি ও সমাজের সঙ্গে কবিগণের সমপ্রাণতা; সমাজেরই মুখপত্রস্বরূপ তাঁহারা উচ্চ কল্পনা ও উন্নত আদর্শের চর্চা করেন।[৩৭]

কামিনী রায়ের লেখাতে এই দুই লক্ষণই প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু নতুন কালের আত্মভাবনাময় উচ্ছ্বাসের মধ্যে কল্পনার যে নভোগামী বেগ ও বল দেখা গিয়েছিল, কামিনী রায় ঠিক ততোটা কল্পনাময়ী ছিলেন না। মোহিতলাল তাই ঠিকই বলেছেন—'তাঁহার কবিমানস একদিকে যেমন পরিবর্তন-যুগের অগ্রগামী, তেমনই অপর দিকে, তাঁহার কল্পনার প্রসার অল্প, ভাষায় ও ছন্দে আধুনিক

গীতি-কবিতার গভীর আকুতি বা অপূর্ব ধ্বনি-ঝঙ্কার মধ্যবর্তী বলিয়া নির্দেশ করাই সঙ্গত।'[৩৮]

এই সিদ্ধান্তই আরো এক ভাবে দেখা যেতে পারে। এ অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, 'সংশয়' শব্দের মানে হলো দ্বৈধজ্ঞান বা সন্দেহ। কামিনী রায় এবং তাঁর সমধর্মী সেকালের অন্যান্য কবিরা একরকম দ্বৈধজ্ঞানে নির্ভর করেই কাব্যচর্চা করে গেছেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন 'আলো ও ছায়া'র 'পান্থ যুগল' এবং 'মাল্য ও নির্মাল্যে'র 'নিরুপায়' থেকে দৃষ্টান্ত তুলে বলেছেন —'দৈব-হত অথবা প্রিয় বিড়ম্বিত নারীপ্রেমের সশঙ্ক কুণ্ঠা এবং আত্মলোপী ব্যক্তিনিরপেক্ষ নিঃস্বার্থতা ইঁহার কাব্যের বিশিষ্ট সুর';[৩৯] কিন্তু সে রকম কুণ্ঠা ও নিঃস্বার্থতার সুর একা কামিনী রায় কেন, সতেরো বছর বয়সে বিধবা হয়ে মানকুমারীও তাঁর 'প্রিয় প্রসঙ্গ' বইখানির মধ্যে পরিবেষণ করে গেছেন। তাঁর এবং অন্যান্য মহিলাকবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও সে সুর শোনা যাবে। কামিনী রায়ের মতন মানকুমারীও ইংরেজি, সংস্কৃত দুই-ই পড়েছিলেন এবং উভয়ের রচনাতেই সেসব বিদ্যার প্রভাব আছে। তাঁরা দুজনেই জাতীয়তা বা দেশপ্রেমমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক, পৌরাণিক, সামাজিক, এবং শিশুবিষয়ক কবিতা লিখে গেছেন। 'মানকুমারীর 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৬) কামিনী রায়ের কবিতাবলীর তুলনায় মোটেই নিষ্প্রভ নয়। রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যে সংখ্যাতীত যেসব কবি কবিতা লিখে গেছেন, তাঁরাও সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত, এবং তাঁদের স্বাতন্ত্র্য সত্যিই তুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যাঁদের ওপর আরো বেশি পরিমাণে পড়েছিল, সেইসব মহিলাকবিদের মধ্যে প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), প্রমীলা নাগ (১৮৭১—১৮৯৬), হেমলতা ঠাকুর (জন্ম ১৮৭৩), সরলা বালা সরকার (জন্ম ১৮৭৫), সরোজকুমারী

দেবী (১৮৭৫-১৯২৬), লজ্জাবতী বসু (১৮৮২?-১৯৪২), মৃণালিনী সেন (জন্ম ১৮৭৯), পঙ্কজিনী বসু (১৮৮৪-১৯০০) প্রভৃতির নাম করা চলে। 'কিশলয়'-এর কবি লীলা দেবী (১৮৯৪-১৯৪৩), 'ধূপ' ও 'গোধূলির' কবি নিরুপমা দেবী (জন্ম ১৮৯৫), 'ঘুমের আগে' এবং 'বাতায়ন'-এর কবি উমাদেবী (১৯০৪-১৯৩১), বহু কাব্যের কবি রাধারাণী দেবী (ছদ্মনাম অপরাজিতা দেবী, জন্ম-১৯০৪) ইত্যাদি পরবর্তিনীরা রবীন্দ্র-প্রভাব বিস্তারের পরিণততর পর্বে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

পুরুষকবির সঙ্গে মহিলাকবির মননগত এবং কল্পনাগত পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো পক্ষই অনুকরণ-স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। মধুসূদন-হেমচন্দ্রের যুগে পুরুষকবিরাও যেমন খ্যাতিমানদের অনুকরণ করেছেন, মহিলাকবিরাও তেমনি করেছেন। মানকুমারীর 'বীরকুমারবধ'ই (১৩১০) সে বিষয়ে একমাত্র নমুনা নয়।[৪০] আবার, কতকটা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সমগোত্র সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৭-১৮৭৮) রবীন্দ্র-প্রভাবের পূর্বগামী হলেও অন্তত কিছু পরিমাণে বিহারীলালের প্রভাব আত্মসাৎ করেছিলেন। সে সময়ে কবিতায় কাহিনীর বিশেষ দাম ছিল। রবীন্দ্রনাথের যুগে কাহিনীর দাম ঠিকই রইলো, কিন্তু কবিতা কেবলই যে নীতিপ্রচার বা গল্পবর্ণনা বা প্রকৃতির সৌন্দর্যচিত্র নয়,—কবিতা যে কবির আপন মনের মাধুরীর প্রক্ষেপ, সেই আদর্শই বিশেষভাবে উৎসাহিত হলো। কবিতায় প্রধানত নীতি, রূপক এবং আখ্যায়িকার চর্চা করলেও, এবং বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'র ধাঁচে 'মহিলা'র (প্রথম প্রকাশ ১৮৮০ ; পরে ১৩০৩-এ দুই অংশ একত্র প্রকাশিত হয়) কবিতাগুলি লিখলেও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে 'সবিতা সুদর্শনে'র মধ্যে কিছু রোম্যান্টিক ভাবাবেশও দেখিয়ে গেছেন।

রঙ্গলালের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়পর্ব অবধি সব কবির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে উনিশের শতকের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় সব কবিরই প্রধান-প্রধান প্রবণতার কথা এখানে বলা হলো। যুগের পরিবেশ আর নিজের আত্মস্থতা, এই দু'য়ের মধ্যে টানাটানি চল্‌ছেই। স্ত্রী-পুরুষ, ছোটো-বড়ো, খ্যাতিমান ও অখ্যাত নির্বিশেষে সকল কবির মধ্যেই সেই দ্বিধাবোধ বা সংশয় বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের আগে এবং তাঁর সমকালে যেমন,—তাঁর মহাপ্রয়াণের পরেও তেমনি সে লক্ষণ আজও বিদ্যমান। বাংলা কবিতার 'রবীন্দ্র-যুগে' প্রবেশ করবার আগে আমাদের প্রায় এক শতাব্দীর কাব্যধারাটি এখানে সংক্ষেপে দেখে নেওয়া গেল। এর পর খুবই সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে প্রকাশিত একখানি কাব্য-সংকলনের পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ, তা থেকে সেকালের কবিতা-পাঠকের মর্জিটা কতকটা অনুমান করা যাবে।

১। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঁচু ঠাকুর' [পঞ্চম কাণ্ড, পঞ্চমপরিচ্ছেদ]।
২। দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল'-এর পৃঃ ৫৬৬-৫৬৭ দ্রষ্টব্য।
৩। মোহিতলালের 'সাহিত্য-বিতান'-এর [পৃঃ ৯১] 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়'।
৪। 'পদচারণ'-এর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' কবিতা থেকে।
৫। 'নতুন খাতা'-র 'উকিলের কবুলতি' থেকে।
৬। ঐ, 'আবদারের আধঘণ্টা' দ্রষ্টব্য।
৭। পৃঃ ১৮৩-১৮৪-তে রবীন্দ্র-বিরোধিতা সম্বন্ধে সেকালের যে মনোভাবের কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' বইখানি দেখা দরকার।
৮। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'-র 'দুরন্ত আশা' [রচনাকাল-১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮] থেকে।

৯। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা'-র 'চপলা' থেকে।

১০। জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক'-এর 'বনের চাতক—মনের চাতক' থেকে।

১১। ঐ, 'সাগর-বলাকা' দ্রষ্টব্য।

১২। 'কবিতা'-য় [আশ্বিন, ১৩৬১] প্রকাশিত 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' থেকে।

১৩। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' দ্রষ্টব্য।

১৪। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরুশিখা'র 'দুঃখবাদী' থেকে।

১৫। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উৎকৃষ্ট-কাব্যম্'-র 'প্রথম উদ্গার' দ্রষ্টব্য।

১৬। ঐ, 'দ্বিতীয় উদ্গার'।

১৭। 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'।

১৮। 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' থেকে।

১৯। 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে।

২০। মাইকেল মধুসূদন (জীবন-ভাষ্য): প্রমথনাথ বিশী [আশ্বিন, ১৩৪৮] পৃঃ ১০৮ দ্রষ্টব্য।

২১। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'—'সরস্বতী' দ্রষ্টব্য।

২২। হেমচন্দ্রের এই সমালোচনা।

২৩। হেমচন্দ্রের কবিতাবলী—'হায় কি হলো ?'

২৪। হেমচন্দ্রের কবিতাবলী—রহস্য-বিষয়, 'বিশ্ব-বিদ্যালয়ে' দ্রষ্টব্য।

২৫। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' [২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ] পৃঃ ৩৩৮।

২৬। 'গোলাপগুচ্ছ' বইখানির 'চিরযৌবনা' থেকে। এই উদ্ধৃতির ষষ্ঠ চরণের শেষাংশের বন্ধনী বাদ পড়েছে; 'ক্রোটনের পাতা কাঁপে ও (হায় তার কে করে আদর ?)' পড়তে হবে।

২৭। মোহিতলাল মজুমদারের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' [১৯৩৬] গ্রন্থের 'দেবেন্দ্রনাথ সেন' দ্রষ্টব্য [রচনাকাল—পৌষ, ১৩৩০]।

২৮। ঐ, পৃঃ ১৯১ দ্রষ্টব্য।

২৯। (পৃঃ ২১৩ ; মুদ্রাকরপ্রমাদ বশতঃ ৩৯ ছাপা হয়েছে) 'যুবতীর হাসি' (অশোকগুচ্ছ)—দেবেন্দ্রনাথ সেন।

৩০। 'পরশমণি' (ঐ)—দেবেন্দ্রনাথ সেন।

৩১। 'অশোকগুচ্ছ' বইখানির 'প্রিয়তমার প্রতি' থেকে।

৩২। 'দ্রৌপদীর শাড়ি'—বুদ্ধদেব বসু।

৩৩। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ) পৃঃ ৪০৩।

৩৪। 'যাত্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত (বৈশাখ, ১৩৬৪) শ্রীসুকুমার সেনের রাহুর দ্বেষ' দ্রষ্টব্য।

৩৫। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ঐ, পৃঃ ৩৩৮।

৩৬। 'ভগ্নহৃদয়' দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের-২২৫-এর পৃষ্ঠায় যেখানে মানকুমারীর 'প্রিয়প্রসঙ্গ' বইখানির উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর 'বনবাসিনীর' কথাও স্মরণীয়। গোবিন্দচন্দ্র দাসের (১৮৫৫—১৯১৮) 'কুঙ্কুম'ও 'পত্নীশোচক' কাব্য (সুকুমার বাবু 'পত্নীশোচক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন)। এছাড়া আরো দৃষ্টান্ত আছে।

৩৭। মোহিতলাল সম্পাদিত 'কাব্যমঞ্জুষা' দ্রষ্টব্য।

৩৮। ঐ

৩৯। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

৪০। ১৮৮০ তে অক্ষয়কুমার দের 'মেঘনাদবধ নাটক' বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল ; ১৩০০ সালে হরগোবিন্দ লস্করের 'দশাননবধ' ছাপা হয় ; ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণে কায়কোবাদের 'মহাশ্মশানে'র প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়। কায়কোবাদ (মোহাম্মদ কাজেম আল্‌কোরাশী) মধুসূদনের পরে নবীনচন্দ্রের মধ্যেই অমিত্রাক্ষরের ওজস্বিতা লক্ষ্য করেছিলেন ! (১৯১৭-র সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রযুগ-সূচনার একখানি কবিতা-সংকলন

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' কলকাতার 'দি নিউ সন্‌সক্রিট্ প্রেস্' থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়েছিল। 'বিজ্ঞাপন' অংশে লেখক জানিয়েছিলেন—'কবিচরিত প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীরাম দাস, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সাতজনের জীবনবৃত্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, এই গ্রন্থমধ্যে তাহা সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইল। উপক্রমণিকায় বাঙ্গালা কবিতার আমূল আলোচনা করা গিয়াছে।' তখন মধুসূদনের বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তির কাল, তবু হরিমোহন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরে এগিয়ে যেতে উদ্যোগী হননি। নতুনের প্রতি সব যুগেই এরকম অল্পবিস্তর কুণ্ঠা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে 'কবিতা রচনারম্ভ' নামে যে অধ্যায়টিতে তাঁর কাব্য রচনার প্রথম প্রয়াসকালের কথা বলা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশই তাঁকে প্রথম 'পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতি পদ্ধতি' বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। জ্যোতিঃপ্রকাশ তখন ইংরেজি কাব্যক্ষেত্রে নতুন প্রবেশ করেছেন, কবিত্বশক্তির নবাবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথও নবোদ্গতশৃঙ্গ হরিণশিশুর মতন তখন 'যেখানে সেখানে গুঁতা' দিতেই উৎসাহী!

'কবিচরিত'-এর পরে ১ নম্বর কৃষ্ণদাস পাল লেনের হিতৈষী যন্ত্রে 'কলিকাতা নর্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম্, এ, সঙ্কলিত' 'বাঙ্গালা সাহিত্য-সংগ্রহ' ছাপা হয়েছিল ১২৭৯ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ৫ই নভেম্বর ১৮৭২ (বাংলা ২১এ কার্তিক, ১২৭৯) তারিখের স্বাক্ষর সংবলিত পর-পর

ইংরেজি এবং বাংলা ভূমিকা (ইংরেজিতে 'Preface' এবং বাংলাতে 'বিজ্ঞাপন') থেকে, এবং বিশেষত ইংরেজি ভূমিকা থেকেই জানা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক উদাহরণ সংগ্রহের সেইটিই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা।[১]

বইখানি যাতে ইস্কুলের পাঠ্য হিসেবে উপযোগী হয়, সেদিকে নজর রেখে সংকলনের দায়িত্ব পালন করা হয়েছিল। প্রথম ভাগে পদ্যরচনা এবং দ্বিতীয় ভাগে গদ্যরচনা প্রকাশের আয়োজন ছিল; তাছাড়া বইয়ের প্রথমেই 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' নামে খুবই সংক্ষিপ্ত (মাত্র ৭ পৃষ্ঠার) একটি প্রবন্ধ ছিল। সে প্রবন্ধে মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন আর্যবসতির প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে এশিয়া এবং য়ুরোপে আর্যভাষার বিস্তার এবং ভারতে প্রাচীন বৈদিক থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাবৈচিত্র্যের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছিল। বিদ্যাপতিকে তখনো বাঙালী বলেই ধরা হতো। ভূমিকাতে তো বটেই, তা ছাড়া ঐ 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' প্রবন্ধটির পরেই (অষ্টম পৃষ্ঠায়) 'পদকর্ত্তাগণ' শিরোনামে, অল্প কয়েক লাইনের মধ্যে সম্পাদক জানিয়েছিলেন—'কেহ কেহ বলেন, লাউসেনকৃত মনসার গান বঙ্গভাষার আদি রচনা···। বিদ্যাপতি বিরচিত পদাবলী অপেক্ষা প্রাচীন রচনা এ পর্য্যন্ত আমাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। এই নিমিত্ত ইঁহাকেই আমরা বঙ্গকবিকুলের আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করি।' অতঃপর, পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর শিবসিংহের রাজধানীতে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে বিদ্যাপতি নানাবিধ সুমধুর পদাবলী রচনা করেন,—এই খবরটি প্রকাশ করে, কতকগুলি পদাবলীর নমুনা দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যাপতির মোট ন'টি পদ উদ্ধৃত করে অতঃপর বিদ্যাপতির সমকালীন নান্নুরের (বীরভূম) অধিবাসী চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছিল; চণ্ডীদাসের 'বাশুলি'-প্রসাদ লাভের (বিশালাক্ষী) কিংবদন্তীমূলক

একটি আষাঢ়ে গল্পও বলা হয়েছিল। গল্পটি সম্পাদকের নিজের কথাতেই কথিত হোক—'বিদ্যাপতির সমকালেই চণ্ডীদাস নামক আর একজন কবি শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস বিষয়ক বহুতর পদাবলী রচনা করেন। তিনি বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী নান্নুর গ্রাম নিবাসী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রথমে অতিশয় মূর্খ ছিলেন এবং দিবানিশি কেবল তামাক সেবন করিতেন। এক দিবস রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া তামাক খাবেন মনে করিলেন, কিন্তু কোথাও অগ্নি না পাইয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরে অগ্নির অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে গ্রামের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন মাঠের মধ্যে নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী "বাশুলি" বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরের নিকট অগ্নি জলিতেছে। তখন তিনি অগ্নিলাভের প্রত্যাশায় দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন; কিন্তু তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন তিনি যাহা অগ্নি মনে করিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহা অগ্নি নহে, দেবীর অঙ্গজ্যোতি অগ্নিরূপে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। তখন তিনি ভীতিসমন্বিত ভক্তির রসাভিসিক্ত হৃদয়ে দেবীরে প্রণাম করিলেন, দেবীও প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিয়া বলিলেন তোমারে আমি দুর্লভ কবিত্বশক্তি প্রদান করিলাম, তুমি আমার প্রভুর ব্রজলীলা বর্ণন কর! চণ্ডীদাস এইরূপে কবিশক্তি লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।'

চণ্ডীদাসের মোট বাইশটি পদ ছেপেছিলেন সম্পাদক। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পরে চৈতন্য-পরবর্তী পদকর্তাদের মধ্যে রায়শেখর, বাসু ঘোষ, নরহরি দাস, যদুনন্দন, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের নাম করা হয়েছিল এবং তাঁদের পদাবলী থেকে কিছু কিছু উদাহরণও ছাপা হয়েছিল। তারপর, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে

বাংলা ভাষার উন্নতির কথাসূত্রে তিনি জানিয়েছিলেন—'বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে রূপগোস্বামিকৃত রিপুদমন বিষয়ের রাগময়কোণ, সনাতন গোস্বামী প্রণীত রসময়কলিকা, জীবগোস্বামিরচিত কড়চাই, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, লোচনকৃত চৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমধিক প্রসিদ্ধ।' ৮ থেকে ৩১-এর মধ্যে মোট ২২ পৃষ্ঠায় বৈষ্ণব সাহিত্যের নমুনা দিয়ে ৩২-এর পৃষ্ঠায় কৃত্তিবাসের কথা শুরু হয়েছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারিগণ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত' কৃত্তিবাসী রামায়ণে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের অনেক কারুকার্যের ফলে আসল কৃত্তিবাসের সঙ্গে অনেক ভেজাল মিশে গিয়েছিল। সংক্ষেপে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বইয়ের ৭২-এর পৃষ্ঠা অবধি রামায়ণের উদ্ধৃতি ছেপেছিলেন মহেন্দ্রনাথ। তারপর যথাক্রমে দামুন্যার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কথাসূত্রে, বর্ধমানের শাসক মামুদ শরীপের অত্যাচারে মুকুন্দরামের দামুন্যাত্যাগ ও আরড়াগ্রামনিবাসী বাঁকুড়ার পূর্বাধিকারী রাজা রঘুনাথের আনুকূল্য লাভের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে মুকুন্দরামের অসামান্য কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—'ফলতঃ তাঁহার সদৃশ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কবি বঙ্গদেশে আর কখন জন্মগ্রহণ করে নাই। ব্যাধনন্দন ও সদাগরের উপাখ্যান তাঁহারই মানসসম্ভূত; তাঁহার পূর্বে কি সংস্কৃত কি বাঙ্গলা কোন কবিই কালকেতু এবং ধনপতি ও শ্রীমন্তের উপাখ্যানের অনুরূপ কিছুই বর্ণনা করেন নাই। কালীদহে কমলবাসিনী কামিনী কর্তৃক করিগ্রাস ও উদ্গীরণ ব্যাপার বর্ণনা করিয়া চক্রবর্তীকবি কবিকল্পনার একশেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।…ফুল্লরার বারমাস্যা, খুল্লনার ছাগচারণ ধনপতির কারামোচন-কালের আক্ষেপোক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। স্বভাব বর্ণনা ও সামাজিক

আচার ব্যবহার বর্ণনা বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।... তৎপ্রণীত আদিরসঘটিত বিষয়গুলিও অতি চমৎকার ও মনোহর এবং অশ্লীল শব্দশূন্য হওয়াতে অতিশয় প্রশংসনীয়।'

মহেন্দ্রনাথের রসবোধ ছিল। বস্তুত মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'ই যে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য, সে বিষয়ে আধুনিক বিদ্বজ্জনেরও মতানৈক্য নেই। ৯৬-এর পৃষ্ঠা অবধি মুকুন্দরামের রচনার নমুনা দিয়ে ৯৭-এর পৃষ্ঠায় কাশীরাম দাসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। কাশীরামের কবিত্বের কথাসূত্রে গ্রন্থসম্পাদক লিখেছিলেন—'রামায়ণ ও চণ্ডীর অপেক্ষা মহাভারতের রচনাপ্রণালী যে উৎকৃষ্ট ইহা সকলেই স্বীকার করেন।...কাশীরাম দাস কবিত্বগুণে কবিকঙ্কণের তুল্য ছিলেন না বটে, কিন্তু যে মহাত্মা সুললিত ভাষায় ও নানাবিধ সুমধুর ছন্দে অমৃতসমান মহাভারত রচনা করিয়াছেন তিনি যে অসামান্য কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি?'

কাশীরাম প্রসঙ্গের পরে ১২১-এর পৃষ্ঠায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে রামপ্রসাদের ব্যক্তি-পরিচয়ের সূত্রে বলা হয়েছিল যে, 'রামপ্রসাদ বামাচারী ছিলেন এবং উপাসনার অঙ্গ বিবেচনায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপান করিতেন। অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞা করিত কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইতেন না।' রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—'কবিরঞ্জন প্রণীত বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গলা ভাষায় একখানি প্রধান কাব্য। ইহাতে তোটক প্রভৃতি নানাবিধ নূতন ছন্দ সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার রচনা স্থানে স্থানে কর্কশ ও জটিল বলিয়া বোধ হয়। এই কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরকেই আদর্শ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।'

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন এবং শ্যামাসংগীত থেকে

উদাহরণ তুলে ১৩৩-এর পৃষ্ঠায় ভারতচন্দ্র-প্রসঙ্গ শুরু হয়েছিল। ১৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সে প্রসঙ্গের বিস্তার দেখে মহেন্দ্রনাথের প্রশংসাই করতে হয়। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু জনমতের কতকটা বিরুদ্ধে হলেও তিনি তাঁর নিজের কথা জানাতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর সে মন্তব্য নিচে তুলে দেওয়া হলো—

> অনেকেই বলেন ভারতচন্দ্র বঙ্গভাষায় সর্বপ্রধান কবি। কিন্তু যাঁহারা কবিকঙ্কন প্রণীত চণ্ডীকাব্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা একথা কখনই স্বীকার করিবেন না। ভারতচন্দ্রের যেরূপ রচনাশক্তি ছিল, আক্ষেপের বিষয়, তাদৃশ কল্পনাশক্তি ছিলনা। তিনি চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া, অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন করেন। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যের প্রারম্ভে গণেশাদি দেবতাদিগের বন্দনা, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্বতীর জন্ম ও বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শাপভ্রষ্ট নায়ক নায়িকার জন্মপরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশ ধারণ, শব্দশ্লেষ সহকারে ভগবতীর আত্মপরিচয় প্রদান ইত্যাদি বিষয়সকল চণ্ডীকাব্যের অনুকরণমাত্র তাহার সন্দেহ নাই। বিদ্যাসুন্দর কাব্যও তাঁহার স্ব-কপোল কল্পিত নহে।

বররুচি-রচিত সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর'-এর এবং বিহ্লণ-প্রণীত 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর ধারাতেই যে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথা দেখা দিয়েছিল, মহেন্দ্রনাথ তাঁর সেই অনুমানসূত্রে লিখেছিলেন—

> মালিনীর বেসাতীর হিসাব, সুপুরুষ দর্শনে কামিনীদিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, মশানে পিশাচসেনার সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট রাজকন্যার বারমাস বর্ণন, ঝড়বৃষ্টি দ্বারা দেশ বিপ্লাবন ইত্যাদি বিষয়গুলি যে চণ্ডীকাব্য দৃষ্টে বিরচিত হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু ভারতচন্দ্রকে প্রশংসা করলেও মুকুন্দরাম সম্বন্ধেই মহেন্দ্রনাথের আন্তরিক পক্ষপাত ছিল।

ভারতচন্দ্রের পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের [১২২২ (?)—১২৬৪] সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কাব্যপরিচয়ের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন—'মদনমোহন সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রসতরঙ্গিণী ও একবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাসবদত্তা প্রণয়ন করেন। রসতরঙ্গিণী কতকগুলি আদিরসঘটিত সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার ভাষা-অনুবাদ মাত্র। ইহার রচনা ললিত ও মধুর এবং এমন কি, স্থানে স্থানে মূল হইতেও বোধ হয় উৎকৃষ্ট; কিন্তু বর্ণিত বিষয়গুলি যার পর নাই অশ্লীল।' বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম, সুবন্ধু-র লেখা সংস্কৃত 'বাসবদত্তা' অবলম্বনে মদনমোহন তাঁর বাংলা বাসবদত্তা লিখেছিলেন। 'বাঙ্গালা কাব্যনিচয়ের মধ্যে কেবল মদনমোহনকৃত এই বাসবদত্তা কাব্য দ্রুতগতি, গজগতি, পজ্ঝটিকা, অনুষ্টুপ প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দোময়ী কবিতাবলীতে বিভূষিত।' জয়দেবের রচনানৈপুণ্যের সঙ্গে মদনমোহনের তুলনা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়,—মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'—তৃতীয় ভাগের 'পাখি সব করে রব' রচনাটির উল্লেখ করে সেকালের রুচি-প্রভাবিত সম্পাদক আরো জানিয়েছিলেন যে, মদনমোহনের 'প্রভাত বর্ণন বিষয়ক যে কয়েকটি কবিতা আছে তাহার তুল্য প্রসাদগুণ সমলঙ্কৃত কবিতা বঙ্গভাষায় অতি বিরল।'

তারপর, ১৭৪-এর পৃষ্ঠায় 'প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধে গুপ্তকবির (১২১৬? ১২৬৫ বঙ্গাব্দ) পরিচয় শুরু করা হয়েছিল। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ যোগীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর মাসিক প্রভাকর বের হয়। 'সাধুরঞ্জন' ও 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে দুখানি সাপ্তাহিক পত্রও তিনিই সম্পাদনা করতেন। মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—সাধুরঞ্জন 'সাধুদিগের চিত্তরঞ্জনোপযোগী

বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে বিভূষিত থাকিত এবং পাষণ্ডপীড়নের অঙ্কুশ-স্বরূপ নীতি-বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 'রসরাজ' নামক পত্রের সহিত পাষণ্ডপীড়নের কিয়ৎকাল বিষম বিসংবাদ চলিয়াছিল। এমন কি সম্পাদকরা প্রকাশ্যরূপে পরস্পরের কুৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যারপরনাই অশ্লীল বিষয় লিখিয়া স্ব স্ব পত্র দূষিত করেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'প্রবোধপ্রভাকর', 'হিতপ্রভাকর' (বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশের আভাসে এবং অবলাহিতৈষী বেথুন সাহেবের অনুরোধে রচিত), 'বোধেন্দুবিকাশ' ('সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের মর্ম লইয়া রচিত'), ভারতচন্দ্রের জীবনী এবং 'প্রভাকরে' প্রকাশিত *রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাই দাস ইত্যাদি কবির* **জীবনচরিতের** *কথা বিশেষভাবে স্মরণ করে* অতঃপর ১৮৬-র পৃষ্ঠায় রঙ্গলাল-প্রসঙ্গ শুরু করে 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-কেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে ধরা হয়েছিল। সে সময়ে 'শূরসুন্দরী' এবং 'কর্মদেবী' বই দু'খানিও প্রকাশিত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ আরো মনে করিয়ে দিয়েছিলেন,— 'বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুকুন্দরামকৃত বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যের এক নূতন সংস্করণ প্রচার করেন। স্বপ্রচারিত গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি কবিকঙ্কণের কবিত্বাদি সংক্রান্ত যে সমালোচনাটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার এবং তদ্দ্বারা তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।' রঙ্গলালের এই শেষ খবরটি আধুনিক গবেষকেরও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা দরকার। মহেন্দ্রনাথ যখন তাঁর এই সংকলন প্রকাশ করেন, রঙ্গলাল ছিলেন তখনকার জীবিত কবিদের অন্যতম। মধুসূদনের কীর্তির উজ্জ্বলতায় এবং তাঁর সমকালীন অজস্র স্তুতি-নিন্দার কোলাহলে রঙ্গলালের

দিকে তেমন নজর না পড়বারই কথা! তবু মহেন্দ্রনাথ তাঁর কথা ভোলেন নি।

এই কাব্যসংকলনের বিশদভাবে আলোচিত কবিদের মধ্যে শেষ নামটি মধুসূদন দত্তের। ১৯৬-এর পৃষ্ঠায় ঊর্ধ্বকমা দিয়ে তাঁর জীবনী শুরু করে ১৯৭-এর পৃষ্ঠায় সে আলোচনা শেষ হয়েছিল। মধুসূদনের জন্মকালটি তিনি নির্দিষ্ট ভাবে জানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন 'আনুমানিক ১২৩৫ সালে' মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন;—এবং 'ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।' ১৮৭১-এ মধুসূদনের 'হেক্টরবধ' প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে কাব্যসংকলনের কবি-পরিচিতি বলেই বোধ হয় সেই গদ্যগ্রন্থের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল; তাই এ-বইয়ের সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতির মধ্যে মধুসূদনের সে-বইখানির নাম দেওয়া হয়নি। মহেন্দ্রনাথের বই বেরিয়েছিল ১৮৭২-এর শেষ দিকে। মধুসূদনের মৃত্যুর তারিখ ২৯-এ জুন, ১৮৭৩। সুতরাং মধুসূদনের প্রায় সকল কীর্তির পূর্ণ ঐশ্বর্যের দিকে আরো মনোযোগ দিতে তখন কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ তা দেন নি,—যদিও তিনি একথা বলেছিলেন বটে যে, 'যাহা হউক ইনি যে ইদানীন্তন বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।' মেঘনাদবধকাব্য থেকে পর-পর তিনটি অংশ উদ্ধার করে অতঃপর 'দ্বারকানাথ রায় প্রণীত কবিতাপাঠ' থেকে কয়েকটি অপদার্থ উদ্ধৃতি তুলে,—পর-পর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব-শতক' থেকে, মধুসূদন বাচস্পতির 'ছন্দোমালা' থেকে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মিত্রবিলাপ' থেকে এবং হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'রামায়ণ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থকার তাঁর বই শেষ করেছিলেন।

মনে হয়, শেষ দিকটা খুবই তাড়াতাড়িতে সারা হয়েছিল।

নবীন সেনের কথা সে সময়ে বাদ পড়লেও খুব দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী এবং রাজকৃষ্ণ রায়—অন্তত এই দুজনের কবিতার অভাব চোখে পড়ে। তাঁদের তখন বই বেরিয়ে গেছে। হেমচন্দ্রের অনুপস্থিতি বড়োই চোখে লাগে। তবে সম্পাদক ভূমিকায় জানিয়েছিলেন—'রামরসায়ন, নির্বাসিতের বিলাপ ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত কবিতাবলী প্রভৃতি কাব্য হইতেও কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার মানস ছিল; বাহুল্য কারণ আপাততঃ ক্ষান্ত রহিলাম।'

অতঃপর একালের কথা। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, কামিনী রায় ইত্যাদি রবীন্দ্র-যুগের যেসব প্রসিদ্ধ কবি বিশের শতকে অনেক কাব্য-কবিতা লিখেছেন, তাঁদের কথা বর্তমান অধ্যায়েই বলা হলো; তাছাড়া রবীন্দ্র-যুগের 'আধুনিকতর' প্রমথ চৌধুরীর কথাও এ-বইয়ের ৪৫-৫৩ পৃষ্ঠার মধ্যে কতকটা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। তাঁদের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' (১৮৯০) থেকেই রবীন্দ্র-যুগের সূচনা মনে করে নিলে আলোচনার সুবিধা হবে। তার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ শুরু হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পূর্বনামারা তখন সকলেই নাম করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সবিতা' (১৯০০) এবং 'বেণু ও বীণা'র (১৯০৬) কয়েকটি কবিতা শতাব্দীর সেই শেষ দশকেই লেখা হয়েছিল। পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক বীক্ষাভঙ্গিতে তিনি আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন, অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক স্বভাবও তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের মন থেকে এই দ্বিধাভাব কোনোদিনই সম্পূর্ণ কাটেনি। তাঁর কবিত্ব ও কাব্যাদর্শের বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমি অন্যত্র করেছি

('সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ'—মাঘ, ১৩৬১)। সুতরাং রবীন্দ্র-যুগের বাংলা কাব্যপ্রবাহে রবীন্দ্রেতর কবিদের নতুন পথ সন্ধানের প্রয়াস ও ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে তাঁর কথা যেটুকু না বল্‌লে নয়, এ-বইয়ে সেইটুকুই বলা দরকার ; অন্যান্য কথা পূর্বগ্রন্থে বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের যুগ বরাবর একভাবে কাটেনি। একদল তাঁর অনুগামী, অন্যদল তাঁর বিরোধী। এই দু'দলের সমবায়েই তাঁর প্রভাবের পূর্ণতা! শতাব্দীর প্রথম দিকে অস্পষ্টতা বিমুখ দ্বিজেন্দ্রলাল,—তারপর দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী নজরুল,—আরো পরে সংহতি-গাম্ভীর্য-পরিবর্তন-অভিপ্রায়ী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, এবং ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার (তিরিশের দশকের) কবি, পাশ্চাত্য কাব্যভঙ্গির ভক্ত বিষ্ণু দে,—অতঃপর ১৩৪২-এর আষাঢ় থেকে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জোলো অনুকরণের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ কতকটা উৎকট স্বাতন্ত্র্যচর্চা করেছেন। কোনো-কোনো কবি দুরূহ শব্দের দিকে ঝুঁকেছেন, কেউ বা দুর্বোধ্যতার দিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকেই সৌখীন এবং আন্তরিক, দু'রকম সাম্যবাদী কবিদের লেখাতে ধনতন্ত্রের অবক্ষয়দশা ঘোষিত হয়েছে। তা'ছাড়া গদ্যকবিতা,—ব্যঙ্গবিদ্রূপ,—'জীবনানন্দীয়' নিসর্গমগ্নতা ইত্যাদি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার রবীন্দ্র-যুগ উত্তরোত্তর বৈচিত্র্য-ময় হয়ে উঠেছে।

১। 'In the following pages an attempt has been made for the first time in the history of our National Literature to present in one volume a systematised series of specimens from the writings of the principal Bengali poets from Bidyapati and Chandi Das to Rangalal and Michael.'

রবীন্দ্র-বরণ ও রবীন্দ্র-বিরোধের যুগ-যুগান্ত

অধ্যায়ের শিরোনাম দেখে পাঠক কি ভুল ধারণা করবেন? কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার বিরোধী এযুগে কেউ নেই, একজনও নেই। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মতন রবীন্দ্রনাথের খুঁৎ ধরে যাঁরা ইতিহাসে জায়গা পেয়েছেন, তাঁরা ঠিক কবি ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রবীন্দ্র-প্রতিবাদও অতীতের কথা। প্রমথ চৌধুরীও ঠিক রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন না। বিশের শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে বাংলার নবীন কবিদের মধ্যে যখন বস্তুতান্ত্রিক মনোভঙ্গির বিশেষ প্রবণতা দেখা গিয়েছিল,—প্রথম মহাযুদ্ধে য়ুরোপের দলিত অবস্থায় সে দেশের কবিরা যখন নৈরাশ্য এবং দুঃখভাবনার দিকে চলেছিলেন,— রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও বেকারসমস্যার পরিবর্ধমান আঘাতে এবং কতকটা রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার ফলে আমাদের দেশে কবিরা যখন নতুনভাবে ভাববার এবং নতুন কিছু বলবার উৎসাহ ভোগ করেছিলেন, পূর্ব-যুগের রবীন্দ্র-বিরোধীরা তখন লোকান্তরিত হয়েছেন। ব্যঙ্গধর্মের ঝোঁকে এবং চলতি শব্দের যোগে প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিনিষ্ঠ 'আধুনিকতা'ও ছিল, শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা; তরুণ কবি সতীশচন্দ্র বেশিদিন বেঁচে থাকলে হয়তো তিনিও কোনোসময়ে সেই পথই বেছে নিতেন; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও সেই পথেই (কিন্তু অনেকটা শিথিল ভঙ্গিতে) 'হসন্তিকা' লিখেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি শতাব্দীর তৃতীয় দশকের খ্যাতিমানরা অতঃপর অন্য পথ বেছে নিলেন। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নয়,—তাঁর আলোতেই আলোকিত হয়ে, —এবং দেশ-কালের অধ্যায়ান্তর সূচনার ফলে, তাঁদের অন্তরে দেখা দিয়েছিল নতুন উদ্দীপনা;—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে নতুন করে

দেখা দিলো রবীন্দ্র-বচনের সঙ্গে বাস্তব-সংসারের প্রকৃত বিরোধের মর্মবেদনা। রবীন্দ্র-বরণের সঙ্গে রবীন্দ্র-বিরোধের এই ওতপ্রোত সম্পর্কটা আদিতেই স্পষ্ট করে বলে নেওয়া গেল। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জন্ম ১৮৮২), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কালিদাস রায় (জন্ম ১৮৮৯) প্রভৃতি রবীন্দ্রভক্ত 'অনাধুনিক'দের মধ্যেও মাঝে-মাঝে সেরকম বিরোধের লক্ষণ যে না দেখা গেছে, তা নয়। কিন্তু সে কথা পরে বলা যাবে। বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল প্রভৃতির রোম্যান্টিক ভাবমগ্নতার ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব; এবং রবীন্দ্র-যুগে বিপরীত দল থাকলেও রবীন্দ্রবরণের মনোভাবটাই মুখ্য! শতাব্দী-সূচনার পর্বে সতীশচন্দ্র ছিলেন সে মনোভাবের তরুণতম প্রতিনিধি।

সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮১—১৯০৩)

১৩০৮-৯ সালে রবীন্দ্রনাথের নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ এবং শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'সমালোচনী' পত্রিকায় সতীশচন্দ্রের (১২৮৮-১৩১০) কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছিল। ১৩১৯ সালে শান্তিনিকেতন থেকে সতীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' নামে রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই রচনাবলীর অনেককাল পরে ১৩৫৪ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে ১৩০৯ সালে শান্তি-নিকেতন থেকে লেখা সতীশচন্দ্রের একখানি চিঠি ছাপা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লালনে সেকালে তরুণ যে ক'জন সাহিত্য-সাধক বিশ্বসাহিত্যের পাঠক এবং বাংলা সাহিত্যের লেখক হয়ে ওঠার সংকল্প নিয়েছিলেন, সতীশচন্দ্র ছিলেন সেই বহুপরিশ্রমনিষ্ঠ অল্পপ্রচারিত, প্রাণবন্তদের অগ্রণী। একালের পাঠকের কাছে

তাঁর অন্য দুই বন্ধুর নামই বরং বেশি পরিচিত। সত্যেন্দ্রনাথ কবি হিসেবেই বেশি প্রসিদ্ধ,—তাঁর সাহিত্যচিন্তার অধ্যবসায়ভূয়িষ্ঠ গদ্য-প্রদেশের খবর একালের গল্প-উপন্যাস-রম্যগদ্য-পরিতৃপ্ত পাঠকের চেনামহলের বাইরে প্রতীক্ষা করছে। আর, অজিতকুমার চক্রবর্তী সৌভাগ্যবশত নিজের প্রবন্ধগুলি পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে বইয়ের পাত্রে তুলে রেখে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন; তাই তাঁর নামটিও আমাদের বিদ্যোৎসাহী সমাজে এখনো মাঝে-মাঝে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু সতীশচন্দ্র মারা গেছেন মাত্র একুশ বছর বয়সে। মৃত্যুর বছরখানেক আগে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তিনি লিখেছিলেন—'আজকাল আমাদের সাহিত্যের prospect অতি শোচনীয়। আমি সাহিত্য proper-এর কথাই বলিতেছি। কারণ সাহিত্য আলোচনার জন্য যে পরিমাণ সাধুতা, চরিত্রবল, পরিশ্রম এবং মস্তিষ্কের উৎকর্ষের দরকার তা অনেক সাহিত্যযশোলিপ্সু যুবা-পুরুষের নাই। আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, prophets-দের পরেই সাহিত্য মানুষের জীবনে উন্নতির সহায়। Prophets কিছু রোজ আসে না—interim-গুলি আমাদের সাহিত্যে democratic culture দিয়া ভরিয়া রাখিতে হইবে।'

রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধে' 'সতীশচন্দ্র রায়' নামে যে লেখাটি সংকলিত হয়েছে, তাতে মৃত্যুর অল্পকাল আগে লেখা সতীশচন্দ্রের একখানি চিঠির অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সে লেখাটির প্রধান বিষয় হলো তাজমহলের আবেদন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য। তবে, মমতাজের অকালমৃত্যুর সৌন্দর্য উপলব্ধি করে এই চিঠির সঙ্গে তিনি যে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাতে তাঁর অভিজ্ঞতার তেমন চমৎকার কোনো স্পন্দন ধরা পড়েনি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আগ্রাপ্রান্তরে', 'তাজমহল', 'বসোরার

গোলাপ', 'চণ্ডালী', 'জামদগ্ন্য', 'পরীর জন্মকথা', 'ছুয়োরানি', 'ছায়াগর্ভ-সম্ভূতং', 'শেলির প্রতি', 'প্রেমের স্বপ্ন' ইত্যাদি শিরোনাম-ভূষিত অনুকরণপ্রধান কবিতাই অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু এইসব লেখার মধ্যেও মাঝে-মাঝে তাঁর নিজের মৌলিক কল্পনার ঈষৎ স্ফুরণ দুর্লক্ষ্য নয়। এবং উপযুক্ত কবিমননের অভাবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁর উপমা বা রূপকের স্বাদ যে নষ্ট হয়েছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের শোভার কথায় তিনি লিখেছিলেন—

পশ্চিম দিগন্তে যেথা গভীর সিঁদূর
যেন কোন উপন্যাস-রাজার মহাল-মালা
ভাঙ্গিয়া পড়িছে চূর চূর—

আবার, সুখমদে বিহ্বল কবিমানসে অপ্রত্যাশিত দুঃখের আবির্ভাব লক্ষ্য করে তাঁকে বলতে হয়েছিল—

কোথা ছিল দুঃখ হায়! লুকায়ে ঘুঘুর মত—
সুদূর মরম মাঝে?—সুখ সে কেমনে হত?

এই দুটি ছবি একই কবিতা থেকে ('দুঃখ-দেবতার মূর্তি') তুলে দেওয়া হলো। প্রথমটি মনোরম,—দ্বিতীয়টি অসংগত। প্রথমটিতে উপভোগের আনুকূল্য,—দ্বিতীয়টিতে অনভ্যস্ত সাদৃশ্যের অনস্বীকার্য বাধা। মনের গভীরে দুঃখ যেন ঘুঘুর মতো লুকিয়ে আছে, এই উপমাতে লুকিয়ে-থাকা ব্যাপারটুকু বড়ই কোমল হয়ে উঠেছে। অথচ, একই নিঃশ্বাসে কবি লিখেছেন—

হায় কি অশুভ খন!
দেবতা কি দুরজন!
দুরদৃষ্ট পড়িল ঝরিয়া
নভতল ভস্মে আবরিয়া!

যে দুঃখে 'নভতল' ভস্মে ঢেকে যায়, সে দুঃখের উপমান নিশ্চয় ঘুঘু নয়! একথা সর্বজনবিদিত না হলেও রসিকের অগোচর নয়।

সতীশচন্দ্রের কবিতায় সে-যুগের রবীন্দ্রপ্রভাবময় অল্পক্ষম কবিদের মামুলি লক্ষণগুলি সর্বত্র চোখে পড়ে। কিন্তু তবু কিছু বিশেষত্বও ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছাড়া, সে সময়ে গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও নবীন লেখকদের মনোহরণ করেছিলেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বরদা চরণ মিত্র, নবীনচন্দ্র দাস প্রভৃতি বহু কবি অনুবাদের কাজে নেমেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অক্ষয়কুমার বড়াল উভয়েই ছিলেন সেকালের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। সতীশচন্দ্রের কবিতায় এইসব ভিন্নমুখী সমকালীন কবির অল্পবিস্তর প্রভাব চোখে পড়ে। বিশেষত, শব্দের দিকেই তাঁর আগ্রহের আতিশয্য ছিল। অপ্রচলিত, ধ্বন্যাত্মক, স্ব-উদ্ভাবিত—নানা অদ্ভুত শব্দ ছড়িয়ে আছে তাঁর মুষ্টিমেয় কবিতার ছত্রে-ছত্রে! নিচের উদ্ধৃতিগুলিতে 'ঋতুচার', 'নিচয়' (নিশ্চয় অর্থে), 'নিদ্রাল' এবং এই ধরনের আরো কয়েকটি শব্দ দেখা যাচ্ছে—

ক] সেই যে পক্ষীর দল, উড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে
মাঝে মাঝে ঋতুচারে যেথা এসে থাকে···

খ] বহুদূর বালুচর—হস্ আসে ঢেউ,
হস্ কলকল্ পুনঃ চলি' যায় কেউ···

গ] দিনু ছুঁড়ি পত্রখানি। ওগো কবিগণ,
তোমরা বুঝিয়া লও কি এ জল্পন।

ঘ] নিচয় পরীরা এসেছে খেলাতে
ফুল তুলে দেছে এ দোঁহার হাতে।

ঙ] ভাই বোন দুটি আঙিনার মাঝ
দুজনার চোখে একইতরো ভাঁজ…

চ] নির্জন কান্তার পরে গৃহমুখী যেথা মেষপাল
অলস নিদ্রাল
রুণু রুণু চলিয়াছে, মন্দালোকে,
থামি কভু ছুটি
শষ্প খুঁটি খুঁটি…

অন্ত্যানুপ্রাসের খাতিরে শব্দের বহু বিকৃতির দৃষ্টান্তও তাঁর এইসব লেখাতে বিরল নয়। অর্থাৎ, ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের কাছে তো বটেই,—এমন কি প্রশ্রয়সমর্থ পাঠকের চোখেও সতীশ-চন্দ্রের কবিতা সর্বত্র ঠিক সুখপাঠ্য নয়। তবু, শতকের প্রথম দশকের রবীন্দ্রভক্ত, তরুণ কবিদের মধ্যে তাঁরও একটি বিশেষ কীর্তি আছে। তাঁর অকালমৃত্যুর কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মতো রিক্তহস্তে জীর্ণ শক্তি লইয়া যায় নাই।' কেবল এইটুকুই নয়,—রবীন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছিলেন—'সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।' অকৃতার্থ মহত্ত্ব, অনুপম হৃদয়মাধুর্য, অকৃত্রিম কল্পনাশক্তি ইত্যাদি প্রশস্তিময় বহু কথা লিখে, খেদ প্রকাশ করে, তিনি জানিয়েছিলেন—'জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না।'

শৈশবে, নর্মাল স্কুলের ছাত্রাবস্থায়, রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ

শ্রীকণ্ঠবাবুর হৃদ্যতায় যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি বাল্যকালে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর অসামান্য সাহিত্যভোগের সামর্থ্য দেখে তাঁরও ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে 'জীবন-স্মৃতি'তে মন্তব্য আছে—'তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি।' লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন, তৎপরে আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের এবং যৌবনের অনুরূপ সুহৃদ। তারপর, তাঁর আরো পরিণত বয়সে, সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি তাঁর অন্তরের সেই একই প্রবেশ-তোরণে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রিয়নাথ সেনের প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছিলেন—'তাঁহার কাছে বসিলে ভাব-রাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়।'

'কবির বিকল্প' নামে একটি কবিতায় 'আমি তব বাগানের ফুলতরু সখা', এই ঘোষণার পরে, শেষ স্তবকে সতীশচন্দ্র লিখেছিলেন—

ওই যে মানবদল বিহঙ্গ সমান
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে আর করয়ে প্রয়াণ
মোর স্কন্ধে নিত্যগীত, শীতল পল্লব মাঝ
শিরে মোর প্রসারিত আনন্দ অলকা!
আমি তারি বাগানের ক্ষয়হীন কল্পতরু
আমি তব বাগানের ফুলতরু সখা!

দেশ-কাল আচারের সংকীর্ণ সীমার শাসন তাঁর কবিমন কখনোই স্বীকার করেনি। অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্রম-পরিবর্তনের ভূমিকায় সংস্কৃতির মূল্যনির্ণয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের একালের আন্দোলন বাংলার সে যুগের সাহিত্য-পাঠকের দুশ্চিন্তার কারণ

ছিলনা। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বিশেষ কোনো ঘটনারই চিহ্ন নেই। তিনি 'বিশ্বের বিহঙ্গসমান' মানবদলের বিশ্বব্যাপী শোভাযাত্রা দেখেছিলেন,—কিংবা হয়তো তাই দেখতে চেয়েছিলেন। নিকটকালের চাঞ্চল্য থেকে অনেকটা দূরে থেকে তিনি তাঁর কবিতায় মাঝে-মাঝে যে-বিষাদের সুরটি শুনিয়ে গেছেন, সে হলো বয়ঃসন্ধির অস্ফুট অভাববোধ! সে অভাবের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, সে ব্যাকুলতার কোনো নিশ্চিত লক্ষ্য নেই। 'সন্ধ্যার একটি সুর' কবিতাটি সেই লক্ষণেরই উদাহরণ। বিশ্বময় সুন্দরের স্বীকৃতিই ছিল তাঁর অন্তরের আদর্শ। কিন্তু সে আদর্শ তাঁর লেখার মধ্যে উপযুক্ত আয়োজনে পুষ্পিত হবার আগেই মৃত্যু তাঁর পথ রোধ করে সমস্ত সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। তবে, তাঁর অধ্যয়ন-স্বভাবের মধ্যে সেই আদর্শের যেটুকু সার্থকতা ফুটেছিল, রবীন্দ্রনাথ তারই প্রশস্তিসূত্রে লিখেছিলেন যে, আমাদের দেশে 'ব্রাউনিংয়ের ফ্যাশান বা ব্রাউনিংয়ের দল' প্রবর্তিত হবার আগেই ব্রাউনিং সতীশচন্দ্রকে 'বিশেষভাবে আবিষ্ট' করেছিল। তিনি বলেছিলেন—'ব্রাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।'

সতীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের কথাসূত্রে 'বিশ্বভারতী পত্রিকার' (ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) 'কবি-তাপস সতীশচন্দ্র' প্রবন্ধে 'চতুরঙ্গের' শচীশের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের স্বভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'শচীশ চরিত্র বলা নিষ্প্রয়োজন সতীশচন্দ্রের অবিকল প্রতিচ্ছবি অবশ্যই নয়; কিন্তু কবিকল্পনার জারকরসে রসায়িত সতীশচন্দ্রের মানসমূর্তি অনেকাংশে

হওয়া সে চরিত্রটির পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব। বলা প্রয়োজন, আমার এ জল্পনার অনেক পরে লক্ষ্য করেছিলাম যে 'চতুরঙ্গের' ইংরেজি অনুবাদ Broken Ties-এ রবীন্দ্রনাথ নিজেই শচীশকে বদলে 'সতীশ' করেছেন।'

পুরাকালে আমাদের দেশে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, ছাত্রেরা সেই ভাবে মনুষ্যত্বের সাধনা করবে, এই সংকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন, সে সময়ে সতীশচন্দ্র 'ধর্মব্রত স্বরূপে' অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেছিলেন। সংসারের কোনো বাধাবিপত্তিই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। কল্পনার সঙ্গে কর্মের কোনো বিরোধকেই চরম বাধা মনে করবার দুর্বলতা ছিলনা তাঁর সত্তায়। এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় লিখেছিলেন—'সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে কর্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিবমূর্তি দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল।'

১৩০৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে লেখা সতীশচন্দ্রের চিঠির যে অংশ এই আলোচনার প্রথম দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে তাঁর সেই তৃতীয় নেত্রের অভিব্যক্তি ফুটেছিল। সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত ও বহুল অনুশীলিত বাহনগুলির মধ্যে,—তিনি তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালের সীমানাতে মাত্র দুটি বিভাগের চর্চায় অল্পকাল নিযুক্ত ছিলেন। মুষ্টিমেয় কবিতা এবং অল্পসংখ্যক প্রবন্ধ,—এই হলো সাহিত্যকর্মী সতীশচন্দ্রের লিখিত কীর্তি। সেই সংকীর্ণ রচনাক্ষেত্রের বাইরে টিঁকে আছে বন্ধুজনের কাছে লেখা তাঁর দু'একখানির চিঠির টুকরো। এছাড়া, আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না! রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিই তাঁর মহত্বের একমাত্র সাক্ষী, এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন যে,

সে মহত্ত্বের নাম 'অকৃতার্থ মহত্ত্ব'। আর, তাঁর মৃত্যুর পরে বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

আমাদের মনে ছিল সংকল্প অনেক
ছুটি মন দৃপ্ত তেজীয়ান ;
বৃথা হল আশাতরু-মূলে জলসেক,
অঙ্কুরে শুকায়ে গেল—সব অবসান।

এই শোকগীতিকার শেষদিকে সতীশচন্দ্রের আর-এক পরিচয় আছে—

বর্ষাদিনে গুরুগৃহে আমা দোঁহাকার
গুরু হ'ত মেঘের গর্জন ;
তা ছাড়া কিছুই কানে পশিত না আর
ভেসে যেত উপদেশ—গম্ভীর বচন।
তারি সনে ভেসে যেত দূর ভবিষ্যতে
কি কুহকে দোঁহাকার মন ;
দেখিতাম সাম্য-রাজ্য বিস্তৃত ভারতে
সমুন্নত শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।

উত্তরকালে, সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' (১৯০৭) বইখানির মধ্যে সংকলিত 'সাম্যসাম' কবিতার উৎসকালের ইশারা পাওয়া যাচ্ছে এই উদ্ধৃতির শেষাংশে। এই ঘটনার অনেক পরে ১৩৩২ সালের শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল'-এ নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন—

নেইক এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত মোল্লা-ভিক্ষু একগ্লাসে খায় জল।

সতীশচন্দ্র তাঁর 'তৃতীয় নেত্রে'র শক্তিতেই 'democratic culture'-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন শতাব্দীর সূচনা-

সন্ধির বিশ্বমানবতাবোধ আর অধ্যাত্মবিশ্বাসের মধ্যে। Browning-এর 'One Word More' কবিতাটি উপলক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন—

> বাস্তবিক আমি যতদূর বুঝি তাহাতে কবিতা, জীবনের প্রতিবিম্ব বই আর কিছু নহে।…
>
> কবির কাজ কি? আমাদিগকে মহৎ করা—প্রতি পদার্থের মধ্যে রন্ধ্র করিয়া অসীমের আলোক আনিয়া দেওয়া।…
>
> দৃঢ়হস্তে ঠিক আমার শরীর ধরিয়া যিনি বলিয়া দিতে পারেন, 'এই দেখ, ইহার মধ্যে স্বর্গের আলোক, এই দেখ ইহার মধ্যে স্বর্গের গন্ধ, তিনি সর্বাপেক্ষা বড় কবি। কবিতা ও জীবন দৃঢ়রূপে মিলিত করিতে না পারিলে, সেই সিদ্ধির শেষ কথাটি বলা কাহারও সাধ্য হয়, আমি বিশ্বাস করি না।

আবার, Paracelsus-এর সুখ-দুঃখ-নৈরাশ্য-ব্যর্থতা সমস্ত পার করে Browning-এর প্রসিদ্ধ উক্তি তিনি সানন্দে স্মরণ করেছেন—'Greet the Unseen with a cheer'।

সতীশচন্দ্রের ব্যক্তিস্বভাবের বিশিষ্ট প্রবণতার সংকেত আছে তাঁর এই দুটি গদ্য-রচনার মধ্যে। তাঁর এই আনন্দবোধ সবল, সুদৃঢ়, সুপরিণত। তিনি যে জীবনের কঠোর বস্তুসত্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বিশ্বপ্রেমের কথা বলেছিলেন, সেরকম কোনো সংশয়ের কারণ নেই। এই লেখাটির শেষ দিকে তিনি বলেছিলেন—

> 'মানবজীবন ক্ষণিক অন্ধকার সত্ত্বেও যে যুক্তি-শৃঙ্খলা-সৌন্দর্যে পূর্ণ, বিশৃঙ্খল বাহ্য-ঘটনা বিদীর্ণ করিয়া কবি তাহাই দেখাইয়া দিতে পারেন।'

'শিবনেত্র' কথাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিশেষ দৃষ্টি-সামর্থ্যেরই ইশারা দিয়ে গেছেন। 'শিব' হলো মঙ্গলের প্রতিশব্দ।

সতীশচন্দ্র সেই মঙ্গলকে উপলব্ধি করেছিলেন মর্ত্যের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মধ্যে। Browning তাঁর আপন কবি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গুরুদেব'; আর নিজের বিষয়ে তাঁর ডায়ারিতে তিনি লিখে-ছিলেন—'আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।' মৃত্যুর অল্পকাল আগে—সম্ভবত ১৩০৯ সালের ১৪ই বৈশাখ শান্তিনিকেতনের রৌদ্রস্নাত এক গাছের দৃশ্য দেখে তাঁর কবিমনে কল্পনার লীলা শুরু হয়েছিল। Browning-এর আবৃত্তিতেই তিনি সেদিন গভীরভাবে আবিষ্ট ছিলেন,—আর ডায়ারিতে লিখে-ছিলেন—

'Scare away this mad ideal
Spare me thou the only real.'

সতীশচন্দ্রের জন্মের আগেই বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) বেরিয়েছিল। উনিশের শতকে আখ্যান-কাব্য আর মহাকাব্যের ধারাটি যেমন রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি প্রায় একই সময়ে অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল প্রভৃতি কবির প্রযত্নে রোম্যান্টিক গীতিকাব্যের ধারাও ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করবার আগেই বিহারীলালের প্রথম রচনা স্বপ্নদর্শন' (১৮৫৮) বেরিয়ে গেছে। উনিশের শতকে, বাংলা কবিতার এই দুই ভিন্ন ধারার যুগল অবস্থানের কথা ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর একটি প্রবন্ধে, বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।[১] সেকালের উপাখ্যান-কাব্য এবং মহাকাব্যের মধ্যেও ছিল আত্মগত মননেরই প্রয়াস। তিনি জানিয়েছেন—'আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, সে

কালের মহাকাব্য-রচয়িতাগণ, কাব্যের প্রেরণার জন্য, আপনার মনো-রাজ্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বাহিরের বস্তু-জগতে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলেন; আত্মগত অনুভূতির মধ্যে নয় ইতিহাস-পুরাণের মধ্যে কাব্যের উপকরণ সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বাহিরের বাস্তব-আহরণের অন্তরালে, epic বা narrative আকৃতির পিছনে তাঁহাদের কাব্যের সমস্তটাই ছিল অপূর্ব মনঃসৃষ্টি, আত্মগত ভাব ও কল্পনার বিজয়-গীতি, lyric-আবেগের অসীম আনন্দ।' তিনি আরো জানিয়েছেন—'যখন য়ুরোপীয় ছাঁচের মহাকাব্য ভাবপ্রাণ বাঙালীর ধাতে সহিল না, এবং নভেলের অভ্যুদয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান-কাব্যের আসর জমিল না, তখন বাংলা সাহিত্যের পুরাতন গীতি-কবিতার সুরটি পুনরায় প্রাধান্য লাভ করিল। এই আত্মতন্ত্রতা ও ভাব-নিমগ্নতাই বিহারীলালের একান্ত গীতি-প্রাণ কবি-প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ।'

বিহারীলাল নিজে ছিলেন 'অশরীরী সৌন্দর্য ও প্রেম-কল্পনার' কবি; তাঁর ভাবশিষ্য অক্ষয়কুমার বড়ালও তাই। ডক্টর দে অক্ষয়কুমারের 'ভুল' ও 'কনকাঞ্জলি' থেকে 'কি যেন স্বপনে হারাই আপনা' 'মনে ত থাকে না এ ধরাতল!'—অংশটি তুলে 'ভাবপ্রধান চিত্তের এই তন্ময়তা' সম্বন্ধে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

> বিচিত্র এ মত্তদশা ভাবভরে যোগে বসা
> হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!

বিহারীলালকে অক্ষয়কুমার যে গুরু বলে মেনেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিহারীলালের মৃত্যুতে তিনি যে শোক-গীতি রচনা করেন, ডক্টর দে তা' থেকেও কয়েক লাইন তুলে দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়' প্রভৃতি প্রথম বছর-দশেকের লেখাগুলির মধ্যে 'বাস্তবাতিরিক্ত কল্পনার উল্লাসই' যে প্রাধান্য পেয়েছিল, সে কথা আজ সকলেই জানেন। অধ্যাপক দে সেই সূত্রে লিখেছেন—'Romanticism-এর প্রথম উন্মেষে ভাবাতিরেকের এই উন্মত্ততাকে Werterism বলিয়া কার্লাইল উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু এই Werterism বা 'ভগ্নহৃদয়ের ভাবপ্লাবন' স্বভাবতঃ বস্তুতান্ত্রিক য়ুরোপীয় কবির মধ্যে বিসদৃশ ঠেকিলেও কল্পনা-প্রাণ বাঙালী কবির রচনায় শুধু উচ্ছৃঙ্খল ভাব-বিপ্লবে পর্যবসিত হয় নাই। কারণ, এই আনন্দ-কল্পনা তাহার নিকট মানস-সত্য। যে স্বভাবতই কল্পলোকবাসী, তাহার নিকট কল্পলোকের সুখ-দুঃখ শুধু ছায়াশরীরী নয়, চিন্ময় সত্যের সৌন্দর্যে সমুদ্ভাসিত।'

রবীন্দ্র-যুগের এবং রবীন্দ্র-কাব্যের অনুরাগী পাঠকের পক্ষে এই প্রবন্ধটি নানা কারণে মূল্যবান। আমার এই উপস্থিত আলোচনার ২২৪-এর পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদে মোহিতলালের যে উক্তিটি স্মরণ করা হয়েছে, সুশীলকুমারের এই মন্তব্যের সাহায্যে এতক্ষণে সে-উক্তির ব্যাখ্যা দেওয়া গেল। বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা যে-অর্থে 'কল্পলোক'-বিশ্বাসী বাঙালী ছিলেন, রবীন্দ্র-যুগেরই পরবর্তী ভাবোচ্ছ্বাসশীল কবিরা ঠিক সে-অর্থে এবং সে-অনুপাতে বাঙালী নন! পরবর্তী কল্পলোকের ভিৎ যেন আল্‌গা,—তার মূলে নেই বিশ্বাসের জোর, তার বেদনা যেন অভিনয়! আমাদের একালের বস্তুবোধে-অভিসিক্ত মন দিয়ে দেখলে অক্ষয় বড়াল প্রভৃতি সেকালের কবিদের বেদনা আমরা কতোটুকুই বা বুঝি! কল্পসত্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার ভাব তাঁরাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখতে পারেন নি। তাঁদেরও সংশয়ের দিন গেছে। বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল'-এর মধ্যে বলেছিলেন—

তবে কি সকলি ভুল, নাই কি প্রেমের মূল
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার !

অক্ষয়কুমার তাঁর 'ভুল' বইখানির 'উপহার' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে বলেছেন—

না ল'য়ে কিছুরি তত্ত্ব, আপনার ভাবে মত্ত
ফেলেছি, ঝটিকা মত, না জানি কি তুলিয়া ?
রবি, এও কি হয়েছে ভুল, এত ভুলে ভুলিয়া ?

'কনকাঞ্জলি'-র মধ্যে বাস্তব এবং স্বপ্নের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল—

এই তো প্রেমের বন্ধ—বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতায় চিরানন্দ, সশঙ্ক দুরাশা !

দ্বন্দ্ব, সংশয় বা সংঘাত সম্পূর্ণ এড়িয়ে থাকা জীবন্ত মানুষের সাধ্য নয়। মোহের পরে মোহভঙ্গ, এবং মোহভঙ্গের পরেও মনঃপ্রবাহ থাকে বৈ কি! কল্পসত্যের সঙ্গে বস্তুসত্যের সব সংঘর্ষের [illegible], বিহারীলাল যে গভীর তৃপ্তি পেয়েছিলেন, সুশীলকুমার তাকে বলেছেন 'mystic mood'।—'কিন্তু অক্ষয়কুমার চিরকালই হাহাকার করিয়াছেন, কখনও নিরবচ্ছিন্ন নির্বৃতি লাভ করিতে পারেন নাই।' নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিহারীলাল 'সারদামঙ্গলের' উপসংহারে এক সংশয়হীন অদ্বৈত আনন্দই প্রকাশ করে গেছেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ গে এ বসুমতী যার খুশি তার !

—'কিন্তু অক্ষয়কুমার বিহারীলাল অপেক্ষা অধিকতর আত্ম-বিশ্বাসী।' অর্থাৎ যোগাসনে বসেও তাঁর বস্তুপরিবৃত আত্মা আত্ম-

বিস্মৃত হয়নি! বস্তুর সীমা, গ্লানি, নশ্বরতা দেখে ভাবুক মানুষের পক্ষে এ-অবস্থায় বিষণ্ণ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। তারপর বয়োবৃদ্ধি, স্ত্রীর মৃত্যু ইত্যাদি ব্যাপারে সে মন আরো বিষণ্ণ হয়েছে। এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পরে 'এষা'তে যে ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল, স্ত্রীবিয়োগের আগে লেখা 'শঙ্খে'র 'বিপত্নীক' কবিতাতেও সেই গভীর বিষাদই ধ্বনিত হয়েছিল। তখন—

জীবন-শ্মশান-কূলে বসে আছি বড় ভুলে,
আকাশের পানে চেয়ে অশ্রু দরদর![২]

রোম্যান্টিক ভাবাদর্শের ব্যাপক অনুকরণময় রবীন্দ্রযুগ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে প্রথমেই সতীশচন্দ্রের কথা বলা হয়েছে। সতীশচন্দ্র লিখেছিলেন খুবই কম। কিন্তু তিনিও কল্পসত্যের প্রতি নিষ্ঠা নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন। অক্ষয় বড়ালের সঙ্গে এদিক থেকে তাঁর মিল ছিল,—'প্রেম' সম্বন্ধে তাঁর মন ভালো করে জেগে ওঠ্‌বার আগেই তিনি লোকান্তরিত হয়েছিলেন বটে,—কিন্তু অক্ষয় বড়ালের মতন তিনিও ছিলেন ব্রাউনিং-এর ভক্ত। শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে, অক্ষয় বড়ালের 'এষা' ও 'পান্থ' বই দুখানি যখন লেখা হয়, সেইসময়ে রবীন্দ্র-অনুগামীদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) প্রভৃতি কবিদলের অনুশীলন চলেছে। সেকালের রবীন্দ্র-বিরোধের কথা আগেই বলা হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' বইখানির মধ্যে এই বিরোধের কথাসূত্রে আরো সংগতভাবে 'রবীন্দ্রবিদ্বেষ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিদ্বেষের কথা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্র-বিরোধের প্রসঙ্গে কল্পসত্যবিমুখ, বস্তুসত্য-সচেতন, অন্য ভাবনার কথাই বিশেষ স্মরণীয়। গোবিন্দচন্দ্র দাস ছিলেন সেই অর্থে রবীন্দ্র-বিরোধী, প্রমথ চৌধুরীও সেই অর্থে,

এবং কুড়ির দশকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে সেই অর্থেই দুঃখবাদ, বিদ্রোহবাদ এবং শ্রমিক-কৃষক-দুঃখী মানুষের অন্তরঙ্গ ভাবাপ্লুত আত্মপ্রকাশ করেছিল। করুণানিধান প্রভৃতি প্রবীণদের রবীন্দ্রানুগামিতার মধ্যেও যথার্থ সবলতার এবং নিবিড়তার অভাব চোখে পড়ে। অক্ষয় বড়াল যেমন বিহারীলালের শিষ্য ছিলেন, করুণানিধান প্রভৃতি ঠিক ততোটা আনুগত্য পালন করে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী হন নি। রমণীমোহন ঘোষ, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাধাচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি আরো অনেকে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক আকুতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন,—শুধু তাঁরা কেন, সকলেই হয়েছেন,—কিন্তু বিশের শতকে বস্তুসত্যের দাবি ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্র-বরণ কতকটা অনিবার্য হলেও সেটা প্রধানত আনুষ্ঠানিক কৃত্রিমতায় এসে ঠেকেছিল। 'আত্মপরিচয়' এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন বিশেষ সত্তার বিশেষ 'প্রবর্তনা' বা 'স্বাভাবিকী বলক্রিয়া',—তাঁর নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সেই বিশেষ 'প্রবর্তনা' তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সমপরিমাণে আশা করা অন্যায়। কাজে-কাজেই সে যুগে রবীন্দ্রবরণের দলে যাঁরা রইলেন, তাঁরা রোম্যান্টিক মর্জির দিকে ঝুঁকলেন বটে, কিন্তু ঠিক মগ্ন হতে পারলেন না। শব্দে, প্রসঙ্গনির্বাচনে, সুরে এবং ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অনুকরণের দিন শুরু হলো। করুণা-নিধানের প্রসঙ্গ দিয়েই সে-পর্বের আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে।

১। 'নানা নিবন্ধ' (১৩৬০) দ্রষ্টব্য।

২। ঐ, পৃঃ ২৮১, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৫৫)

রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে প্রবীণতম কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জন্মস্থান শান্তিপুরের এবং পিতার কর্মস্থান পঞ্চকোটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেরণায় প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁর পিতা নৃসিংহচন্দ্র ছিলেন শিক্ষক। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী'-র, এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'বালক' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন নৃসিংহচন্দ্র। পিতার সাহিত্যপ্রীতি, বিবেকানন্দের জ্ঞান ও কর্মের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং প্রকৃতির রূপ-লাবণ্যের প্রভাব—এই চতুর্যোগের ফলে তাঁর কবিত্বের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল ১৮৯৬ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে। বেনোয়ারীলাল গোস্বামী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি সাহিত্যসেবকের আনুকূল্যে প্রথম জীবনের আর্থিক দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। 'বঙ্গমঙ্গল' (১৩০৮), 'প্রসাদী' (১৩১১), 'ঝরা ফুল' (১৩১৮), 'শান্তি-জল' (১৩২০), 'ধান-দূর্বা' (১৩২৮), 'শতনরী' (১৩৩৭—হেমচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত ; ১৩৫৫—কালিদাস রায় সম্পাদিত) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের কবি করুণানিধানের গুণগ্রাহী বন্ধু কালিদাস রায় 'শতনরী'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—'জাগ্রৎ সক্রিয় সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা যে মাধুরী লাভ করি—তাহাতে ক্লান্তি আসিলেই আমাদের অবসন্ন মন কিছুক্ষণ স্বপ্নমাধুরী উপভোগ করিয়া অলস আনন্দ পাইতে চায়। এই স্বপ্নমাধুরী আমরা কাব্যেও পাইতে পারি,—এই মাধুরী প্রধানত রূপে ফুটিয়াছে করুণানিধানের রচনায় আর 'ধ্বনিতে' ফুটিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়।' করুণানিধানের আর একজন অনুরাগী কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর ভাষা ও ছন্দের 'অমোঘ সৌষ্ঠবে'-র কথা উল্লেখ করেছেন,—শব্দ ও 'ছন্দগত রূপোল্লাস'-এরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর 'বাণী-সাধনা'র পরিচয়সূত্রে

মোহিতলাল ভাষার 'নির্মাণ কৌশলের তিনটি ভঙ্গি' লক্ষ্য করেছেন—'ফুলের ন্যায় কোমল নির্মল, পরিপক্ক ফলের ন্যায় নিটোল ও রসোচ্ছল এবং মণিগণের মত দৃঢ়সংহত দীপ্তিমান্।'

সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে তাঁর রীতিগত নৈকট্যের কথা ভিত্তিহীন নয়। আবার, মোহিতলাল তাঁর সম্বন্ধে ঐ যে বলেছিলেন, 'জন্ম হতে সঁপিল যে নিখিলের রূপ-নারায়ণে',—সে উক্তিটিও আগের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়,—'সঁপিল' ক্রিয়াপদটি সার্থক,—আংশিকভাবে হলেও করুণানিধানের প্রসঙ্গে সে কথা নিঃসন্দেহে সার্থক।

কিন্তু প্রকৃতির রূপসায়রে আত্মসমর্পণ করাটাই কবির মোক্ষ নয়। শুধু রূপ থেকে অরূপের অপরূপ স্তব্ধতায় ডুবে গেলে চলবে না। জগৎকে যথাসাধ্য ছুঁয়ে থাকা চাই। পাঠকের দেশ-কাল, রুচি-আদর্শ,—তার কানের আগ্রহ, মনের স্বভাব, যুগের বিশেষত্ব, জীবনের বোধ ইত্যাদি ব্যাপার তাঁর ধারণার মধ্যে থাকা চাই। অর্থাৎ রূপ দেখে, রূপে আত্মসমর্পণ করে, তাঁকে পুনরায় বেরিয়ে আসতে হবে পাঠকের পরিচিত শব্দ-অর্থ-ছন্দ-অলঙ্কার-এর জগতে। ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর উপলব্ধির বিস্ময় এবং বেদনা। এই ফিরিয়ে দেবার সামর্থ্য থেকেই দেখা যাবে তাঁর কবি-ক্ষমতার নিদর্শন!

তাঁর লেখার মধ্যে 'জ্যোসনা', 'অস্ফুট', 'অনুযোগের হাস্নুহেনা', 'আঁখিহীন', 'টুটে', 'উদ্ধারিলে' ইত্যাদি সাবেক কালের পদ্যঘেঁষা শব্দ ছড়িয়ে আছে প্রচুর পরিমাণে। বঙ্কিম, রমেন্দ্রসুন্দর, আশুতোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি মনীষীর নামে লেখা কবিতার সংখ্যাও কম নয়, এবং এইসব কবিতায় মৌলিকতাহীন কতকগুলি উক্তির ভিড় ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি আর কিছুই নেই। তবে, মাঝে মাঝে কিছু উৎকট মৌলিকতাও আছে। যেমন, নিচের দৃষ্টান্তটিতে—

পাসরি প্রাণের হাসি আছে যারা
মরমে মরিয়া,
জীবনের উপবন গেছে খর
কণ্টকে ভরিয়া,
জ্বালায়ে পঞ্জরতলে হিংসার
প্রলয়-হুতাশন—
ধূসর শ্মশান-মাঝে ঘেরে সদা
প্রেতের মতন
ডেকেছ তাদের তুমি, তারা যে
তোমার সহোদর,
হরষের সোম-রসে জুড়ায়েছ
বিশুষ্ক অধর।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পর্কে করুণানিধানের এই পদ্যাংশটি মসৃণ বটে, কিন্তু এতে শিল্পগত তেমন কোনো সমৃদ্ধি বা উপলব্ধির বিশেষ কোনো সম্পদ ধরা দেয়নি। এই কবিতাতেই 'মায়া-কন্দুক', 'প্রেম-চন্দ্রকান্ত-প্রভা', 'পূর্ণ দধি-সমুদ্রের ঊর্মিশঙ্খ' ইত্যাদি ব্যাপার আছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হবার পরে করুণানিধান লিখেছিলেন—

বঙ্গবাণীর মণি-মন্দির স্বপ্নদ্রষ্টা যিনি
অজিত যাঁহার কীর্তিকলাপ তাঁরি পদরেখা চিনি'
তাঁহারি মতন হও মহাজন, পুরাও দেশের সাধ
প্রসন্ন তব ভাগ্য-দেবতা, পেয়েছ আশীর্বাদ।

স্পষ্টই দেখা যায়, এরকম রচনা উঁচুদরের কবিতার নমুনা নয়। যে-কোনো পদ্য-লেখকের পক্ষেই এরকম কথা লেখা দুঃসাধ্য নয়।

করুণানিধানের এই রকম টুক্‌রো টুক্‌রো রচনার কথা আলোচনা করে লাভ নেই ; কারণ, অল্পমূল্য কবিতা পূর্ণ আয়তনেও যেমন অসার্থক, খণ্ড নমুনাতেও তেমনি অধিকক্ষেত্রেই অপাঠ্য। কবিদের মধ্যেও অব্যবস্থিতচিত্ত কবি আছেন। করুণানিধানের রচনায় অব্যবস্থিত কবিচিত্তের উৎপাত কিছু কম নেই। তাঁর বর্ণনমূলক কবিতায় প্রসঙ্গের গতি আছে, কাহিনীমূলক রচনায় গল্পের বেগ না থাক্, তরঙ্গ আছে,—'চণ্ডীদাস', 'কুণাল-কাঞ্চন', 'বাদ্‌শাজাদী' প্রভৃতি লেখা কিছুকাল আগেও বাংলার কবিতানুরাগী পাঠকের অল্পবিস্তর সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু করুণানিধানের বিশেষ প্রবণতার লক্ষণ আছে অন্যত্র! কবিতার কলাকৌশলের কারিকুরির দিকে মাঝে-মাঝে তাঁর খুবই ঝোঁক দেখা গেছে। 'কুণাল-কাঞ্চন'-এ এক টুক্‌রো গান জুড়ে দেওয়া হয়েছে,—'শ্রীক্ষেত্রে' লেখাটিতে প্রথম দুই স্তবকের সঙ্গে পরবর্তী স্তবকগুলির ছন্দ-প্রবাহের এবং শব্দ-গুরুত্বের মসৃণ যোগ আছে বটে, কিন্তু এমন পরিপূর্ণ অভিধানসর্বস্বতার ঝোঁকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বোধ হয় পাঠকের দিকে এরকম শব্দ-সমারোহ নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হতেন! 'শ্রীক্ষেত্রে'র শুরুতেই শোনা গেল—

ভো মহার্ণব, নীল ভৈরব গর্জদ্ জলভঙ্গে,
দূর অম্বুদ-মন্দ্র সমান তুলিতেছ কার বন্দনা-গান ?
নক্তন্দিব উদ্বোধনের দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের ভক্ত কবি এই কবিতাতেই মধুসূদনের ভাষা (শুধু ভাষাতেই, মধুসূদনের সুরে নয়!) ব্যবহার করে বলেছেন—'ইন্দিরা আজি উরিবেন বুঝি কক্ষে অমৃতপাত্র!' 'তরলোজ্জ্বল ফেনিলোচ্ছল পন্নগফণ-নৃত্য', 'জগন্নিধান পুরুষোত্তম' ইত্যাদি গুরু বচনে, যথার্থ সূক্ষ্ম রুচিবান কাব্যামোদীর পক্ষে শ্রীক্ষেত্র হয়ে উঠেছে নিষিদ্ধ প্রদেশ! 'চিত্রকূটে'তেও ছন্দের রূপগত কারিকুরি আছে। 'বসন্ত-অভিসার'-এ

আছে হলন্ত ধ্বনির সমারোহ। অন্তরাবেগের প্রকৃতির সঙ্গে সর্বত্র শব্দের সঙ্গতি রক্ষার শিল্পবোধ তাঁর ছিল না; একথা কিছু রূঢ় শোনায় বটে, কিন্তু কথাটা অমূলক নয়! 'শান্তিপুর' কবিতাটি এই কারণেই বিঘ্ন-কণ্টকিত শ্রুতিতর্পণের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে!

> তোর নীলাকাশ, তোরই বাতাস,
> তোর ফলে মা তোর জলে
> পড়ছে গলে আনন্দেরই ননী,
> তোর মরকত-রতন-বিথার বিচিত্র ওই শাদ্বলে
> গিইছি থুয়ে আমার চোখের মণি!

ফলে-জলে আনন্দের ননী গলে পড়ার ছবি তো ছবি নয়,—ভাবনা মাত্র! ভাষা ও ছন্দের 'অমোঘ সৌষ্ঠব' করুণানিধানের সর্বত্র যে চোখে পড়ে না, সেকথা নানা দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, এবং সেই সত্য প্রকাশের জন্যেই এইসব উদাহরণ দেওয়া হলো। তবে, মোহিতলাল তাঁর 'দ্বিপ্রহরে', বাসনা', হিমাদ্রি', 'রেবা' প্রভৃতি কবিতা থেকে পূর্বোক্ত 'সৌষ্ঠবে'র নিদর্শন দেখিয়েছেন। বস্তুত সেইসব দৃষ্টান্তেই করুনানিধানের শব্দ ও ছন্দগত রূপোল্লাসের পরিচয় আছে। মোহিতলাল তাঁর শব্দপ্রয়োগের আলোচনাসূত্রে শব্দের বর্ণ-গন্ধ-সুর, এই তিন উপাদানের কথা তুলে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'তাঁহার কাব্যে প্রধানত কোথাও প্রকৃতির রূপরাশি—শব্দচিত্রে, কোথাও বা সেই রূপ-সম্ভোগের আনন্দ—ছন্দলীলায়, উৎসারিত হইয়াছে!' বলা বাহুল্য, মোহিতলাল তাঁর সে মন্তব্যও নানা উদাহরণ দিয়ে সমর্থন করেছিলেন। কবিতার সমালোচনা সমালোচকের ভালো লাগার আন্তরিকতা থেকেই সম্ভব হয়! অর্থাৎ যে-কবিতা পাঠকের অন্তরে আবেদন জাগায়, সেই

কবিতা সম্পর্কেই ভাষা-ভাব-রীতি-কল ইত্যাদি নানাবিধ বিশ্লেষণের মেহনত পোষায়। করুণানিধানের কবিতাও আবেদনবাহী সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বত্র নয়। মোহিতলাল 'স্বপ্নলোকে' কবিতাটির বিশেষ প্রশংসা করেছেন। 'স্বপ্নরসের কবি' আখ্যা পেয়েছেন তিনি। কিন্তু পক্ষপাতহীন একালের মনে 'স্বপ্নলোকে' সত্যিই তেমন কোনো আবেদন জাগায় না। ফুল-অপ্সরী-জ্যোৎস্না-গিরিদরী-স্বপ্ন ইত্যাদির সমাবেশ ঘটলেই অনুভূতির একক বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় না। 'স্বপ্নরস' কথাটাই শ্রুতিমোহন। কিন্তু ও-কথার মর্মার্থের কোনো নির্দিষ্ট মূল্য আছে কি? কবিতা সার্থক হয় তখনই, যখন তা কান-মন দুয়েরই প্রসন্ন স্বীকৃতি লাভ করে,—যখন তার আবেদন স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়। এদিক থেকে বরং 'মোহিনী' কবিতাটি 'স্বপ্নলোকে'-র চেয়ে সার্থকতর। রবীন্দ্রনাথের 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' ('সোনার তরী') প্রভৃতি লেখার সঙ্গে করুণানিধানের তথাকথিত এই 'স্বপ্নরস' যদিচ প্রভাব-প্রভাবিত সম্পর্কে স্পষ্টই জড়িত, তবু 'রবীন্দ্রশিষ্য' নামে প্রসিদ্ধ, রবীন্দ্রকালীন কবিদের পক্ষে এ রকম অনুকরণ একেবারে অমার্জনীয় নয়, এবং 'মোহিনী' কবিতাটি মোটামুটি মন্দ হয়নি। কিন্তু অনুভূতির মৌলিকতা নেই এসব লেখাতে। বরং করুণানিধানের এ একরকম বিশেষ মর্জি বলা চলে;—সত্যেন্দ্রনাথের শব্দসম্মোহন এবং রবীন্দ্রনাথের নানা আকর্ষণ,—এই দুই প্রবল সত্যের মধ্যে নিজের সুসাধ্য অনুশীলনেই তিনি মন দিয়েছিলেন। শুধু তিনিই নন, নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে কেবল গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রমথ চৌধুরী এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া সকলেই অল্পবিস্তর সেই লক্ষ্যেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বরং কুমুদরঞ্জন মল্লিকই ছিলেন আর এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অজয়ের স্রোত আর উজানীর চর তাঁকে দুর্গের মতো আশ্রয় দিয়েছিল এবং তিনি তা মেনেও নিয়েছিলেন।

সমকালীন হলেও প্রমথ চৌধুরী ছিলেন প্রবীণতর ব্যক্তি এবং তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরই ভক্ত হিসেবে প্রসিদ্ধ।

এ বইয়ের ৫০-এর পৃষ্ঠায় প্রমথ চৌধুরীর দ্বিতীয় যে উদ্ধৃতিটি তুলে, দেওয়া হয়েছে, তাতে তথাকথিত 'স্বপ্নরস'-এর বিরুদ্ধে তিরস্কার আছে। তৎসত্ত্বেও স্বপ্ন-ঘেঁষা কবির কলম রোখা যায়নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ফুলের ফসল'-এ লিখেছিলেন—

এক যে আছে কুজ্ঝটিকার দেওয়াল-ঘেরা কেল্লা
মৌনমুখী সেথায় নাকি থাকে।
মন্ত্র পড়ে বাড়ায় কমায় জোনাক-পোকার জেল্লা
মন্ত্র পড়ে চাঁদকে সে রোজ ডাকে।
তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার
জান্‌লাতে দেয় পর্দা,
হুতোমপ্যাঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে,
ঝর্নাগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হয়ে জর্দা
জলতরঙ্গ বাজনা শোনায় তারে!

এতে স্বপ্ন আছে,—এবং এখানে মনোঘুড়ি বুঁদও হয়েছে বটে, কিন্তু কবি তাঁর লাটাই ছাড়েন নি। কবিকল্পনার রাশ বাগিয়ে ধরেছে কবির ভেতরের প্রজ্ঞাদৃষ্টি। শব্দের জাদু এবং ছন্দের কুহক কবির সত্যিকার অনুভূতিকে সমীহ করে সার্থক হয়েছে। করুণা-নিধানের 'স্বপ্নরস' কিন্তু অন্য জিনিস। মোহিতলাল তাঁর 'দ্বিপ্রহরে', 'বাসনা', 'হিমাদ্রি', 'রেবা', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' প্রভৃতি কবিতা থেকে রূপোল্লাসের দৃষ্টান্ত তুলে তাঁর শব্দের এবং ছন্দের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। সেসব উদাহরণ সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ করা এ-আলোচনার লক্ষ্য নয়। এখানে এইটুকুই বক্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথের

পূর্বোক্ত কবিতাগুলির পাশে, কিংবা সত্যেন দত্তের এই ধরনের কবিতার পাশে সেসব রচনার স্বাতন্ত্র্য সত্যিই ঝাপ্সা হয়ে যায়।

সেকালের কবিরা কখনো এগিয়েছেন রবীন্দ্রভাবনার বিভ্রান্ত অনুকরণে, কখনো তাঁরা আবার বেশি আবিষ্ট বোধ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ-ছন্দ-কলাকৌশলের টানে। মাঝে-মাঝে পুরোনো কালের বৈষ্ণব কবিতা তাঁদের কা'রও-কা'রও কলমে ভর করেছে, আবার দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমথ চৌধুরীর দল হাস্যে-পরিহাসে-কটাক্ষে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। কিন্তু মৌলিক অনুভূতির জন্যে যে মৌলিক মনন, উদ্ভাবন, উপলব্ধির দরকার, সে-পর্বের রবীন্দ্রেতর কবিদের সামাজিক-পারিবারিক-ব্যক্তিগত অস্তিত্বে সে আয়োজন ছিল না। করুণানিধানের সম্বন্ধেও সেকথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। ফলে, তাঁর বহু-আলোচিত 'স্বপ্নরসের' কবিতাগুলিও অব্যবস্থিত কল্পনার দৌরাত্ম্য এড়িয়ে যেতে পারেনি। এইসূত্রে দেবেন্দ্রনাথ সেনের কথা তোলা যেতে পারে। 'শ্রী Robin Goodfellow'-স্বাক্ষরে তিনি তাঁর 'গোলাপগুচ্ছের' 'হারজিৎ' কবিতার নিচে মন্তব্য করেছিলেন—'বঙ্গের নবীন কবিদিগের যিনি শিরোমণি ও নেতা, তাঁহার লেখার অনুকরণে এই কবিতাটি লিখিয়াছি। কিন্তু অনেকের দশা যাহা হইয়াছে আমারও তাহাই হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার কবিতাটিতে অর্থের নামগন্ধ নাই; মাখাল ফল—শূন্য কলসি।'

অনুকরণ ও অব্যবস্থিত ভাবনার প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে করুণা-নিধানের সহজ প্রবণতার অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, কবিতায় নিরালা প্রকৃতির কথাই তিনি বলতে ভালোবাসতেন। বকুল, শিউলি, শ্যামা, দোয়েল,—মাঠের কোণ, নদীর ভাঙন প্রভৃতি নৈসর্গিক প্রসঙ্গে তাঁর আগ্রহ ছিল। 'বনের কোণে' কবিতাটিতে তিনি বলেছিলেন—

এইখানে এই অনেক দূরে পথ ভুলিনু তার নূপুরে,
সুনয়নীর মনোমণির চিরগোপন ইশারাতে !

'ঢুম্‌কারাণী'-তে তিনি আবার বলেছিলেন—

চির-যুগের কান্তা আমার, প্রাণ-প্রতিমা, বাঞ্ছিতা,
চিনি তোমার সীঁথির মণি, শিথিল বেণীর নীল ফিতা।

এবং নিসর্গসৌন্দর্যের এ-রকম আরো অনেক স্বীকৃতি তাঁর নানান্‌ লেখাতে ছড়িয়ে আছে। আর, প্রকৃতির ফুল-পাখি-নদী-বন-পাহাড়ের রূপ প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক-একটি নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। শান্তিপুর এবং পঞ্চকোট মিলে-মিশে একাকার হয়ে রম্যতা সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু ধরণীর নির্দিষ্ট কোনো আঞ্চলিক শোভা বলা যায়না তাকে। সেই নদী-বন-মাঠের পটে যে নারীমূর্তি দেখা দিয়েছেন, তিনিও কল্পলোকের তিলোত্তমা,—কখনো বালিকা, কখনো যুবতী,—'আব্‌ছায়া সে বেড়ায় ঘুরে ডাক দিয়ে যায় চেনা সুরে', এবং—

দু'টি কালো আঁখির কটাক্ষে সে পূর্ণিমাকে ভুলিয়েছে,
ঘাটে জল-ভরনে মৌ-যমুনা গুলিয়েছে।

অবশ্য করুণানিধানের সে-মর্জিও স্থায়ী নয়। এও দেখা যায় যে, প্রকৃতির প্রসঙ্গে এগিয়ে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতন নানা তথ্যের তালিকা তৈরি করবার খেয়ালও ছিল তাঁর; যেমন 'শান্তিপুর' লেখাটিতে। হরিদ্বার, বৃন্দাবন, দেওঘর দেখেও তিনি তালিকা বেঁধেছেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে তাঁর মনে এই আর-এক রকম মর্জি দেখা দিতো। সেই মর্জির বশেই ঝাপসা কল্পদৃশ্যের পটে ফুটে উঠেছে ঝাপসা এক পটেশ্বরীর মূর্তি! কবির চোখের সামনে তিনি যেন চকিতে ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেছেন! পঞ্চকোটের শালবন, আর, রাঙা মাটি তিনি বরং স্পষ্ট চোখে দেখেছেন,—শান্তিপুরের স্থানমাহাত্ম্যও

তাঁর সজ্ঞান স্মরণের সামগ্রী,—কিন্তু এই অনন্যা তাঁর গভীর মনের বাঞ্ছিতা! তাঁর প্রকৃতি-কাব্যের এই রোম্যান্টিক ভাবস্পন্দনের দিকটি ভোল্‌বার নয়! তাঁর সাধনায় ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু কবিতার যিনি অদৃশ্য সিদ্ধিদাতা, তিনি বহুজনের বহু সাধনার সমন্বয় থেকেই বিশেষ বিস্ময়ের এক-একটি ঢেউ তুলে থাকেন। তাঁর চোখে শুধু সমগ্রতার স্বীকৃতি। বিশের শতকে রবীন্দ্রনাথের কীর্তিতেই আমাদের কাব্যলোকে সেরকম সমগ্রতা দেখা গিয়েছিল। আর সমকালীন রবীন্দ্র-শিষ্যদের কৃতিত্ব বা সার্থকতা ঘটেছিল বিশেষ-বিশেষ মর্জিতে, কৌশলে, ভঙ্গিতে! মর্জির বিচারে করুণানিধান ছিলেন ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক মনোভঙ্গির সঙ্গমভূমির কবি। একদিকে রবীন্দ্রনাথ,—অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমথচৌধুরী-সত্যেন্দ্রনাথের নানাবিধ সাধনার ধারা,—করুণানিধানের মধ্যে এইসব আকর্ষণের সজ্ঞান স্বীকৃতি আছে।

তাঁর শব্দের বিচিত্রতা এবং ছন্দের সহজ সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়; তাঁর 'বাদ্‌শাজাদী' বা 'অরফিউস ও ইউরিডিস্' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে আখ্যানবর্ণনার সামর্থ্য আছে,—'লুকোনো ছবি', 'পত্রপাঠ' প্রভৃতিতে আছে গার্হস্থ্য প্রণয়রসের নিবিড়তা। 'কৃত্তিবাস', 'রাজা রামমোহন', 'মধু-প্রশস্তি', 'জয়দেব' ইত্যাদি রচনায় তিনি মনীষীবন্দনা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল অনেকগুলি কবিতায় ('রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে', 'রবীন্দ্র-প্রয়াণে');—কল্পমায়ামুগ্ধ, ভাববিলাসী রোম্যান্টিক মনের সহস্র আকাঙ্ক্ষার শেষ-প্রহরে তিনি যেন অক্ষয় বড়ালের মতনই বিষাদে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বিহারীলালের মতন অনির্বাণ যোগমত্তা তাঁর স্বপ্নাবেশের বিশেষত্ব নয়। রবীন্দ্রনাথও নিষ্ফলতাবোধ এড়িয়ে থাকতে পারেন নি,—যদিও প্রথম যৌবনেই সে বোধ তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আশা, বিশ্বাস, প্রেম, এবং

মৃত্যুহীনতার কথাই তিনি বলে গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-শিষ্যদের রোম্যান্টিক আকুলতার বিশেষ বিষণ্ণ সুরটি শোনা গেল করুণানিধানের আর-এক শ্রেণীর কবিতায়। তখন, 'চেনা মানুষ বদ্‌লে গেছে, নাই সে চোখের চাওয়া';—তাঁর 'নিষ্ফল', 'ব্যর্থ', 'তোমার প্রতি', 'শেষ' ইত্যাদি কবিতার মধ্যে যে-অনুভূতি ফুটেছে, তাকে 'স্বপ্নরস' বলা সঙ্গত নয়,—নিঃসন্দেহে সে-রসের নাম করুণরস! বিশ্বের দিন-রাত্রির স্রোতে-অনেক জোয়ার-ভাঁটার অনেক অভিজ্ঞতার শেষে তাঁর প্রথম যুগের স্বপ্নলোক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। 'উদ্দেশে' কবিতাটির শেষ দু'লাইনে তিনি বলেছিলেন বটে—'বজ্রও যাঁর, বংশীও তাঁর—বুঝিয়াছি এই শেষবেলায়'; কিন্তু 'ক্ষ্যাপার গান'-এতে তাঁর বাস্তব-অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ মনের একরকম তিক্ততাই প্রকাশিত হয়েছে। তখন—

সোনার থালা গিনির মালা ভালবাসার ভাণ
অভিনয়ের উৎপাতে হায় বিষিয়ে গেছে প্রাণ।

তখন—

ডাক দিয়েছে কর্মনাশা টুট্‌লো গুমর উঠল বাসা
মর্ত্যভূমির কুম্ভ-মেলায় সন্ন্যাসী গান গায়।

জীবনের বহুক্ষতচিহ্নিত সেই প্রহরে, তিনি যেন গার্হস্থ্য প্রণয়রসের কবি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, কিরণধন ইত্যাদির গোষ্ঠী পরিত্যাগ করে, দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। 'ক্ষ্যাপার গান' তাঁর সেই অবস্থার রচনা। 'মরীচিকা' নাম দিয়ে তিনিও একটি কবিতা লিখে গেছেন, এবং সে কবিতায় তাঁর পূর্ব-পর্বের প্রিয় শব্দের সমারোহ নেই,—'কেলি-কদম্ব', 'মরম-মিত্র,' 'প্রাণ-বঁধুয়া' (চণ্ডীদাস' দ্রষ্টব্য), 'সোহাগ-বেণী' ('বসন্ত-অভিসার' দ্রষ্টব্য), 'কাঞ্চনী শিখা', 'তুরন্ত স্রোত' ('দিনান্ত মেঘ' দ্রষ্টব্য), 'ধ্যান-সাগর' ('তন্দ্রাপথে' দ্রষ্টব্য)

ইত্যাদি শব্দ পরিত্যাগ করে 'মরীচিকা'-তে তিনি যতীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলে গেছেন—

হোলির ফাগে আগুন লাগে
গিল্‌টি ছুটে ধরা পড়ে মেকি,
টোপের মাঝে বঁড়শী বাজে একি!

রবীন্দ্র-অনুগামীদের স্বপ্নবিলাসের এই ছিল সাধারণ ইতিহাস, —তার আদিতে সুখাবেশ, অন্তে 'আফ্‌শোষ'। করুণানিধানের সমসাময়িক যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মধ্যেও তাই-ই দেখা যায়। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন তবু ছিলেন স্বতন্ত্র সত্তা। তিনি সে যুগের স্বপ্ন-প্রবণদের মধ্যেও পৃথক ব্যক্তিত্বময় কবি হিসেবে সমাদরণীয়।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮—১৯৪৮)

'নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশ' ব্যাপারে করুণানিধানের অক্ষমতার কথা তাঁর ভক্ত সমালোচক মোহিতলালও স্বীকার করেছিলেন। 'বাদশাজাদী' কবিতাটির উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছিলেন—'তিনটি গাথার মধ্যে এইটির মধ্যেই নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশের অবকাশ ছিল। এ কাহিনীকে চিত্ররূপে আয়ত্ত করা যায় না। ইহার মধ্যে ঘটনা পরম্পরার গতিবেগ কবির রূপসম্ভোগস্পৃহাকে যেন বারবার ব্যাহত করিয়া ছন্দকে আরও বেগবান করিয়াছে।'

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতাতেও রূপসম্ভোগস্পৃহারই প্রাধান্য চোখে পড়ে। দ্বিতীয়ত, করুণানিধানের 'হরিদ্বার', 'হিমাদ্রি,' 'শ্রীক্ষেত্র' প্রভৃতি রচনা সম্বন্ধে মোহিতলাল আবার ঐ যে বলেছিলেন 'তীর্থমাহাত্ম্যই তাঁহার সৌন্দর্যানুভূতিকে খর্ব করিয়াছে',—এবং 'ওয়ালটেয়ার'-এর মধ্যে তিনি যেমন 'পুরাণ-কথার আকস্মিক অবতারণায়' 'প্রকৃতি-প্রেমের' রসভঙ্গ লক্ষ্য করেছিলেন, যতীন্দ্র-

মোহনের মধ্যেও 'ভারতী'-দলের কবিদের এই সামান্য-স্বভাবেরই উদাহরণ পাওয়া যায়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮৮৪) সম্পাদনায় 'ভারতী'-র (১৩২২-৩০) আধুনিকতর পর্বের আগে, ১৩১৬ থেকে ১৩২১ পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন সে-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৮৭৩-১৯২৭), করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১), মোহিতলাল, কালিদাস রায়, হেমেন্দ্রকুমার, হেমেন্দ্রলাল ইত্যাদি সেকালের রবীন্দ্রভক্তেরা ছিলেন 'ভারতী'র গোষ্ঠীভুক্ত কবি। এঁদের সকলের মধ্যেই তথাকথিত 'রূপসম্ভোগস্পৃহা' একটু বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল; সেই সঙ্গে কোথাও বা পুরাণকথার, কোথাও বা তথ্য-তালিকার অবাঞ্ছিত উপদ্রবও এঁরা পরিহার করতে পারেন নি। একা করুণানিধানেই নয়, 'ভারতী'র মধ্যমণি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,—'ভারতী', 'প্রবাসী' এবং 'কল্লোল'-এর (প্রথম প্রকাশ ১৩৩০) মোহিতলাল মজুমদার,—'ভারতীর'ই অন্যতম, কালিদাস রায়,—'প্রবাসী'র শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি সে-পর্বের খ্যাত-অখ্যাত অনেক কবির মধ্যে ঐ সব লক্ষণ বার-বার দেখা গেছে। 'পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ' কথা দুটির ওপর মোহিতলালের খুবই ঝোঁক ছিল। কিন্তু বাংলা কবিতায় সর্বেন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার স্বাদ রবীন্দ্রনাথই যে সবচেয়ে বেশি দিয়ে গেছেন, সেকথা বলা বাহুল্য; দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অক্ষয়কুমার বড়ালও তাঁদের সাধ্যানুসারে দিয়েছেন। এবং ব্যাপক অর্থে, সে স্পৃহা সব কবিরই আদর্শ।

সুতরাং জগৎকে দেখবার অন্য কোনো স্বকীয় ভঙ্গি যাঁদের নেই, ভক্ত পাঠক তাঁদের সম্বন্ধেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপদ্যুতি, রূপসম্ভোগস্পৃহা, শব্দসমারোহ, ছন্দ-ক্ষমতা ইত্যাদি প্রশংসার কথা

বলে নিজের প্রীতির মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু মহাকালের সম্মার্জনীর আঘাত ভালো-মন্দ সকলকেই সহ্য করতে হয়। যা থাকবার, মহাকালকে হারিয়ে দিয়ে, তবেই তা থাকতে পায়! রবীন্দ্র-যুগের 'ভারতী', 'কল্লোল', 'পরিচয়', 'কবিতা' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার মাহাত্ম্যে সম্মোহিত পাঠক, সমালোচক এবং কবির দল বিশেষ-বিশেষ কবিতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ-বিশেষ ধারণায় বিশ্বাসী। এই পর্বের সমালোচনায় যতীন্দ্রমোহনের সম্বন্ধে 'পল্লীবাসী খাঁটি বাঙালীর ভাষা', 'বাঙালীর গার্হস্থ্য ইমোশনের আনুগত্য', 'ভাবার বিশুদ্ধতা ও মাধুর্য' ইত্যাদি লক্ষণের কথা শোনা যায়। 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী', 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি পত্রিকায় যতীন্দ্রমোহনের 'রেখা'-র (১৩১৭) কবিতাগুলি ছাপা হয়েছিল। তার আগে বেরিয়েছে তাঁর 'লেখা' (১৩১৩); সে বইয়ের কয়েকটি কবিতা 'বঙ্গদর্শন'-এ এবং 'সাহিত্য' পত্রিকাতে ছাপা হয়েছিল। সতীশচন্দ্র সে যুগের একনিষ্ঠ, রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে তরুণতম ছিলেন বলেই তাঁর কথা আগে বলা হয়েছে। আর, যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সে কালের প্রধানতম রবীন্দ্রশিষ্য! তাঁর প্রথম বই 'লেখা'র কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজে দেখে দিয়েছিলেন। 'লেখা'-র গানগুলিতে সুর-সংযোগ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নামে। চৌরঙ্গীর হপ্ সিং কোম্পানির ছবির দোকানের ওপর-তলার ঘরে যখন 'মানসী' (১৩১৬-১৭ থেকে যতীন্দ্রমোহন সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন) পত্রিকার কাজ চলতো, তখন ব্যঙ্গরসিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে একদিন বলেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথের দুটি she, এক প্রবা-সী আর দুই, তোমাদের মানসী!' 'মানসী'-ছাড়া, যতীন্দ্রমোহন 'যমুনা' পত্রিকাতেও কিছুকাল সম্পাদকের কাজ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসের 'মালঞ্চ'

বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণের সংস্কারের কাজ করে দিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশপূর্তি উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে যে সংবর্ধনা সভা হয়, তার উদ্যোক্তাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম।

'লেখা'-তে 'গৃহিণীহীন শ্বশুরালয়ে' রচনাটির মধ্যে 'মানসী'-র 'নববঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান', দুয়েরই প্রতিধ্বনি আছে,—টেনিসনের অনুবাদ-কবিতা 'তবু কত না মধুর'-এর মধ্যে 'ভানুসিংহের পদাবলী'র 'মরণ'-এর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে; আবার 'রূপতৃষ্ণা' নামে আর একটি কবিতায় পূর্বালোচিত রূপসম্ভোগের স্পৃহাও ধ্বনিত হয়েছে; তিনি বলেছিলেন—'মাস গেল, বর্ষ গেল, যুগ গেল বহি'—'হৃদয়ের তৃষ্ণা মোর, মিটিল সে কই?'

যতীন্দ্রমোহনও ছিলেন রূপতৃষ্ণার কবি। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা'-র বহু ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে এগুতে-এগুতে 'লেখা'-র শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে তাঁর জ্ঞানী মনের একটি বেদনার উক্তি চোখে পড়ে—

তুলিটি তুলিয়া আজি ভাবি বসে হায়,
লিখিনু এ লেখা বুঝি বালির বেলায়!

সে-যুগের প্রধানতম রবীন্দ্রশিষ্যের এই মনোভাবের সঙ্গে এ-কালের প্রবীণ রবীন্দ্রশিষ্য কানাই সামন্ত-র 'নীরঞ্জনা' (১৩৬১) বইখানির ভূমিকার ক'টি লাইন এবং শেষ কবিতা 'শেষ কথা' মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। ১৩৩৬ সালে লেখা এই 'শেষ কথা'-তে কানাই সামন্ত বলেছিলেন—

স্বপ্ন তো হল না সত্য! হে বন্ধু, জানি না
আবার গড়িবে কিনা লীলাচ্ছলে ভুলি
লবণজলধি হতে নুনের পুতুলি।

ও-কথা শুধু এঁদেরই জীবনবোধের প্রসঙ্গে নয়, পৃথিবীর সব শিল্পের সব শিল্পীরই আপন-কথা। দ্বিজেন্দ্রলাল তো সেই কথাই বলেছিলেন—'করেছি কর্তব্য যাহা, সেইটুকুই আমার যাহা জমা'!

পূর্বগামীদের সুরে সুর মিলিয়ে যতীন্দ্রমোহন তাঁর 'লেখা'-র কয়েকটি রচনায় নারী-সৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন। 'স্বীকার'-কবিতার প্রথম লাইনেই অক্ষয় বড়াল এবং দেবেন্দ্রনাথ, উভয়েরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—'রমণিরে, সত্য বলি আমি তোর সৌন্দর্যের দাস'! তারপর—

> বেড়িয়া তনুটি তোর নিশিদিন চিত্ত মোর দুলে—
> বাসনার প্রজাপতি আত্মহারা সৌন্দর্যের ফুলে!
> বসন্ত যেমন আসে—কলকণ্ঠে গেয়ে উঠে পাখি;
> জীবনে বসন্ত এলে চঞ্চল হইয়া উঠে আঁখি!

'সৌন্দর্যের বাসা'-তেও রমণীর রূপলাবণ্যের কথা শোনা যায়—

> বৈজ্ঞানিক বলে—তার বাস সুসম্বদ্ধ দেহের গঠনে;
> দার্শনিক বলে—তাহা নয়, নিশ্চয় সে মানবের মনে;
> কবি কহে—অত নাহি বুঝি, কথা এই খেয়ালের ঝোঁকে:
> —দরিদ্রের ধ্রুব এ বিশ্বাস, সৌন্দর্য—সে প্রেমিকের চোখে!

সে-কালের রবীন্দ্রানুগামী কবিদেরই অন্যতম, রজনীকান্ত সেন তাঁর দেশপ্রেম এবং হাস্য-কৌতুকের কবিতায় যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে পড়েছিলেন,—তাঁর ভক্তির কবিতাতে তেমনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও সুর মিশে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র আদর্শে তিনি লিখেছিলেন 'অমৃত',—প্রিয়ম্বদা দেবী লিখেছিলেন 'পত্রলেখা',—তারপর, কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখেছিলেন 'শতদল'।

রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' (১৩৩৪) বইখানির মধ্যে প্রিয়ম্বদার সাড়ে-

পাঁচটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের লেখা মনে করে ছাপানো হয়েছিল,—গুরুর সুর তখন শিষ্যদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। 'ক্ষণিকা' পড়ে সতীশচন্দ্র রায় ঠিক এই কথাই লিখেছিলেন—'বাস্তবিক পড়িয়া পড়িয়া এতদিনে 'ক্ষণিকা' আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে।' সেযুগে রবীন্দ্রনাথের উপমা-উৎপ্রেক্ষার, প্রসঙ্গের, শব্দবৈশিষ্ট্যের,—এমন কি, গ্রন্থনামেরও কতো যে অনুকরণ হয়েছে, সেকথা বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে অকারণে বইয়ের আয়তন বেড়ে যাবে। যতীন্দ্রমোহনের সম্বন্ধেও সেযুগের এই সামান্য-লক্ষণের কথা স্মরণীয়।

রজনীকান্তের মৃত্যু হয়েছিল ১৩১৭ সালে। সেই বছরেই যতীন্দ্রমোহনের 'রেখা' ছাপা হয়। তাতে রজনীকান্তের বিষয়ে পর-পর দুটি কবিতা ছিল, এবং সে-বই উৎসর্গ করা হয়েছিল যতীন্দ্রমোহনের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর নামে। সে-বইয়ের 'প্রেম' কবিতাটির মধ্যে পরিণততর শক্তির পরিচয় ছিল।

সে কোন্ পরমস্পর্শে পুলকে পূরিয়া উঠে তনু ;
মরমের শরবন কেঁপে উঠে থর থর করি !

—এই ছবিটির মধ্যে রূপকের নতুনত্বের সঙ্গে ধ্বনির আবেদনের চমৎকার সমন্বয় দেখা গেল। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রেতর কবিদের বস্তুস্বীকৃতির ভাবটিও এতে অনুক্ত থাকেনি—

এ জীবনে যেবা যারে প্রাণ ভরি ভালবাসিয়াছে—
উচ্চে হোক্ তুচ্ছে হোক্, দূরে কিংবা হোক্ তাহা কাছে,
পাত্রে বা অপাত্রে হোক্—প্রেমেই প্রেমের সার্থকতা ;
বিশ্বজয়ী প্রেম কভু বিশ্বমাঝে জানেনা ব্যর্থতা।

—এই উদ্ধৃতির শেষ লাইনটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি একটু বেশি শোনা গেলেও কবিতার পরের অংশটুকু ঠিক প্রতিধ্বনিমাত্র নয়, তাতে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত বিবরণ আছে—

তাই আজি মনে হয়, এ জীবনে হারায়েছি যারে,
অদ্ভুত সমাজনীতি শতলক্ষ অদ্ভুত আচারে
ঘিরিয়া রেখেছে যারে মায়াবীর মন্ত্র-গণ্ডী দিয়া—
ধূলার সে মায়া-গণ্ডী একদিন যাবে সে টুটিয়া।
একদিন পাব তারে স্বর্গ যদি সত্য কভু হয়—
নিশ্চয় সে পাব তারে মৃত্যুহীন জানি যে প্রণয়।
সমাজ বৃহৎ হোক জগৎ বৃহৎ তারো চেয়ে;
অনন্ত জগৎ শুধু অনন্ত—সে প্রেম রত্ন পেয়ে!

এ তো শুধু 'মানসী'-র 'অনন্ত প্রেম'-এর (রচনাকাল, ১২৯৬) নিখিল বিরহ-মিলন-কথার অসার অনুকরণ মাত্র নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ঠাট্টার আঘাতে, প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিবাদিতার প্রহারে, এবং রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ভাবমোক্ষবাদের ফলে সমাজ-সংসার-সচেতন প্রেমের আকৃতি যখন অন্যান্য পুরুষকবিদের দুর্বল ভাবালুতায় এবং মহিলা-কবিদের স্বাতন্ত্র্যহীন তারল্যে নির্বাসিত হয়ে ক্রমশ বড়োই কৃপার সামগ্রী হয়ে উঠ্‌ছিল, সেই সময়ে, জগতের মাটি ছুঁয়ে থেকেও সামাজিক বাধাবিপত্তির মধ্যে অকৃতার্থ প্রেমের পরম সার্থকতা উপলব্ধি করা, এবং সেই উপলব্ধিকে প্রতিদিনের অভ্যস্ত ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত করা কম সবলতার কাজ ছিলনা! 'কড়ি ও কোমল'-এর সুরে নয়,—'মানসী'র 'অনন্ত প্রেম'-এর সুরেও নয়, 'বর্ষার দিনে'-র সুরেও নয়,—অক্ষয় বড়ালের বিষাদের প্রভাব পরিহার করে,—দেবেন্দ্রনাথ সেনের মধুর মসৃণতার অনুকরণ না-করে, যতীন্দ্রমোহন যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটি এতদিন সমালোচকদের চোখ এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়! তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে করুণানিধান, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ইত্যাদি কারো লেখাতেই ঠিক এই ভঙ্গিটি পাওয়া যায় না। মোহিতলালের 'স্বপন-পসারী', 'স্মরগরল' ইত্যাদির

প্রেমানুধ্যানে উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা এবং সমারোহ বেশি; সেখানে যতীন্দ্রমোহনের এই গাম্ভীর্য নেই, দৃঢ়তা নেই, শান্ত প্রত্যয় নেই। বরং রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'-র অন্তিম প্রত্যয়ের সঙ্গেই যতীন্দ্রমোহনের 'লেখা'-র এই প্রেম-প্রত্যয়ের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সে-বিশ্বাসের যে কথা আরো অনেক ভালোভাবে বলেছিলেন, তাও বলা বাহুল্য। তবু যতীন্দ্রমোহনের ঐ কবিতাটির শেষ দুই স্তবকের সঙ্গে একালের পাঠকের মনে ভেসে ওঠে রবীন্দ্রনাথেরই কথা—

প্রেমের অসীম মূল্য
সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দস্যু নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহা-গহ্বরেতে
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।

'নাগকেশর' (১৩২৪)-এর 'স্বপ্নরাণী'-তে যতীন্দ্রমোহন জানিয়েছিলেন—

মনের বনের গহন কোণে
আছে সে এক দেশ
স্বপনরাণী থাকেন সেথায়
মেঘের মত কেশ;

কিন্তু শুধু এইটুকু বলেই তিনি যদি চুপ করে যেতেন, তাহলে সে প্রসঙ্গ এখানে তোলবার দরকার হতো না। 'ভারতী'-পর্বের কবিদের স্বপ্নপ্রবণতার একটা কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় তাঁর সেই লেখাটিতে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'-র যে প্রত্যয়ের কথা বলা হলো, সেটি কিন্তু তার বিপরীত ব্যাপার। 'স্বপ্নরাণী'-তে তিনি বলেছিলেন—

জ্ঞানই যখন অজ্ঞানাধিক
আলোর বেশি কালো,
সত্য যখন মিথ্যা এত,
স্বপ্ন, সেত ভালো।

এরই নাম সজ্ঞান অপসরণ!

তাঁর ভাষার দক্ষতার কথা অনেকেই বলেছেন। ময়মনসিংহ-গীতিকার প্রভাবে জসীমউদ্দীন প্রভৃতির পল্লীকবিতার রেওয়াজ শুরু হবার আগে করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কালিদাস রায় প্রভৃতি 'ভারতী'-দলের কবিরা, এবং তাঁদের মধ্যে আবার বিশেষভাবে কুমুদরঞ্জন মল্লিকই পল্লীপ্রসঙ্গের বেশি চর্চা করেছিলেন। শতাব্দীর প্রথম দশকেই যতীন্দ্রমোহনের 'চাষার মেয়ের গান', 'মাছধরা' 'জেলের মেয়ে' ইত্যাদি রচনা ছাপা হয়েছিল। তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা 'দিদি-হারা'ও ('বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—') 'লেখা'তেই ছাপা হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল প্রভৃতি হাফিজ-ভক্ত কবিদের মতন তিনিও লিখেছিলেন 'সাকি ও সরাব'। হয়তো আজ আমাদের সমাজ-জীবনের অন্যমনস্কতার ফলেই যতীন্দ্রমোহনের সে-কবিতা কিংবা, কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' আমরা প্রায় ভুলে গেছি। নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর তুলনায় কান্তিচন্দ্রের অনুবাদের স্বাদ যে নিবিড়তর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; যতীন্দ্রমোহনের 'সাকি ও সরাব'-এর লাইনগুলিও ভোল্‌বার নয়—

তুলো না ভাগ্যের কথা, বীণাযন্ত্রে হান অন্য সুর,
কর স্তব সিরাজের স্বচ্ছশোভা সুবর্ণ শীধুর;
চলুক সুগন্ধগীত, কুসুমের উঠুক বন্দন—
সত্য কি অলীক সব, জীবন কি অরণ্যে ক্রন্দন!

গাহ প্রণয়ের গীত, মজি' রহ আনন্দ-পাথারে,
কি হবে খুঁজিয়া মিছে রহস্যের অজ্ঞাত আঁধারে ?

'ভারতী'-পর্বের রবীন্দ্রেতর কবিকৃতির অন্যতম নিদর্শন হিসেবে কান্তিচন্দ্রের অনুবাদের কয়েক ছত্র এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে—

ভবিষ্যতের জালটা বোনা উর্ণনাভের মত,
ঠিক দিয়ে তার টানা পোড়েন্ বুদ্ধি খরচ কত !
সমস্তটাই সরল—শুধু একটু বুঝতে বাকী—
নিঃশ্বাসে যা' নিচ্ছ টেনে প্রশ্বাসে তা ফাঁকি !—৫৩

অনুবাদের দিকে সে সময়ের কবিদের ছিল বিশেষ আগ্রহ। সে কাজে সত্যেন্দ্রনাথ একা ছিলেন না,—তাঁর সহব্রতীর সংখ্যাও কম ছিল না। শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস প্রভৃতি কবির রচনা থেকেও যেমন অনুবাদ হয়েছে,—শেলি, টেনিসন্, ব্রাউনিং ও শ্রীমতী ব্রাউনিং, বাডস্বার্থ, কীট্‌স্ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য কবির রচনা থেকেও অনুবাদ-চর্চার তেমনি বহুলতা দেখা গেছে। আবার, হাফিজ, ওমরখৈয়াম, রুমি প্রভৃতি ফার্শি কবিদেরও প্রচুর অনুবাদ হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে ঐসব বিদেশী কবির কবিত্বের দিকে চোখ পড়েছিল বলেই অনুবাদকরা কাজে এগিয়েছিলেন। একালের মর্জি কিন্তু অন্য রকম ; র‍্যাঁবো, বদলেয়ার, লরেন্স, এলিয়ট্, মিস্ত্রাল, হাইনে, নাজিম হিক্‌মত এবং আরো কোনো-কোনো কবি বাংলাতে অল্প পরিমাণে অনূদিত হয়েছেন বটে, কিন্তু অনুবাদের সেই ব্যাপক ঝোঁক এখন আর নেই। সে যুগে ওমরখৈয়াম, সাদি, হাফিজ, রুমি ইত্যাদি ফার্শি কবির বিশেষ আকর্ষণ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়েছিলেন 'ভারতী'র কবিরা। 'সবুজ পত্রের' প্রমথ চৌধুরীও যথাসাধ্য করেছেন। 'কল্লোল'-'পরিচয়'-'কবিতা'-র যুগে আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে অনুবাদের দিকটা পরিমাণে কম্‌লেও, গুণে বোধ হয়

বেড়েছে। প্রমথনাথ বিশীর 'প্রাচীন পারসীক হইতে' নামকরণে হয়তো সেই 'ভারতী'-পর্বেরই প্রবণতার রেশ রয়ে গেছে,—তবে, তিনি সত্যিই প্রাচীন পারসীক ভাবনার অনুবাদক নন, তাঁর 'প্রাচীন আসামী হইতে' যেমন তাঁরই প্রণয়-কবিতার মালা,—অন্য নামটিও তেমনি আত্মগোপনের ছল মাত্র! কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'-এর প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি ছাপা হয়েছিল (২৯ শ্রাবণ ১৩২৬), এবং প্রমথ চৌধুরী সেই বইখানির জন্যে যে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, সেই দুটি রচনাই আমাদের স্মরণীয় সম্পদ। মোহিতলালের মধ্যে ওমর-দর্শনের যতো প্রভাব পড়েছিল, ততোটা আর কারো মধ্যে নয়। প্রমথ চৌধুরী একবার ভর্তৃহরির সঙ্গে ওমরের ভাবসাদৃশ্যের কথা তুলেছিলেন। পণ্ডিত কবি সুশীলকুমার দে'র 'লীলায়িতা' (১৩৪১) থেকে ভর্তৃহরির কয়েক ছত্র বঙ্গানুবাদ সেই সূত্রেই এখানে তুলে দেওয়া হলো—

অতি দুরারোহ রয়েছে সমুখে পর্বত দুটি উচ্চরূপ,
ভীম দেহ-বনে ঘন ভুজলতা, রয়েছে আড়ালে নাভির কূপ;
সে অঙ্গে ভ্রমে অনঙ্গ ব্যাধ, কটাক্ষ হয় শরটি তার,
কান্তার সেই দেহ-কান্তারে, হে মন-হরিণ, ঘুরোনা আর!

একা ভর্তৃহরি-র নয়,—নানা কবির অনুবাদ-সংকলন এই 'লীলা-য়িতা'-র উদ্বোধনেতেই সুশীলকুমার তাঁর প্রিয় সংস্কৃত কবিদের এক তালিকা দিয়েছিলেন—

শূদ্রক, ভাস, ভারবি, হর্ষ, ভবভূতি, কালিদাস,
তারা তো রয়েছে চোখের সমুখে লয়ে যশ অবিনাশ;
আরো আছে কত ছোট-ছোট কবি চোখের অন্তরালে,
তারাও রচেছে প্রাণের কথাটি গানের ইন্দ্রজালে।

ওগো বিজ্জকা, অমরু, অচল, হে শীলা ভট্টারিকা,
তোমাদেরো ভালে ছিল একদিন গীর্ব্বাণী-বাণী-টীকা ;
তোমাদেরো ছিল সেই সুখ-দুখ, সেই কবি-অভিমান,
সেই কল্পনা, তোমরাও যে গো অমৃতের সন্তান।

'লেখা'-তেই যতীন্দ্রমোহনের কবিত্বের ধারা একটি বিশেষ পরিণতিতে এসে পৌঁছেছিল। তারপর 'অপরাজিতা' (১৩২০), 'নাগকেশর' (১৩২৪), 'বন্ধুর দান', 'জাগরণী' (১৩২৯), 'নীহারিকা' (১৩৩৫), 'মহাভারতী' (১৩৪৩) ইত্যাদি কবিতাসংগ্রহে তাঁর মূল প্রবণতাগুলির ক্রমানুশীলন চলেছিল। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি সেকালের কবি-সাহিত্যিকের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি। দেবেন্দ্রনাথের দেখাদেখি সে-সময়ে ফুলের নাম দিয়ে কবিতার বইয়ের নাম রাখার যে যুগরুচি দেখা দিয়েছিল, সেই প্রভাবেই বোধ হয় 'অপরাজিতা' এবং 'নাগকেশর' নাম দুটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। করুণানিধানের 'ঝরা ফুল' (১[illegible]), 'ধান-দূর্বা' (১৩২৮),—সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল' (১৯১১),—কুমুদরঞ্জনের 'বনতুলসী' (১৩১৮), 'শতদল' (১৩১৮), 'বনমল্লিকা' (১৩২০ ?),—কালিদাস রায়ের 'কুন্দ' (১৩১৫),—নজরুলের 'দোলন চাঁপা' (১৩৩০), 'ঝিঙেফুল' ইত্যাদি গ্রন্থনাম সেই রুচিরই স্মারক। নজরুলের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত 'ভারতী'-পর্বের ফুল-পাখি-স্বপ্নের রূপোল্লাস-ভাবটা বেশ প্রবল ছিল। যতীন্দ্রমোহন নিজে, এবং 'মানসী'-'ভারতী'-'যমুনা' প্রভৃতি সেকালের সমবিশ্বাসী অন্যান্য পত্র-পত্রিকার কবিরাও সেই মর্জির মধ্যে বাস করে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেই চূড়ান্ত মনে করে, কাব্যচর্চা করে গেছেন। ১৩২৯-এ

প্রকাশিত 'জাগরণী'র মধ্যেও তাঁর একান্ত রবীন্দ্র-অনুকরণের নমুনা আছে। 'জাগরণী'র বৈশাখ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা'র 'বৈশাখ' ও 'বর্ষশেষ' পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলেই এ-মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' প্রভৃতি রচনার মধ্যে পৌরাণিক চরিত্র-কথার মহিমা বর্ণনার যে প্রথাটি অনুশীলিত হয়েছিল, 'মহাভারতী'-র 'কর্ণ', 'ছুর্যোধন', 'ভীম', 'শবরীর প্রতীক্ষা' ইত্যাদি কবিতায় তারই চিহ্ন আছে। এ কাজ আরো অনেকে করেছিলেন। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর (১৮৭২-১৯৪৯) 'গাথা'-র (১৩১২) কথা মনে পড়ে। তবে যতীন্দ্রমোহনের বিশেষত্ব এই যে, সুমিত এক-একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে এক-একটি চরিত্রের মর্মভাবটি তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, যেমন,—'ক্ষাত্র তেজের দীপ্ত তারকা জ্বলুক আঁধারে ছুর্যোধন' কিংবা 'ধিক্কৃত কোনো দৈব অতীত 'কর্ণ মানে না তার'। 'মহাভারতী'র 'মহানন্দমঠ'-এ ভারতবাসীকে তিনি ঐক্যবদ্ধ হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। 'ভাটিয়ালী'-তেও রবীন্দ্রনাথের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার 'প্রাচীনার প্রলাপ', 'পড়ো বাড়ি' ইত্যাদি কবিতায় আগেকার 'রেখা'-র 'মিলন' প্রভৃতিতে অথবা 'লেখা'র 'জেলের মেয়ে'-তে যেরকম কথ্যরীতির নমুনা দেখা গিয়েছিল, তারই নবতর উদাহরণ আছে। 'পড়ো বাড়ি'-তে তিনি লিখেছিলেন—

> মস্ত একটা প'ড়ো বাড়ি—তিন প্রকোষ্ঠ দোতালা
> দক্ষিণে তার ফুলের বাগান, উত্তরে তার গোশালা।

—এই পত্তরীতির মধ্যে স্বাভাবিক বাগ্‌ভঙ্গির কিছু প্রসাদ পড়েছিল বলে বোধ হয়!

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জন্ম ১৮৮২)

করুণানিধানের স্বপ্নবিলাসী মন যেমন রূপসম্ভোগের নিষ্ঠা দেখিয়ে গেছে, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন সত্যেন্দ্রনাথ, কালিদাস রায় প্রভৃতি সমকালীন অন্যান্য কবির লেখা থেকেও সেরকম নমুনা তোলা যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের 'কিশোরী', 'নাগকেশর', 'সিঞ্চলে সূর্যোদয়', 'ফুলের রাণী' প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই স্বপ্নমায়ার উদাহরণ আছে ; স্বপ্নদেশের 'পরী-বিহঙ্গী'-কে তিনি বলেছিলেন—

হোথা ঘুমাবি হিন্দোলায়,
মোরা মৃদু দোল দিব তায়
গাহি' মৃদু-গুঞ্জন গান—
'চারু ঊর্ণনাভের ঝিকিমিকি জালে
কেশরের উপাধান'।

করুণানিধান এবং সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেই এই ধরনের স্বপ্ন-কল্পনার আন্তরিকতর প্রবণতা ছিল। অন্যেরা হয়তো মাঝে-মাঝে সেইভাবে ভাববার চেষ্টা করেছেন। তরুণরা তখন অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠিতদের দেখাদেখি প্রকৃতির রূপরসের কথাই পদ্যে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন। সব যুগেই সেরকম ঘটে থাকে। অনুকরণের পথ ধরেই নবাগতের দল প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯২৪-২৫ নাগাদ 'বার মাস' নামে একটি রচনার মধ্যে যে তরুণ কবি লিখেছিলেন—

পৌষে আমের মুকুলগুলি
গন্ধ সতেজ ঘোর,
মাঘের প্রাতে শীতের বুড়ি
কুজ্ঝটিকার লোর!

—তিনিই যে উত্তরকালের যশস্বী লেখক ও কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত হয়ে উঠলেন, সেকথা অবিশ্বাস্য মনে হবে কেন? কুমুদরঞ্জনও

দীর্ঘ অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব এই যে, জগতের এক-একটি বিষয় পেরিয়ে-পেরিয়ে, নতুন বিষয়ে আসক্ত হবার প্রয়োজন তিনি মানেন নি। কবিতার শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে বলা যেতে পারে 'সহজিয়া', অর্থাৎ তাঁর মনে তাঁর বক্তব্য বিষয়টি যেভাবে দেখা দেয়, তিনি সেই ভাবেই তা বলে ফেলেন। পশ্চিম-বাংলার পল্লী-জীবনের সারল্যটুকুই তিনি ছেঁকে নিয়েছেন, তার বক্রতার দিকটা বিশেষ দেখেননি,—দেখতে চাননি।

কোথা আমগাছে ঝুল-ঝাপ্পুর
কোথা বটগাছে ঝুলবো,
কোথা অজয়ের সেই শ্যাম কূল
যেথা বুনো কুল তুলবো।

—তাঁর 'বনমল্লিকা'-র 'প্রবাসী'-র এই কয়েক ছত্রের মধ্যেও তাঁর সেই সাধারণ ভঙ্গিটা ধরা পড়েছে। করুণানিধানের শান্তিপুর-প্রীতির সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের উজানি-প্রীতির তুলনাও অসঙ্গত নয়। বৈষ্ণবভাবে ভাবুক কবির মনে বর্ধমান জেলার শ্রীপাট কোগ্রামের মাটির এক স্থায়ী টান আছে। সেই ভাবরসে মগ্ন থাকার ফলেই সংসারের বিক্ষোভ বা বিরোধের দিকটা তিনি যেন দেখতেই পাননা। তিনি নিজেও তাঁর 'উজানি'-র 'হংস খেয়ালি'-র সুখী মাঝির মতোই জগৎ-সংসারের কোলাহলের বাইরে কাটিয়েছেন—

মামলা মোকর্দমা, আর ধরার কোলাহল
পায়না সে ত শুনতে, বিনা নদীর কলকল!

১৩৩৪-এ ছাপা 'অজয়'-এর প্রথম দিকে অনুবাদ-সমেত কবি বার্নসের কয়েক ছত্র তুলে দিয়ে আত্মকালবিস্মৃত কুমুদরঞ্জন তাই এই আশা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন যে—

সুখের সময় আসছে ওগো
স্বপ্ন নয় ক' সত্যি এ
সকল জাতি নিকট জ্ঞাতি
ভরবে ধরা আত্মীয়ে।

সকলেই জানেন, যে তখন থেকে অদ্যাবধি, এই কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীর দুর্গতি কেবল বেড়ে চলেছে—'সকল জাতি নিকট জ্ঞাতি ভরবে ধরা আত্মীয়ে'—এ-উক্তিতে শুভকামনা থাকলেও বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতি নেই। পল্লী-প্রকৃতির ভক্ত, বৈষ্ণব ভাবময় কুমুদরঞ্জনকে তাঁর সমকালীন অন্যান্য কবিদের তুলনায় একটু বেশি নির্লিপ্ত মনে হতে পারে,—কিন্তু নিজের বিশ্বাস বা আদর্শ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নন। ১৮৪-এর পৃষ্ঠায় তাঁর সমালোচকের উদ্দেশ্যে তাঁরই একটি কবিতার যে-দু'লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে 'অজয়'-এর 'কবির দুঃখ' থেকে কবিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তিটি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে—

পেচক তাহারে নির্বোধ বলে
দরিদ্র বলে গৃধ্র,
বিজ্ঞ বাদুড় চক্ষু মুদিয়া
খুঁজিছে তাহার ছিদ্র।
সে তখন বসি মাধবী কুঞ্জে
কণ্ঠের সুধা ঢাল্‌ছে,
চিত্রার ঊষা জাগিছে সে ডাকে
সরমে কপোল লাল্‌চে।

'স্বপ্নের সফলতা'-র মধ্যে আত্মসচেতন কবির ব্যর্থতাবোধও প্রকাশিত হয়েছে,—আবার, তা'তে তিনি এও দেখেছেন যে,—

স্বর্ণপ্রতিমা এলেন নামিয়া
রূপে পূর্ণিমা ফুটে,
শ্রান্ত কবির বদন মুছান
স্বর্ণ চেলীর খুঁটে।

সংসারে যারা দীন, তুচ্ছ, অসহায়,—তাদের জন্যে তাঁর সমবেদনার অন্ত নেই, কিন্তু সেও তাঁর বৈষ্ণব ভাবাবেগেরই আর-এক দিক। 'দরিদ্রতা', 'ছোটর দাবী' প্রভৃতি রচনাতে তার চিহ্ন আছে। স্বদেশের পুরাকথায় তাঁর অশেষ আগ্রহ। তিনি বলেন—

তোমরা খোঁজ ভবিষ্যতে
আমরা খুঁজি অতীতে,
তোমরা পূজো উঠন্তেরে
আমরা পূজি পতিতে।
ভাঙ্গার সাথেই ভাব আমাদের
লোকসানেতেই লাভ আমাদের,
ধরার পুঁজি যায় বেড়ে যায়
কেবল মোদের ক্ষতিতে।

এই লেখাটির নাম 'খেয়ালী'। কুমুদরঞ্জনের নানা খেয়ালের মধ্যে অতীতের কীর্তিকথার সুখাবেশ,—পুরী-বৃন্দাবন-মথুরা প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের বন্দনা,—কৃষকের সুখ-দুঃখের কল্পকথা,—স্নেহ-তৃষাময় সন্তান-হৃদয় দিয়ে জগজ্জননীর মহিমা আস্বাদনের ব্যাকুলতা,—এবং এইসব প্রবণতারই পাশাপাশি একরকম অ-বিদ্বেষী, পরিহাসরসিক মনোভাব দেখা যায়। সমকালীন অন্যান্য কবিদের মতন তিনিও পদ্যে কিছু-কিছু আখ্যান পরিবেষণ করেছেন। করুণানিধানের 'কনকাঞ্জলি'র 'বৃন্দাবন-গাথা', 'বৃন্দাবনে,' 'মথুরায়' প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর বৈষ্ণব ভাবনার লেখাগুলি,—এবং সেই সূত্রে কালিদাস রায়ের

'মথুরার দ্বারে', 'বৃন্দাবন অন্ধকার,' 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' ('পর্ণপুট'-প্রথম ভাগ) ইত্যাদি যেমন সমধর্মী বলে মনে হয়,—তেমনি 'ভারতী'-পর্বের অন্যান্য লক্ষণের দিক থেকেও তাঁর কবিতা পিছিয়ে নেই। তখনকার এই কবিগোষ্ঠীর মনে কবি-স্বভাবের ধারণাটি কী রকম ছিল, তার আভাস আছে করুণানিধানের 'কবি'র কয়েক ছত্রে—

বিভল নয়ন স্বপনে জড়িত,
অধরে জড়িত হাসি ;
পিঠে নাচে চুল, মাথে বনফুল,
হাতে মৃণালের বাঁশি।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এসে সে ধারণা ভেঙে দিয়েছিলেন। তাঁর অগ্রজ কবির দল পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা লিখেছেন,—গতানুগতিকভাবে পল্লীপ্রকৃতির প্রশংসা করেছেন, আবার, কুমুদরঞ্জন লিখেছেন অঘোরপন্থী তুমন্দ্র-র ('অঘোরপন্থী'—'স্বর্ণসন্ধ্যা' দ্রষ্টব্য)—কথা, কালিদাস রায় লিখেছেন 'দুর্বাসা' ('পর্ণপুট'), 'ইন্দ্র' ('আহরণী') ইত্যাদি,—তারই মধ্যে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী তাঁর 'পাষাণ' বইখানির 'কাব্যের প্রাণ'-এর প্রথম ক'টি ছত্রে বলেছিলেন —

সংসার ছেড়ে পালিয়ে এসে কবি
লোকালয়ের প্রান্তে বাঁধ্‌লো বাসা,
সেথায় অষ্টপ্রহর কোলাহল
ভাব্‌লে হেথায় স্তব্ধতা কি খাসা।
কোয়াশা থেকে আব্‌ছায়া ভাব নেবো
কুঞ্জ ছেঁকে নব-রসের সুধা,
করুণার সুরে বাঁধ্‌বো ভাবার তার,
মিটিয়ে দেবো ভবের কাব্যক্ষুধা।

চাঁদ থেকে উপমার-ফাঁদ বুনে
গড়ে তুল্‌বো ঘন স্বপন-জাল,
মেঘের স্তবক ভেঙ্গে রূপক নিয়ে
কল্প-ডিঙায় উড়িয়ে দেবো পাল !

এবং শেষ কয়েক ছত্রে তিনি বোধ হয় সেকালের স্বপ্নাবিষ্ট সহব্রতীদেরই বিশেষভাবে শুনিয়ে দিয়েছিলেন —

বুঝ্‌লে কবি মানবতা বিনা
রসের সৃষ্টি চোখ ভুলান' আখর,
হৃদয়-রঙের রং ফলে না যাতে
সে সব ছবি তুলির ঝাপসা আঁচড়।

কুমুদরঞ্জনের সম্বন্ধেও মোহিতলাল পুনরায় সেই 'বাঙালীত্বে'র কথা তুলে বলেছিলেন—'আমি নিজে বৈষ্ণব-সাধনার অনুরাগী নই ; শ্রীচৈতন্যকে বাঙালী-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও, ঐ বৈষ্ণব তত্ত্ব ও তাহার সাধনাকে একটা পন্থাবিশেষ বলিয়াই মনে করি। এ বিষয়ে আমি বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-বংশীয় বাঙালী। তথাপি, চৈতন্য-পরবর্তী বাঙালী-সমাজ যে একটি রস-সংস্কার লাভ করিয়াছে, তাহা মূলে যে ঐ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার রস, তাহা স্বীকার করি।···কবি কুমুদরঞ্জন বাঙালীর সেই দীর্ঘকালগত রসজীবনের কবি ; তাঁহার জন্মস্থানও যে সেই আদি বৈষ্ণব-কবিগণের দেশে, তাহাও হয়তো একটা দৈব ঘটনা নহে।' তিনি আরো বলেছিলেন—'কুমুদরঞ্জন এযুগের একমাত্র কবি, যিনি বাংলার সেই রস-জীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আধুনিক মানব-পূজাকে, সেই বৈষ্ণব—বা আরও আদি তান্ত্রিক ভাবসাধনার মন্ত্রে শোধন করিয়া, অসংখ্য কবিতায় গুঞ্জরিত করিয়াছেন।'—এ-মন্তব্যের 'একমাত্র' বিশেষণটি

কিন্তু মোটেই সঙ্গত নয়;—এদিক থেকে কালিদাস রায়-ই তো কুমুদরঞ্জনের সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী। আর, এঁদের মধ্যে মানবতার নামে মানব-পূজার যে রসাবেশ, ভাবোচ্ছ্বাস বা কল্পনাবিলাস দেখা গিয়েছিল, মোহিতলাল যাই বলুন,—তাকে ঠিক 'আধুনিক' বলা যায়না। এঁদেরই সমকালীন কবি সত্যেন্দ্রনাথও স্বপ্নরস-ভোগে বিমুখ ছিলেন না,—তবু তাঁর 'শূদ্র' 'মেথর', 'আখেরী', 'গান্ধিজী', 'রাজা-কারিগর' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীর আধুনিকতর মানবতাবোধ আরো সার্থকভাবে, আরো প্রবল সুরে এবং উপযুক্ত শব্দ-ছন্দ-প্রসঙ্গ-সমাবেশের দক্ষতার বলে ব্যক্ত হয়েছে। নজরুল ইসলাম বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের সেই আধুনিকতর মানবতারই অনুসরণ দেখা গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'রাজা-কারিগর'-এর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রমিক-বন্দনার খুবই নৈকট্য আছে। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

রুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই
বাটালির ঘায়ে বশ করি,
কর্ণিক, ছেনি, হাতুড়ি চালাই,
তুরপুন মাকু বা'শ ধরি।

ছন্দে, ভাষায়, বাগ্বিধির তীব্রতায় এবং মাধুর্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অবিশ্যি সত্যেন্দ্রনাথকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেলেন। তারপর করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস রায়ের ভক্তিভাবময় নরনারায়ণবাদ পরিত্যাগ করে. কঠোর বস্তুজগতের পরিশ্রমের অংশীদার হিসেবেই জনগণের বরণ শুরু হলো। বিবেকানন্দের নিখিল-ভারত-ভ্রাতৃত্ববাদের সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথের কতকটা নৈকট্য ছিল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভাই'—সম্বোধনটি হয়তো সেই ধারারই প্রভাবজাত।

মোহিতলাল বিশেষ ক'টি নামের সাহায্যে কুমুদরঞ্জনের কবিত্বের

দোষ এবং গুণ দুই-ই দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমে তাঁর 'বৈষ্ণব' ভাবের কথা বলে নিয়ে অতঃপর তাঁকে 'বাউল' ও 'সহজিয়া' বলা হয়েছিল। বিষয়টি পরিস্ফুট করে তিনি লিখেছিলেন—'ভক্তের ভক্তির উচ্ছ্বাস অনেক স্থলেই কাব্যসৃষ্টি করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে—তাহা একপ্রকার ভক্তি-উদ্দীপক সাধন-সঙ্গীত মাত্র হইতে পারিয়াছে; তাহাতে সেই 'রূপ' নাই, যাহা কাব্যের অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ।' পুরীর মন্দিরে পুরুষোত্তমের বিগ্রহ দেখে কুমুদরঞ্জন লিখেছিলেন—'রেখে গেনু, দেব, আঁখির তিয়াষা আরতির দীপে তুলি'! মোহিতলাল তাঁর কবিকর্মের 'সহজিয়া' ভাবের কথা বলে নিয়ে তাঁর সেই কবিতারই ভাষা সম্বন্ধে প্রশংসা করে লিখেছিলেন—'উহাতে বাঙালীর জন্মান্তর-সংস্কার, তাহার জাতিগত 'বাসনা' উদ্বেল হইয়া আছে। আজিকার বাঙালী যে তাহা অনুভব করিতে পারে না, তার কারণ, সে সেই জাতীয় জীবনরস-ধারা ও সেই জাতিস্মরতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।'

মোহিতলালের এ-উক্তিও অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া যায়না। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের যুগে বাস করে, স্টাইলবর্জিত কোনো কবির সম্বন্ধেই এখন আর বিশেষ উৎসাহ বোধ করা সম্ভব নয়। দাশু রায়, গোপাল উড়ে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রমথ চৌধুরী,—বাংলার বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, ইত্যাদি নানা কালের নানা কবিকে আমরা এ-যুগেও সমাদর জানিয়েছি। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের সান্নিধ্য থেকে আমাদের পাঠক-মনে এই শুভফলটুকুও পাওয়া গেছে যে, কবিতায় এখন আমরা সত্যিকার ভাব চাই, কবির সত্যিকার অভিজ্ঞতা চাই এবং কবিকে আমরা শুধু 'বাউল', 'বৈষ্ণব', অথবা ''সহজিয়া' ভাবের জাতিস্মর কথক কিংবা তথাকথিত 'খাঁটি বাঙালী'-র শেষ নমুনা হিসেবেও

দেখতে চাইনা। কবিরা আমাদের অন্তর্বেদনার যথার্থ আত্মীয়; আমাদের বিধিলিপি বা দুরদৃষ্ট যদি সত্যিই আমাদের 'খাঁটিত্ব' ঘুচিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের স্বকালের কবি আমাদের যুগোচিত ভাষাতেই তাঁর কবিতা লিখুন, এই প্রত্যাশাই স্বাভাবিক বলে মেনে নেবো। পাঠকের সে প্রত্যাশা মিটিয়েও কবি তাঁর নিজস্ব ভাষা, রীতি, ভঙ্গি ইত্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন।

মোহিতলালের বহুশ্রুত 'খাঁটি বাঙালী'-বাদ সম্বন্ধেই একথা বলে নেওয়া গেল। তবে, কুমুদরঞ্জনের কবিকর্মের 'সহজিয়া' ভাব অস্বীকার করারও কারণ নেই। ছন্দের কারুকার্যে, শব্দের নির্বাচনে কিংবা ভাষার বিন্যাসে তিনি যে সর্বত্র 'বাউল'-পন্থী বা 'সহজিয়া' থেকেছেন, তা' নয়। তাঁর পরিণত বয়সের 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৩৫৫) এবং ১৩৩৪-এর বই 'অজয়' থেকেই মোহিতলাল তাঁর কবিকর্মের নমুনা তুলেছিলেন। অন্যান্য লক্ষণের চিহ্ন আছে অন্যান্য রচনার মধ্যে। তাঁর 'উজানি' (১৩১৮)-র সঙ্গে একই বছরে কালিদাস রায়ের 'কিসলয়', এবং তার কিছু আগে 'কুন্দ' (১৩১৫) বেরিয়েছিল। সেকাল থেকে একাল অবধি এঁদের একজনেরও মনোভঙ্গির বিশেষ বদল হয়নি। বৈষ্ণব ভাবটি দুজনেরই দীর্ঘ সহচর। তফাৎ এই যে, কালিদাস রায় একটু বেশি ব্যাকরণ-ঘেঁষা মানুষ; ছন্দ এবং অলংকারশাস্ত্রের দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি; 'কুন্দ' এবং 'কিসলয়'-এর অনেক লেখা একত্র করে কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ১৩২২ সালে 'বল্লরী' নাম দিয়ে তাঁর যে সংগ্রহ ছেপেছিলেন, সেটি কিছুদিন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। ছাত্র-পাঠ্য কবিতার দিকে রায় মহাশয়ের কিছু বেশি নজর ছিল বলে মনে হয়। সে-দিক থেকে কুমুদরঞ্জন বরং দায়হীন, আত্মভোলা কবি। তবে তাঁর পরিহাসময় সমালোচনামূলক লেখাগুলির মধ্যে আত্মভোলা বাউলের হাত আদৌ পড়েনি। সেসব ক্ষেত্রে তিনি

তথাকথিত 'খাঁটি বাঙালী' নন, আমাদের একালেরই মিশ্রভাষী, পতিত বাঙালী! ১৩৪৬-এর শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রকাশিত তাঁর 'পথভ্রষ্টা' কবিতা থেকে কুমুদরঞ্জনের সে লক্ষণের একটু নমুনা তুলে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে মন দেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন—

> তোমাদের আচরণে দোষ দেব না,
> করনা পছন্দ যে নিষ্ঠাপনা।
> বায়ুর মতন ঠিক মন চঞ্চল,
> কোন্ ফুল ভর গিয়া কার অঞ্চল,
> নিজেরা নিজেকে ভাব ডেস্‌ডেমোনা।

কালিদাস রায় (জন্ম ১৮৮৯)

জন্মকালের হিসেব ধরে এগুলে আগে কুমুদরঞ্জনের সমবয়সী সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের, তারপর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের, এবং তারপরে মোহিতলাল মজুমদারের কথা শেষ করে, অতঃপর কালিদাস রায়ের প্রসঙ্গ ধরা উচিত ছিল। কিন্তু পাঁজির হিসেবটা মোটামুটি লক্ষ্য না করে এবার মর্জির দিকেই নজর দেওয়া গেল। এর আগে ১৩২-৩৬ পৃষ্ঠায় কবিতার শিল্পকর্মের কথাসূত্রে কারুকর্মের বাড়াবাড়ি বা অতি মনোযোগের দিক থেকে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কালিদাস রায়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছিল। করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে আলোচনার মাঝে-মাঝে অনেকবার তাঁর কথা উঠেছে। তাঁর বৈষ্ণবভাব, বিদ্যাবত্তা, ছন্দ এবং শব্দের বৈচিত্র্য, নানা প্রসঙ্গের ঝোঁক ইত্যাদি বিশেষত্বেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কেবল আর দু'একটি কথা বলা দরকার।

'কুন্দ', 'কিসলয়', 'পর্ণপুট' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), 'বল্লরী',

'ব্রজবেণু', 'ঋতু-মঙ্গল', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'লাজাঞ্জলি', 'রসকদম্ব', 'আহরণী' (সংকলন-১৯৩৫), 'হৈমন্তী', 'বৈকালী' ইত্যাদি অজস্র বইয়ের মধ্যে প্রধানত তাঁর যে-আগ্রহ ধরা পড়েছে, সে হলো শিক্ষিত 'স্বভাব-কবি'র আগ্রহ। তাঁকে ভাওয়ালের দুঃস্থ গোবিন্দদাসের সুস্থ শিক্ষিত সংস্করণ বল্‌লে হয়তো সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে ভুল বোঝবারও আশঙ্কা থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দিকের কয়েকখানি বই পড়ে তাঁকে লিখেছিলেন—'তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।' তাঁর 'কুন্দ' এবং 'কিসলয়' পড়ে 'অপূর্ব নৈবেদ্য' বইখানির মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখেছিলেন—

তোমার সৌন্দর্যকুঞ্জে—যতবার পশি আমি, কবি!
হেরি তথা শোভা নব নব!—
গলাগলি করি তথা হাসে চাঁদ আর বাল রবি!
অফুরন্ত ফুলের বৈভব!

তারপর, তাঁর আরো অনেক লেখা বেরিয়েছে। মোহিতলাল বলেছিলেন—'কালিদাসবাবু রবীন্দ্রযুগের ছন্দোনৈপুণ্যমাত্র আশ্রয় করিয়া, প্রাচীন বাংলার কাব্যধারাটিকে নবীন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অলঙ্কারপ্রীতি যেমন সংস্কৃতের অনুরূপ, তেমনি সরল অকপট অনুভূতির সহিত অর্থগৌরব মিলিয়া তাঁহার কাব্যে খাঁটি classical ভঙ্গি ফুটিয়াছে।'

কিন্তু 'ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গি' কথাটাও এসব ক্ষেত্রে সমালোচকের আত্মতুষ্টির কৌশল বলে মনে হয়। ইংরেজিতে 'ক্ল্যাসিক্যাল' শব্দের পাশাপাশি 'নিও-ক্ল্যাসিক্যাল' শব্দটিরও প্রয়োগ আছে। রোম্যান্টিক ভাবাদর্শের প্রবল তাড়নায় সাহিত্যের রূপসংহতিতে নানাবিধ ভাঙনের প্রকোপ ঘটতে দেখে একসময়ে য়ুরোপের সাহিত্য-

স্রষ্টার দল প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে রূপগত এবং আদর্শগত অরাজকতা দূর করবার সংকল্প ছিলো তাঁদের। সেই থেকে 'ক্ল্যাসিক্যাল' কথাটা বড়োই শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ইংরেজ সাহিত্য-প্রমাতা ওয়াল্টার পেটার সেকথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। শিল্পকর্মে অঙ্গসজ্জার দিকে সাহিত্যশিল্পীর অতি-মনোযোগের উদাহরণগুলিকে সর্বত্র 'ক্ল্যাসিক্যাল' বলা সঙ্গত নয়। একজন সমালোচক খোলাখুলি এও বলেছেন যে, অঙ্গসজ্জার বাড়াবাড়িটা খাঁটি 'ক্ল্যাসিক্যাল' ভাবের বিকার মাত্র।—'The "classic" sprit, then has its true character ; and there are also the perversions of it. Its qualities, when aimed at by meaner minds, become defects.'

করুণানিধান এবং কালিদাস রায়, উভয়ের সম্বন্ধেই মোহিতলাল 'ক্ল্যাসিক্যাল' গুণের কথা বলেছেন। কিন্তু সত্যের খাতিরেই তাঁর সে প্রশংসা অগ্রাহ্য। অনেক সময় তৎসমশব্দগাম্ভীর্যের কৌশল সহায় করে ঐ দুই কবিই কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করেছেন মাত্র। জয়দেবের প্রসঙ্গে কালিদাস রায় লিখেছেন—

> সান্দ্র মেদুর মেঘডম্বর অম্বরে যবে বাজে,
> আজো হেরি তোমা, তমালতরুর ঘননীলিমার মাঝে।
> ললিত বিলোল লবঙ্গফুলচুম্বিত সমীরণে
> বকুলে আকুল চল অলিকুলে, কোকিলকূজিত বনে।
> তব নখাংশু হেরি মধুমাসে কিংশুক-কলিকায়,
> তব হাসি হেরি হিল্লোলময়ী বল্লীর সিতিমায়।

'সিতিমা' মানে কৃষ্ণতা, শুভ্রতা অথবা নীলিমাও হতে পারে। এখানে 'হাসি'-র সঙ্গে সঙ্গতির খাতিরে শুভ্রতা-ই ধর্তব্য। কিন্তু সে

যাই হোক্, এতে 'ক্ল্যাসিক্যাল' স্বাদ বা যথার্থ প্রাচীন সাহিত্য-লক্ষণ আদৌ নেই। আবার—

জলে—চক্রবাকী শুন—চক্রবাকে
কল—কূজনে ডাকি পুন—মিলিত ঢু্ঁড়ে।
দিবা—কিরণবালা পরি'—হিরণ-মালা
কিবা—বরণ-ডালা ধরি নামিছে দূরে।

তাঁর 'ব্রজবেণু'-র 'রাখালরাজ'-এর এইসব কায়দাকেও না 'ক্ল্যাসিক্যাল', না 'রোম্যান্টিক' কিছুই বলা সঙ্গত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অপপ্রভাব বড়োই ব্যাপক ছিল সেযুগে! এসব দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গেলে তাঁর কথাই বার-বার মনে পড়ে। 'নমি সনাতনী সারাৎসারা' বলে 'গঙ্গা'-বন্দনা, কিংবা 'প্রণমি সহস্রক্ষণ অনন্তের রসঘন শিলা ব্রহ্মরূপ' বলে 'হিমাদ্রি'-বন্দনা করা নিঃসন্দেহে সত্যেন্দ্রীয় উত্তরাধিকারের লক্ষণ। তাঁর 'বেদ', 'সোম' প্রভৃতি রচনাও সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা'-র স্মারক। শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির বহির্মুখী উত্তেজনাতেই কালিদাস রায়ের দীর্ঘ সাধনা অতিবাহিত হয়েছে। পরিণত বয়সে, হঠাৎ যেন কাছের জগৎ সম্বন্ধে বিষণ্নভাবে সচেতন হয়ে, মোহিতলালের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন—

কি লিখিব আজ, কি গান গাইব, সূত্র পাইনা খুঁজি
কল্পধেনুর আপীনে কে রস টানে?
যন্ত্রদানব হরিয়া নিয়াছে কবির সকল পুঁজি,
ছন্দও আজি শৃঙ্খলা নাহি মানে।
আজি মানবের নাইক অতীত, নাইক ভবিষ্যৎ
আছে শুধু তার ক্ষুধিত বর্তমান।

গাহিতে চাহিলে হাহাকারে মোর রোধে কণ্ঠের পথ,
সেতারের ঢিলা তারে বাজেনাক তান।

যন্ত্র-কে 'যন্ত্রদানব' বলে তিরস্কার করে 'কল্পধেনুর আপীনে' একনিষ্ঠ থাকবার ফুরসৎ নেই একালে! সময় বদ্‌লে গেছে! সময় যে বদ্‌লে গেছে, সেকথা কালিদাস রায় নিজেই বার-বার বলেছেন। তবু, কিঞ্চিৎ কুণ্ঠা সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ প্রার্থনা বা দাবির কথাও তিনি তাঁর 'শেষ কথা'-তে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন—

দেশদেশান্তর লাগি নহে মোর কুলায়ের গান।
যুগযুগান্তর-পথে যাত্রা তার নহে কোন দিন,
কুণ্ঠিত তাহার কণ্ঠ, বক্ষ ভীরু, পক্ষ তার ক্ষীণ।

বলা বাহুল্য, এও সেই 'বাঙালীয়ানা'র দাবি! করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায় প্রভৃতি কবিদের সঙ্গে-সঙ্গে বাংলা কবিতায় তথাকথিত 'বাঙালী ভাবনার' এই বিশেষ দাবির জোর কমে এসেছে। এই জোর কমে আসার ব্যাপারটা ভালো না মন্দ, সে-আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যুগের রুচি বদ্‌লে গেলে পুরোনো রুচিকে আঁকড়ে থাকাটাই একমাত্র সুরুচি মনে করা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে পুরোনো আমলের শিল্পীর যাতে অনাদর না ঘটে, সেটাও দেখা দরকার। আজকের পাঠক যে পুরোনো ভঙ্গিতে যথেষ্ট আবেদন পান না, সেকথা কবি নিজেও জানেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

যাদের বিজাতী শিক্ষা হরিয়াছে বিধি-দত্ত মন,
যাহারা জাতীয় ধর্ম হেলাভরে দিল বিসর্জন,
তাহাদের জন্য নয়, পশ্চিমের ঝঙ্কার মাঝারে
যাহারা বাঙ্গালী মর্ম রাখিয়াছে অঞ্চলের আড়ে
তুলসীর দীপ সম, তাহাদেরই তরে গাই গান ;

এবং সেই শ্রোতাদের দিন ফুরোলে়্রে তিনি মৃত্যুর কথা ভাবছিলেন।
বঙ্গোপসাগরে'! স্থ প্রতিষ্ঠিত মাঝারি কবিরা

এইসব মান-অভিমানের প্রসঙ্গ উল্লে শব্দ-ছন্দ-অনুবাদপ্রীতির
বিশেষ দেশ-কালের মধ্যে তাঁর সাধনার বিচাাহন বাগচীর 'কলঙ্ক'
একনিষ্ঠ সাধকদেরই অন্যতম হিসেবে চিনে িপা হয়েছিল। আর,
স ্যন্দ্রনাথ এবং মোহিতলালের মধ্যে গভীরতর ি লিখেছিলেন—
তারপর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে অকস্মাৎ যে
নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটেছে। নজরুলের মধ্যে দেখা
রুচিভেদের আঘাতময় নবযুগ। আগে সেই নতুন অধ্যায়ে
দিয়ে নিয়ে, পরে সত্যেন্দ্রনাথ এবং মোহিতলালের দিকে
চোখ ফেরানো যাবে। সুতরাং এইবার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭—১৯৫৪)

'মোসলেম ভারত' পত্রিকা প্রথম বেরিয়েছিল ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে। পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের একটি কবিতায় হাফিজের ভাব এবং ছন্দের অনুসরণ দেখে মোহিতলালের খুবই ভালো লেগেছিল। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বেও এই কবিতাটি তাঁকে আবৃত্তি করতে শুনেছি।

> (বাদ্‌লা কালো স্নিগ্ধ আমার কান্তা
> এলো রিম্‌ঝিমিয়ে)
> বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর
> পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।

এই অন্ত্যানুপ্রাসের আবেশ লাগতো তাঁর মনে; আনন্দ ফুটে উঠতো মোহিতলালের চোখে-মুখে। ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যার

গাহিতে চাহিলে হাহাকারে একখানি চিঠি ছাপা হয়েছিল।
সেতারের ঢিলা ত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিনি সে চিঠিতে
যন্ত্র-কে 'যন্ত্রদানব' বা প্রকৃতি বর্ণনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ
একনিষ্ঠ থাকবার ফুরস 'লিপিকা'র লেখাগুলি শুরু করেছেন।
সময় যে বদলে গেছে বিতকালে ছাপা সব ক'খানি বই-ই তখন
বলেছেন। তবু, এই অবস্থায় সেই চিঠি থেকে জানা গেল—
কথাও তিনি তাঁ লঞ্চে আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে। মলয়-
বে ব্যজনীবীজন চলিয়াছে। এহেন সময়ে নূতন দিক
নি হাওয়া বহিতে দেখিয়া গুমটক্লিষ্ট প্রাণে বড়ই আরাম
ছ। বাঙলা কাব্যলক্ষ্মীর ভূষণ-সিঞ্জন, তাহার নটনীলাঞ্চল
লীলা ও নূপুরনিক্কণ মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া
উঠিয়াছে। প্রাণহীন শব্দসমৃষ্টি, কৃত্রিম নিয়মশৃঙ্খলিত নীরস-কঠিন ধাতুর আওয়াজ, মানবকণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগভীর জীবনোল্লাসময় স্বরবৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে; অসংখ্য কাব্যরসমাত্রবঞ্চিত অসার অপদার্থ কবিযশঃ-প্রার্থীর ঝিল্লিস্বরে বাংলাকাব্যে অকাল সন্ধ্যার অবসাদ ও নির্জীবতা সূচিত হইতেছে।'

এই চিঠির প্রায় দশ বছর আগে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর লেখা শুরু করেছিলেন। ১৩১৭ সালের 'প্রবাসী'র মাঘ সংখ্যায় তাঁর 'শীত' কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' ('কল্পনা' গ্রন্থের) কবিতার সজ্ঞান অনুকরণের লক্ষণ স্পষ্ট; যতীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টির বিশেষত্বও সেখানে দুর্লক্ষ্য নয়।

(হি হি কম্প লাগিয়াছে বিশ্বে সন্ সন্
নিশ্বাসে তোমার শীত ভয়ঙ্কর)
আকর্ষিছ মরণের পানে, শবাসন
কে গো যোগীশ্বর।

—এইভাবে, শীতঋতু উপলক্ষ্য করে তিনি মৃত্যুর কথা ভাবছিলেন। অথচ বাংলা কবিতার সে পর্বে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত মাঝারি কবিরা রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের এবং সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ-ছন্দ-অনুবাদপ্রীতির অনুকরণেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কলঙ্ক' কবিতাটি 'প্রবাসী'র ঐ কার্তিক সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল। আর, বসন্ত ঋতুর আবাহন করে সে সময়ে রমণীমোহন ঘোষ লিখেছিলেন—

এস গো বসন্ত লক্ষ্মী!—চঞ্চল পবন
ব্যাকুল লভিতে মধু পরশ তোমার;
তোমারে বন্দিতে আজি প্লাবিয়া ভুবন
কোকিল পাপিয়াকণ্ঠে অশ্রান্ত ঝঙ্কার!

বাংলা কবিতায় কোকিল-পাপিয়ার বন্দনাতে কবিদের তখন আর ক্লান্তি ছিলনা! রমণীমোহনের রচনা থেকে সে-কালের অনেকের দৃষ্টিরই এই বিশেষ নমুনাটুকু পাওয়া গেল। 'ভারতী', 'মানসী', 'উপাসনা', 'যমুনা', 'প্রতিভা', 'অর্ঘ', 'জাহ্নবী', 'বিজয়া' ইত্যাদি পত্রিকার পৃষ্ঠায় এরকম অজস্র কবিতা ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং সমাধিস্থ হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, কালিদাস রায় তখন পাঠকসমাজে সুপরিচিত। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অধুনা-বিস্মৃতপ্রায় শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, রাধাচরণ চক্রবর্তী, চণ্ডীচরণ মিত্র, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রভৃতি অসংখ্য কবিযশঃপ্রার্থী। দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অক্ষয়কুমার বড়াল উভয়েই তখনো জীবিত; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসও ছিলেন সমকালীন বহু ভক্ত পাঠকের কবি; আর, পূর্বযুগের প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনো বেঁচেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু তখনকার সাম্প্রতিক ঘটনার মধ্যেই গণ্য।

এই কবিসমাজে দেখা দিলেন দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। 'মরীচিকা'-ই (১৩৩০) তাঁর প্রথম কবিতার বই। তারপর একে-একে তাঁর 'মরুশিখা' (১৩৩৪), 'মরুমায়া' (১৩৩৭) ইত্যাদি ছাপা হয়েছে। ১৩৫৩ সালে তাঁর 'অনুপূর্বা'র ভূমিকায় এই প্রথম তিনখানি বইয়ের নাম মনে করে তিনি লিখেছিলেন—'পুস্তকের নামকরণ বিষয়ে আমি চিরশ্যামল বাংলা কাব্যে মরুভূমির পর মরুভূমি আমদানি কোরে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার প্রয়াস কোরেছিলাম!' নিজের কবিতা সম্পর্কে দুঃখ করে তিনি লিখেছিলেন—'আমার ঘরে জন্মে সেই কল্পলোকবাসিনীর যা দুর্গতি হয়েছে তা তো আমি সব জানি! চিরদিন ভাঙা দেহ নিয়েও সাধ্যমত মাজাঘষা শিক্ষা সহবতের ত্রুটি অবশ্য আমি রাখিনি; কিন্তু যথাইষ্ট শক্তির অভাবে তার দৈন্যও আমি ঢাকতে পারিনি।'

যতীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাস ছিল নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাতুলালয়ে,—বর্ধমান জেলার পাতিল-পাড়া গ্রামে। বারো বছর বয়সে গ্রামের ইস্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। ১৯০২ সালে প্রবেশিকা [illegible],—তারপর ১৯১১ সালে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি-ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৩ সালে তিনি নদীয়া জেলাবোর্ডে চাকরি পেয়েছিলেন। অতঃপর ১৯২৩ সালে কাশিমবাজার স্টেটের চাকরি নিয়ে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সেই বিভাগেই নিযুক্ত ছিলেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়,—আর যে-বছর কাশিমবাজারের কাজে নিযুক্ত হন, সেই বছরেই তাঁর প্রথম কবিতার বই 'মরীচিকা' ছাপা হয়। 'কল্লোল' বেরিয়েছিল সেই বছরেই, সেই ১৩৩০ সালে। 'সায়ম্' (১৩৪৭) তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। তারপর পঞ্চম বই 'ত্রিযামা' ছাপা হয় ১৩৫৬ সালের

আশ্বিন মাসে। 'মরীচিকা'-তে ১৩১৭ থেকে ১৩২৯ সালের মধ্যে লেখা একচল্লিশটি কবিতা আছে; 'মরুশিখা'র কবিতাগুলি লেখা হয় ১৩৩০ থেকে ১৩৩৪ সালের মধ্যে; 'মরুমায়া'-তে আছে ১৩৩৫ থেকে ১৩৩৭ সালের রচনা; 'সায়ম্‌' হলো ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৭-এর কবিতাসংগ্রহ, এবং 'ত্রিযামা'য় ১৩৪৮ থেকে ১৩৫৫ সালের মধ্যে লেখা মোট সাতাত্তরটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। 'মরীচিকা' উৎসর্গ করা হয়েছিল যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নামে; বইখানির ক্রোড়পত্রে রবীন্দ্রনাথের এই কটি লাইন ছাপা হয়েছিল—

(মরীচিকা চাহি জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজ
আমরা খাঁচার পাখি।)

'মরীচিকা'-র প্রথম কবিতা 'বহ্নিস্তুতি'-তে তিনি লিখেছিলেন—

(শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধর মরীচিকা।)
নিখিল বিশ্বে খুঁজে ফিরি' তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবিনশ্বর ভস্মে শান্তি লভে।

* * *

আজ ভাবিতেছি তাই
সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই!

'মরীচিকা'-র এই কবিতার সঙ্গে তাঁর শেষ জীবনের 'সমাধান' কবিতাটি (রচনাকাল—আষাঢ়, ১৩৫৪; 'ত্রিযামা' দ্রষ্টব্য) মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। সেখানে তিনি পূর্বকথা স্মরণ করেছিলেন—

(যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা
প্রেম বলে কিছু নাই,)

চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে
সব সমাধান পাই।
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতনার ঝাঁজ ?
যে হুতাশনের হুতাশে আমার শুকাইল যৌবন
যে পিপাসা মোর রূপ-কূপোদকে সহিল নির্বাপণ
বৈশাখী তাপে তুলসীর ঝারি
যে-সিনান মোরে করে মরুচারী,
যে-দাবদাহনে বাহন করিয়া
এ জীবন পোড়ালেম,
আজ মনে হয় এ দগ্ধ ভালে
সেই ছিল মোর প্রেম।

১৩৬০ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রেম সম্বন্ধে তাঁর এই বিশেষ ধারণার পুনরুক্তি দেখা গেছে –

(প্রেম কো অন্ত নাহি পাই
ত্রিকুড়ি ছাড়ায়ে এসে
দেখিতেছি দিন শেষে
যে দূরে সে ছিল আছে তাই।)

*　　　*　　　*

তাহারি আহ্বান পেয়ে
তারি পানে চেয়ে চেয়ে
কানে খাটো চোখে ছানি আজ
তারি ত্রিতাপের চাপে
মাজা ভাঙা হাঁটু কাঁপে
কাঁধে আঁটা অপরূপ সাজ !

প্রথম যৌবনের সঙ্গে প্রৌঢ় পরিণতির এমন অপরিবর্ত সুসংগতি দেখে মনে হয় যে, তাঁর জীবনে বোধ হয় উল্লেখযোগ্য কোনো ভাব-পরিবর্তন ঘটেনি। আদ্যন্ত এক তির্যক চাহনির কবি ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেও এই অনুবর্তী কবি তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। ১৩৫২ সালের চৈত্র মাসের ছোটো একটি পদ্যে তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের কথাই অন্যদিকে সম্প্রসারিত করে লিখেছিলেন—

(দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, তবে আমি কোথা দিয়ে ঢুকি?)
উভয় সঙ্কটে পড়ে দ্বার রাখি খুলি—
ঘরের ভিতরে বেধে গেল চুলোচুলি!

তাঁর 'চির-চাকরি' প্রভৃতি কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের এমনি তির্যক-প্রসারণ দেখা যায়। কিন্তু সে ঠিক জ্বালাময় বিদ্রূপের দৃষ্টি নয়। তাঁর জীবন তাঁকে কবিতার বাহনে বিতর্কে নামিয়েছিল। আর্থিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় অবস্থা বা ঘটনা সম্পর্কে যেমন, সমকালীন সাহিত্যচিন্তা সূত্রেও তেমনি।—আলো দেখবার আগেই তিনি অনুভব করেছেন জ্বালা,—স্বপ্নে বিভোর হবার আগেই তাঁকে অধিকার করেছে তাঁর তর্কপরায়ণ মন! কেমন যেন নিরানন্দ তীব্রতা তাঁর ছত্রে-ছত্রে! তাঁর শেষ পর্বের 'বাঁচা চাই', কবিতাটির এক স্তবকে তিনি লিখেছিলেন—

(গদ্য-কবির পাকিস্তানে
পদ্য যদি প্রাণে প্রাণে
টিঁকতে চায় ত না থাক্ মানে
দাশুরায়ী ধাঁচা চাই
এখন শুধুই বাঁচা চাই।)

সারা জীবন পদ্যছন্দের কবিতাই তিনি লিখেছেন। তারই মধ্যে,

প্রচলিত বাহন স্বীকার করে নিয়ে গঠনের কলাকৌশল দেখিয়েছেন তিনি। 'মরীচিকা'র 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটিই প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। সাতটি 'ঝোঁকে' সে কবিতা সম্পূর্ণ এবং আগাগোড়া সেখানে শুধু দুঃখবচন। আর সেই কবিতাতেই তিনি লিখেছিলেন—

(কেন ভাই রবি, বিরক্ত করো? তুমি দেখি সব-ওঁচা,
কিরণ ঝাঁটার হিরণ-কাঠিতে কেন চোখে মারা খোঁচা)
জানি তুমি ভালো ছেলে,
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে!
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে?

'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নবীন লেখকরা এই কবিতা পড়ে ভারি খুশি হয়েছিলেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল নতুনত্বের আকর্ষণময়; 'চামড়ার কারখানা', 'ডাক-হরকরা', 'বারনারী', 'পল্লীর দোকানী', 'চাষার বেগার', 'হাটে', 'দুঃখবাদী' এবং এই ধরনের আরো বহু নাম তিনি ব্যবহার করেছেন। চাকরি-জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আছে তাঁর 'পথের চাকরি' কবিতায়। পুরোনো আমলের বারমাস্যা-রীতিতে লেখা কটাক্ষচিহ্নিত এই কবিতায় তিনি পাপিয়া-কোকিলের কথা তুলেছিলেন বটে,—কিন্তু তাঁর কাব্যলোকে সে-সব পাখি এসেছিল যুগসন্ধির অনবসর অবহেলার রিক্ততা ফুটিয়ে তুলতে,—নতুন ও পুরাতনের মনান্তরের মরুপ্রান্তরে!

(চৈত্রের ক্ষেত্রে যা ফলিল ফসল,
কেটে মেড়ে মেপে দেখি—ওঠেনি আসল!)

ধূ ধূ করে চারিদিক,
তখনো ডাকিছে পিক—
নূতনে ও পুরাতনে শুধায় কুশল।
আমার যা হয়—
কহ-তব্য তা নয়!
ক্রিং ক্রিং - সরো ভাই,
নহে যে আছাড় খাই!
যা করি চাকরি করি—জয় তারি জয়!

ক্রিং-ক্রিং সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে 'ওভারসিয়ার' কবির পথ-চলার খাঁটি অভিজ্ঞতা ফুটেছে এইসব ছত্রে!

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি অনুবাদ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। 'মাসিক বসুমতী'-তে (১৩৫৯) তাঁর 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদ এবং 'শনিবারের চিঠি'-তে (কার্তিক ১৩৬০ থেকে) 'হ্যামলেটে'র অনুবাদ ছাপা হচ্ছিল। সেই শেষ প্রহর অবধি মাঝে-মাঝে কিছু গদ্যরচনা এবং দু'একটি কবিতাও তিনি লিখেছেন, ছাপিয়েছেন। সেবার, শান্তিনিকেতনের সাহিত্য-মেলায় তাঁর 'কাব্যপরিমিতি'র (প্রথম প্রকাশ 'উপাসনা' ১৩৩৭-৩৮) কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিগেস্ করে-ছিলাম, স্বভাবকবি 'গোবিন্দদাসের 'অতুল'-কবিতাটি সত্যিই কি তেমন ভালো কিছু হয়েছে?' প্রশ্ন শুনে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ, গোবিন্দদাস এবং আরো কয়েকজনের নাম করেছিলেন। তারপর, বীরভূমের রুক্ষ রাঙা মাটির দিকে স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বিকেলে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হলো। রাত্রে আমরা ছিলাম অন্য একটি বাড়িতে। খোলা ছাদে শুয়ে আকাশের মুখোমুখি হওয়া গেল। এবং মনে পড়লো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরই কবিতা—

(মরমীয়া বন্ধুর মরুময় সন্ধান ;—
ছুটোছুটি কেটে গেল চৌপর দিনমান)
ঘনাইল ত্রিযামা যামিনী অমাবস্যা,
আকাশে অসংখ্য অসূর্যম্পশ্যা।
ঝিকিমিকি তারা-ভরা ডুব্‌ জলে নাবছি
এ শেষ জলাঞ্জলি কে ধরবে ভাবছি।

এইটিই 'ত্রিযামা'র শেষ কবিতা!—বোধ হয়, যতীন্দ্রনাথের শেষ সরল, বেদনার্ত, ব্যঞ্জনাময় আত্মকথা!

এই আলোচনা থেকে তাঁর কবিসত্তার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁর সমকালীন অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটুকুও বোঝা দরকার। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের প্রভাব—রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের প্রভাব,—করুণানিধান প্রভৃতি কবিদের স্বপ্নপ্রবণতা,—দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির বিদ্রূপনৈপুণ্য ইত্যাদি বিচিত্রতার মধ্যে তাঁর নিজের বিশেষ একটি সুর ছিল, স্বতন্ত্র একটি পথ ছিল। নতুন কালের আর একজন কবির কথা এই সূত্রে সহজে মনে আসে। তিনি স্বনামধন্য জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ এবং যতীন্দ্রনাথ, —সমকালীন এই দুই কবির মধ্যে আদর্শের ব্যবধান কম নয়। তবু প্রস্তুতির পর্বে এক জায়গায় দুজনেরই কতকটা নৈকট্য ছিল। যতীন্দ্রনাথের 'নষ্কিস্কৃতি'র কথা আগেই বলা হয়েছে। তাতে তিনি লিখেছিলেন—

(মিলন বিরহ ভাব ও অভাব যোগ বিয়োগের কাজ,
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভাস্বর মহাতাজ,)
বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেই কালে,
তখনো কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাঁহার ভালে?

বস্তুত তাঁর কবিতার মূল বক্তব্যই হলো জীবনের অগ্নিদাহের অনিবার্যতাবোধ। 'মরীচিকা' বইটিতে 'ঘুম', 'স্বপ্নে', 'প্রেম' ইত্যাদি আবেশজনক বিষয়ের আভাস মাত্র আছে, কিন্তু বাংলা কবিতার বহুখ্যাত এইসব প্রসঙ্গ থেকে তিনি তাঁর অন্তরে বিশেষ যে কোনো উল্লাস পেয়েছিলেন, সে রকম চিহ্ন নেই। 'ঘুমের ঝোঁকে'তেও তিনি বলেছেন—

(এস ত বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা)
তোমায় আমায় হয়ে যাক্ ছুটো কাটাছাঁটা সোজা কথা
জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খাম-খেয়ালি।

কটাক্ষের দিকেই যতীন্দ্রনাথের প্রধান প্রবণতা! অসন্তোষেই তাঁর কবিত্বের সূচনা,—অসন্তোষের মুখোচিত বাগ্বিধি প্রণয়নেই তার পরিণতি। কিন্তু জীবনানন্দের বিষাদ মোটেই অসন্তোষ নয়। 'মরীচিকা'তে শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর কথা আছে,—শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ঋতুর আবেদনও তিনি উপেক্ষা করেননি, আবার, 'যৌবন বিস্ময়' নামে একটি গানের মধ্যে তিনি তাঁর নিজস্ব অভ্যাসের বাইরে ছিট্‌কে গিয়েই হঠাৎ যেন আবেগ-স্পন্দিত কণ্ঠে বলেছেন—

(জীবনে আমার ফুটাইলে কে গো
যৌবন শতদল?)
একি বিস্ময়, একি সৌরভ—
একি শোভা ঢল ঢল!
উথলে দুকূলে ঘন কালো বারি,
নিজ কলগান বুঝিতে না পারি;
জানি না সে কেন হেসে লুটে পড়ি—
কেন চোখে আসে জল।

'মরীচিকা'র সর্বসমেত একচল্লিশটি রচনার মধ্যে দুটিকে 'গান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'যৌবন বিস্ময়'-এ যেমন, 'অভিমান'-এতেও তেমনি পুরোনো কাব্যরীতির অনুসৃতি মাত্র চোখে পড়ে। যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বভাবের বিশেষত্ব এই দুটি লেখার কোনোটিতেই ফুটে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে সমকালীন একজন কবিও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেন নি; যতীন্দ্রনাথও সেই সাধারণ আইনের ব্যতিক্রম ছিলেন না। 'মরীচিকা'র 'রূপহীনা' কবিতাটির কথাই এই প্রসঙ্গে ধরা যেতে পারে। 'তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে,—রূপ না দিলে যদি বিধি হে'—ঠিক প্রসঙ্গগত সাদৃশ্যে না হলেও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের 'রূপহীনা' কতকটা সদৃশ অনুষঙ্গে জড়িত। 'ক্ষণিকা'র সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'স্বামী-দেবতা' প্রভৃতি কয়েকটি লেখার মধ্যে। অনেক কাল পরে 'সায়ম্'-এর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন—

(যে রবি পশ্চিমে ডুবে'
নিত্য পুনঃ ওঠে পূবে
আমাদের সে রবি যে নয়,)
যে রবির পাখি মোরা
আকাশে নাহি যে জোড়া
ডুবিলে তো হবে না উদয়।

রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে এই অনুরাগ সত্ত্বেও যতীন্দ্রনাথ যে আর-এক পৃথক মনোজগতের মানুষ ছিলেন, এবং মনে-প্রাণে সেই পৃথক বিশ্বাস এবং পৃথক অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাতেই তিনি যে ব্যাপৃত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'মরীচিকা'র 'মন-কবি'-এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় তিনি জানিয়ে-

ছিলেন যে, সেকালে বঙ্গবাণীর সেবায় যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন,—তাঁর নিজের তুলনায়,—তাঁরা জীবনের ভিন্ন মহলের বাসিন্দা—

(কমল হতেও যার অধিক কোমল পাণি—
তারাই পূজেছে আর পূজিবে বঙ্গবাণী।)

এবং কবিযশঃপ্রার্থী নিজের মনকে সম্বোধন করে, আরো স্পষ্টভাবে তিনি আত্মসংশোধনের সংকল্প জানিয়েছিলেন—

(যদিও এ জগতের কল্‌জেটা জ্বলছে,
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে ;)
তুইও তাই বল্‌বি ;
বাঁধা পথে চল্‌বি—
আগে পিছে আগাগোড়া আপনাকে ছল্‌বি।

একদিকে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা, অন্যদিকে স্বধর্মের ভিন্নমুখী প্রবণতা, স্বগোষ্ঠীর ভিন্ন আকর্ষণ, স্বশ্রেণীর ভিন্নমনোধর্ম,—এই দোটানার মধ্যে বাস করে, রবীন্দ্রানুসারী নকলনবীশীদের ধিক্কার দিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

(পেতে নেরে শয্যা
দেখে শেখ্ চারিদিকে ঘট্‌তেছে রোজ যা।)
অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে'
মামুলি প্রেমের নেট-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল্ মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

বিশের শতকের প্রথম দিকে রোম্যান্টিক স্বপ্নপ্রবণতার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরীর ধারাতেই স্থূলতর, নিকটতর, বাস্তবতর অভিজ্ঞতার কবি হতে চেয়ে-

ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। 'চামড়ার কারখানা', 'ডাক হরকরা', 'হাট' ইত্যাদি প্রসঙ্গ নির্বাচনের প্রেরণা এসেছিল এই অভিপ্রায়ের প্রসাদে।

প্রেমের প্রলেপ ঘষিয়া ঘষিয়া চক্ চকে করে রাখা,
থেকে থেকে সেই আদিম গন্ধ তবুও পড়ে না ঢাকা।

—মানুষের চামড়ার কথাসূত্রে এ রকম মন্তব্য যদিও সুস্থ মানুষের আনন্দের চিহ্ন নয় বটে, তবু এই ছিলো সে পর্বের খাঁটি 'আধুনিকে'র কথা।

'মরীচিকা' প্রকাশের সময়ে নদীয়া জেলাবোর্ডের চাকরি থেকে তিনি ছুটি নিয়েছিলেন,—তিন বছরের ছুটি। ১৯২০ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই ছুটির বিস্তার। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলেছে, চরকা-খদ্দরের উৎসাহে-উদ্দীপনায় বাংলার ঘরে-ঘরে তখন চাঞ্চল্য! সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বহু কবিতায় সে সব উদ্দীপনার খবর ধরা পড়েছিল—

চরকার ঘর্ঘর গৌড়ের ঘর ঘর!
ঘর ঘর গৌরব,—আপনার নির্ভর!
গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

যতীন্দ্রনাথও চরকা কেটেছেন, খদ্দর পরেছেন—১৯২০-২১ সালের জাতীয় চাঞ্চল্যের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন তিনি। কিন্তু বৃথা আবেগের জোয়ারে ভাসতে কখনোই রাজি হননি তিনি। 'মানুষ'-কবিতাটিতে বাংলার চাষীর কথা আছে; 'চাষার বেগার' লেখাটিতেও একই মর্জির অভিব্যক্তি ফুটেছে—কিন্তু আর যাই হোক্, এসব রচনাকে কোনো কবির বৃহৎ শক্তিমত্তার পরিচায়ক বলা চলে না। বরং সত্যেন্দ্রনাথের ঐ 'চরকার ঘর্ঘর'-ই অপেক্ষাকৃত 'কবিতা' হয়ে উঠেছে। কৃষিপ্রসঙ্গের জের লক্ষ্য করা যায়—যতীন্দ্রনাথের পরবর্তী আরো

একাধিক রচনায়। 'মরুমায়া'-র (১৩৩৭) 'নবান্ন'-রচনাটির কথাই ধরা যাক্। অঘ্রানের কোনো এক শুভদিনে প্রকৃতির অপরূপ রমণীয়তার বর্ণনায় তিনি দেখিয়েছেন সকালের আলোয় দূর দিগন্ত অবধি উদ্ভাসিত—

> বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জরির ডুরে।
> যেথায় আকাশে ভুলে নেমে আসে মানস-মরাল শ্রেণী,
> যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল বেণী।

কিন্তু এমন আশ্চর্য সূর্যালোকময় দিগন্তের মুখোমুখি বসেও যতীন্দ্রনাথের কবিতার কৃষক তার বন্ধুকে বলেছ—

> চিরান্নহীন নবান্নদিনে এসেছ আমার ঘরে,
> শুভখনে শেষ অন্নপিণ্ড অর্পি পরস্পরে,
> চরণে প্রণাম করিব যখন, বন্ধু, মাথার কিরে—
> কণান্বিত করে আশীষ ঢালিয়া দংশিও মোর শিরে।

কেবল প্রকৃতির শোভাতেই কৃষকের পেট ভরে না,—এই বাস্তব দুঃসংবাদটি তাঁর এই লেখাতে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জীবনের এই অসুখকর খবরগুলিই তাঁর কাছে বিশেষভাবে স্বীকার্য বলে গণ্য হয়েছে। বোধ হয়, এই একমুখিতার ঝোঁকে পড়েই তিনি অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন অবস্থাতেও প্রকৃতির রমণীয় ছবি আঁকতে মন দিতে পারেন নি। নদী-চর-আকাশের যে ছবিটির একটু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে তাঁর এই অন্যমনোযোগিতার লক্ষণই স্পষ্ট। চরের কাঁকালে নদী জড়িয়ে আছে জরির ডুরে-র মতো ;—কেবল এইটুকুই স্পষ্ট দেখা গেল, তারপর, আকাশ, মানস-মরাল, দিগ্‌বালার আঁচল ও বেণী, শীতের বেলা ইত্যাদি এলোমেলো নানা উপকরণের বিশৃঙ্খল সমাবেশ মাত্র চোখে পড়ে,—এবং সে-সবই আমাদের দৃষ্টিকে যেন বাধা দেয়। 'মরুশিখা'-র 'সিন্ধুতীরে'-তেও সমুদ্র-দেখার অকৃত্রিম, তীব্র কোনো

আনন্দ নেই। চক্ষু-কর্ণের সহজ সংবেদন তিনি মানতে নারাজ। কবিতাটির প্রথম দু'চরণের মধ্যেই চমকদায়ক একটি অনুপ্রাস পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু সে অনুপ্রাস মোটেই সমুদ্রের উল্লাস-প্রেরিত সহজ বিস্ময়ের সৃষ্টি নয়!

(ক্ষুব্ধ-ফেনিল উগ্রালোর্মিভঙ্গে সঘন-গর্জৎ
হে দূর অপার নীল পারাবার! শোনো এ কবির কৈফ্যৎ)

'গর্জৎ'-এর সঙ্গে 'কৈফ্যৎ'-এর মিল-বন্ধনটি বেশ শ্রমার্জিত, সন্দেহ নেই। এবং সমুদ্র যে তাঁকে কবিতার প্রেরণা দেয়নি, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন শেষ কয়েক চরণে—

(তাই নিরুপায় চির হায় হায় হে সিন্ধু তব জলে,
অমৃত-প্রয়াসে যত ওঠে বিষ তত মন্থন চলে)
তাই এ অকবি কবি,—
দেখেছে, ভেবেছে, এসে ফিরে গেছে,
গাহেনি, আঁকেনি ছবি।

এখানকার এই আত্মবিচারে যতীন্দ্রনাথ সত্যিই বিনয় করেন নি। এক বিশেষ মনোভঙ্গির দুঃখকর অতিরেকের দ্বারা সজ্ঞানে আপনাকে আচ্ছন্ন করা,—এই ছিল তাঁর চিরানুশীলিত স্বভাব। এদিক থেকে বাঙালী কবিদের মধ্যে তিনি এখনো অদ্বিতীয়! সব কবিই সাবালক হয়ে উঠতে চান, স্বাতন্ত্র্য চান, মৌলিক কীর্তি রেখে যেতে চান। কতকটা নিজের স্বভাবে, এবং অনেকটা আপন দেশ-কালের তাড়নায় কবিরা অন্যান্য মানুষের মতোই ক্রমশ পরিণতি থেকে পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছোন। যতীন্দ্রনাথের দেশ-কালের পরিচয় সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু তাঁর স্বভাবের গূঢ়, দুর্জ্ঞেয় প্রদেশটি জরীপ করা দুঃসাধ্য দায়িত্ব। মনে হয়, তাঁর আপন স্বভাবের গূঢ় গভীর স্তরে তাঁরই তীব্রতর কর্তব্যবোধের গুরুভারে তাঁর স্বপ্নপ্রবণ, সৌন্দর্য-সন্ধানী মন

হয়তো নিরন্তর দলিত হয়েছে! নিরানন্দ কর্তব্যবোধের পীড়নে পড়ে বিগত যুগসন্ধির বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ-প্রযুক্তির পরীক্ষায়,—অর্থাৎ পুরোনো প্রথা কাটিয়ে নতুন ভঙ্গি সৃষ্টি করবার গভীর সংকল্পে তিনি মন দিয়েছিলেন। মানুষের জীবন যে মৃত্যুর 'মহারাত্রি' দিয়ে ঘেরা,—তথাকথিত প্রকৃতির কবিরা যে 'দালাল' মাত্র,—'সত্য সত্য সহস্র-গুণ সত্য জীবের দুঃখ', এই দুঃখবাদ-ই তাঁর জীবনবেদ!

জীবনানন্দ বিখ্যাত হবার আগেই যতীন্দ্রনাথের মৌলিকতার প্রসিদ্ধি ঘটেছিল এবং সেই একই প্রহরে অকস্মাৎ দেখা দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক ছিলেন তিনি। আবেগে উচ্ছ্বাসে-ভরা মন ছিল তাঁর;—শৈশবে-বাল্যে সুশৃঙ্খল পরিচর্যা জোটেনি নজরুলের অদৃষ্টে। অল্প বয়সেই জীবনের কঠোর দিকটি তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা দিয়েছিল। তবু অদম্য তাঁর প্রাণ-মন-আত্মা। 'মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'মোসলেম ভারত', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রথম যুগের লেখা ছাপা হয়েছে। 'বিদ্রোহী' লিখে তিনি বিদ্রোহী-কবি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আর, যুদ্ধের কাজে তাঁর যে হাবিলদার পদ ছিল, সেই হাবিলদার-পরিচয়টুকুও বাংলা কবিতার পাঠককে আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথকে সবাই দেখেছিলেন অভিজাত ভাবনার কবি হিসেবে। নজরুলকে দেখা গেল জনসাধারণের কাছের মানুষ,—জীবনের অংশীদার,—স্থূল-কঠোর তিক্ত-বাস্তব অভিজ্ঞতার চারণ বেশে। নজরুল গাইলেন মানুষের বন্ধন-মোচনের গান। শব্দ-ছন্দ-ভাষার বিচিত্র ব্যবহারে তিনি ঘটালেন আটপৌরের সঙ্গে পোষাকীর মিল। তাঁর কবিতায় শোনা গেল দৃঢ় বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। গগনচারী আধ্যাত্মিক বিশ্বাস নয়,—দার্শনিক যুক্তিমগ্নতা

নয়,—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি,—দুঃখের উপলব্ধি থেকে নিশ্চিত জিগীষার সত্যবোধ!

নজরুলের অভ্যুদয়ের প্রায় বছর দশেক আগে যতীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা শুরু হয়। জীবনের নৈরাশ্য-বেদনা-বিফলতার অন্ধকার তাঁর সত্তায় এমনই প্রভাব ছড়িয়েছিল যে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সে অন্ধকার আর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম, ধ্যানী মনের ব্যাপক প্রভাব থেকে তরুণ কবিদের চেতনা তখন নির্গম খুঁজছিল। সেই নির্গমাভিপ্রায় সার্থক হলো নজরুলের আবেগে,—যতীন্দ্রনাথের খেদে-পরিতাপে-নৈরাশ্যে!

যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন ১৩১৬-১৭ সালে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। নজরুল এসেছিলেন ১৩২৭-১৩২৮ সালে। জীবনানন্দ এলেন ১৩৩০-এর কাছাকাছি সময়ে। যতীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই 'মরীচিকা' ছাপা হয় ১৩৩০ সালে; নজরুলের 'অগ্নিবীণা', প্রকাশিত হয় ১৯২২-এ, অর্থাৎ ১৩২৯ সালে; আর জীবনানন্দের প্রথম বই 'ঝরাপালক' ১৩৩৪ সালে। সেসব তারিখের উল্লেখও আগেই করা হয়েছে। 'প্রবাসী', 'বঙ্গবাণী', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'বিজলী' প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হতো জীবনানন্দের কবিতা। 'ঝরাপালক'-এর মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতার মধ্যে তেমন কোনো অভিনবত্বের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু শুরুতেই প্রিয় কবিগোষ্ঠীর প্রীতি লাভ করেছিলেন তিনি। 'প্রগতি'-পত্রিকায় তাঁর বড়ো আয়তনের অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়েছিল। জীবনানন্দের বিশেষত্ব দেখা গিয়েছিল তাঁর চিত্রণসামর্থ্যে,—গভীর, উদাস, অন্তর্মুখী গুঞ্জনের দক্ষতায়। 'ঝরাপালকে' সে বিশেষত্বের চিহ্ন বিরল নয়,—কিন্তু 'ঝরাপালকে' আরো কিছু ছিল।

মদের পাত্র গিয়েছে কবে যে ভেঙে !
আজো মন ওঠে রেঙে
দিলদারদের দরাজ গলার রবে,
সরায়ের উৎসবে !
কোন্ কিশোরীর চুড়ির মতন হায়
পেয়ালা তাদের থেকে থেকে বেজে যায়
বেহুঁশ হাওয়ার বুকে !
সারা জনমের শুষে-নেওয়া খুন নেচে ওঠে মোর মুখে !

এই সব অংশে নজরুলী বচনের প্রভাব সুস্পষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুলের সমবায় সংযোগ থেকেই জীবনানন্দের অত্যয়, বা emergence ঘটেছিল। তাঁর 'বিবেকানন্দ' কবিতাটিতে একই সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মনন-বচনের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

দরিয়ার দেশে নদী
বোধিসত্ত্বের আলয়ে তুমি গো নবীন শ্যামল বোধি !
হিংসার রণে আসিলে পথিক প্রেমমঞ্জরী হা[illegible] ;
আসিলে করুণা-প্রদীপ হস্তে হিংসার অমারাতে,
ব্যাধি মন্বন্তরে এলে তুমি সুধা-জলধির সংঘাতে,

এই উদ্ধৃতির শেষ চরণের 'তুমি' কথাটিতে ছন্দের সৌষম্য বাধা পেয়েছে। বোধ হয়, ছাপার ভুল। সে গবেষণা এখন নিষ্প্রয়োজন। কবিতা হিসেবে 'বিবেকানন্দ' মোটেই উঁচু দরের সৃষ্টি নয়। কিন্তু 'ঝরাপালক'-এর এই ধরনের বিভিন্ন রচনা থেকেই জীবনানন্দের আদিঅবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্র-নজরুলের পথ ছেড়ে ক্রমশ তিনি অন্য পথে এগিয়ে গেলেন। ঐ প্রথম কবিতাটিতেও তাঁর এই সম্ভাবনার ইশারা ছিলো। তিনি লিখেছিলেন—

আমি কবি,—সেই কবি,—

আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি!

আন্‌মনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙ্‌ুল-মেঘের পানে!

মৌন নীলের ইশারায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে!

বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন্ কাজরীর গানে!

দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি'!

হিঙ্‌ুল-মেঘ, ঝরাপালক, মৌন নীলের ইশারা ইত্যাদি ব্যাপারেই জীবনানন্দের স্থায়ী আকর্ষণ! তাঁর এই প্রবণতার গুণেই ক্রমশ 'সোনালি ডানার চিল', 'পিপুলের ভরা বুক,' 'নগ্ন নির্জন হাত,' 'কমলা-লেবুর' বা 'তরমুজের' রূপ-রস গন্ধ-লাবণ্য তাঁর কবিতায় অনির্বচনীয়-তার সংকেত হয়ে উঠেছিল। মধুর হয়ে উঠেছিল বিদিশা-শ্রাবস্তীর দূরত্ব! প্রকৃতির দিকে একটু বিশেষভাবে নিবিষ্ট থাকবার আগ্রহই ছিলো তাঁর বিশিষ্ট সাধনা; এ-ছাড়া তাঁর কবিজীবনের অন্য কোনো আকর্ষণই তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।

'বিকেল বলেছে এই নদীটিকে ঃ শান্ত হতে হবে—'

প্রকৃতি তাঁকে শান্ত করেছিল। বাংলা কবিতার গত বিশ বছরের নানা রকম 'আধুনিকতা'র মধ্যে তিনি সেই চিরকালের শান্ত মাধুর্যের একটি ছবিই যেন বার-বার এঁকেছেন। তারপর শেষদিকে তাঁর কোনো-কোনো লেখাতে দেখা দিয়েছিল দুর্বোধ্যতা। সেও তাঁর গূঢ় মননেরই ভঙ্গি। খ্যাতির শিখরে পৌঁছেও শিল্পীর বহুবিচিত্র পরীক্ষার স্বভাব তিনি পরিত্যাগ করেন নি।

যতীন্দ্রনাথও মাঝে-মাঝে শান্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু সে কামনা তাঁর মর্জির অনুকূল নয়,—স্বভাবের অনুগামী নয়। তিনিও নিজেকে বলেছিলেন—

শান্ত হওরে মন!
তুমি নর নহ, তুমি নর নহ, তুমি শুধু নারায়ণ!
তুমি নারায়ণ, তুমি নারায়ণ, ধরেছ নরের কায়া,
দূর করো সব মানবসুলভ স্নেহ প্রেম দয়া মায়া।

কথাগুলি যতীন্দ্রনাথ অবিশ্যি তাঁর নিজের জবানীতে বলেননি। প্রভাসে তাঁরই শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন,—কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের অবসানে। যতীন্দ্রনাথের এই শান্তির সঙ্গে জীবনানন্দের সহজ শান্তির সাদৃশ্য নেই। যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী,— জীবনানন্দ মুগ্ধ, সমাহিত, বিষণ্ণ!

'শতাব্দী ও সাহিত্য' বইখানির মধ্যে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 'আধুনিক কাব্য' নামে সুচিন্তিত যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, এইবার সেখান থেকে একটু উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে যতীন্দ্রনাথের অগ্রজ ও অনুবর্তী সমকালীন দুজন কবির কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যেতে পারে। সংক্ষেপে,—কারণ, তাঁদের কথা এ-বইয়ের অনেক জায়গায় এর আগেই অনেকবার বলা হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার দু'জনেই ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁদের সম্বন্ধে বাক্-স্বল্পতা মোটেই বিরাগ-প্রসূত নয়। আশা করি, এ থেকে কোনো ভুল-বোঝার কারণ ঘটবে না। সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি। আর, মোহিতলালের মূল কথা সংক্ষেপেই সুপ্রকাশ্য। কবি হিসেবে তাতে তাঁর কোনো মূল্য-হ্রাসের আশঙ্কা নেই। মোহিতলালের চেয়ে বয়সে প্রায় বছর দশেকের ছোটো নজরুলের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা চল্‌তে পারে। নজরুলের লেখার পরিমাণ অনেক,—তাঁর খ্যাতিও প্রভূত; কিন্তু তাঁর রচনার মূল কথা, অথবা, তাঁর ব্যক্তিত্বের

বিশেষত্ব অল্প কথাতেই ব্যক্ত হতে পারে,—সেজন্যে দীর্ঘ আলোচনা দরকার নেই।

নন্দগোপাল লিখেছিলেন—'বিগত মহাসমরের পর থেকে বর্তমা মহাসমরের সূচনা পর্যন্ত এই যে পঁচিশ বছর, এই হল আধুনি কবিতার জন্মকাল। এই সময়টিতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে সংস্কৃতি আচারে অনুষ্ঠানে, পৃথিবীর ইতিহাস কি বিরাট ভাঙাগড়ার ভেত দিয়ে এসেছে, তা মনে করলেই বুঝতে পারি, আজকের সাহিত্যাদে যে ওলটপালট এসেছে, তা মাটি ফুঁড়ে ওঠেনি—তার শিকড় আমাদের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। ইউরোপে, আমেরিকায়, আমাদের দেশে, সর্বত্রই কারণ এক—যেহেতু আজকের দিনে পৃথিবীর এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের যোগটা নিতান্তই ভৌগোলিক নয়, রীতি-মতো সাংস্কৃতিকও।' তিনি আরো জানিয়েছিলেন—'এ যুগের কাব্যে এবং চিত্রে যুগের দোহাই দিয়ে হুজুগও এসেছে প্রচুর এবং তা কোনো সুনিয়ন্ত্রিত মতবাদ, বা সুসম্বদ্ধ জীবন-বেদ থেকে আসেনি, এসেছে নিতান্তই খেয়াল থেকে।' তথাকথিত 'অবচেতনা প্রভাবান্বিত কবিতা' এবং 'অতি-বাস্তবিক' বা 'পরাবাস্তবিক' চিত্রকলার (যার পারিভাষিক বিদেশী নাম হলো Surrealism) কথা মনে রেখেই তিনি এসব কথা লিখেছিলেন।

এইসব আধুনিক লক্ষণ ভালো কি মন্দ, সে প্রশ্ন অবান্তর। বাড়াবাড়িটা সব যুগেই নিন্দনীয়,—সব ক্ষেত্রেই দুঃসহ। তবে, সময়ের অনিবার্য ভাবান্তরটুকু অকৃত্রিম নতুনত্ব হিসেবেই গ্রাহ্য। বাংলাদেশের পটভূমিকার মধ্যে একালের বাঙালী মনের ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল যতীন্দ্রনাথের কবিতায়। তাঁর সমকালীন প্রবীণ খ্যাতিমানরাও এই নতুনত্ব সম্বন্ধে সম-সচেতন ছিলেন না,—সত্যেন্দ্রনাথ এবং মোহিতলালও ছিলেন অন্য ভাবের কবি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনাবলী 'সবিতা' (১৯০০), 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫) এবং 'বেণু ও বীণা'-র (১৯০৬) মধ্যে তাঁর পরবর্তী কবি-জীবনের মূল প্রবণতা বা অভিমুখিতার বীজ নিহিত ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা,—য়ুরোপের আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে গৌরববোধ,—ব্যক্তিগত জীবনে, বয়ঃসন্ধিকালের দুঃখানুভূতি,—আবেগময় বিশ্বমানবতাবোধ,—পরাধীন দেশে স্বাধীনতার সুখস্বপ্নের স্পৃহা ইত্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তখন 'ক্ষণিকা'-পর্ব চলেছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র বিষাদ এবং 'ক্ষণিকা'র লাস্য, সত্যেন্দ্রনাথের সে-কালের লেখাতে এই দু'য়েরই প্রভাব পড়ছিল। কিন্তু মন্ময়তার পথ ছেড়ে, অন্য পথে এগিয়ে যাবার অন্যতর আকর্ষণ ছিল তাঁর পরিবেশের মধ্যেই। 'বেণু ও বীণা'-তেই শব্দ এবং ছন্দের দিকে তাঁর একটু বিশেষ মনোযোগের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল।

> সম্বর হ্রদে, জর্জর দেহে, ঘুমায়ে আছিনু তাই
> লবণে জড়িত লহরের কোলে ঘুমেও স্বস্তি নাই…

'বেণু ও বীণা'র 'মেঘের কাহিনী'র মতন অন্যান্য কবিতাতেও এরকম সুখপাঠ্য ছত্রের অভাব ছিলনা। ক্রমশ দেশবিদেশের কবিদের লেখা পড়তে-পড়তে,—নানা বিদ্যার, এবং নানান্ তথ্যের দিকে মন দিতে-দিতে তাঁর সেই বাল্যকালের শব্দের অনুরাগ এবং ছন্দের আগ্রহ তাঁর আত্মচিন্তা বা ধ্যানের অঙ্কুরটিকে পীড়িত এবং পরাভূত করে একরকম অসুস্থ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ক্রমশ দেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি প্রভৃতি সুবোধ্য কয়েকটি মনোভাবের কবি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বৈদিক পরিমণ্ডলের স্মৃতিসর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে এসে

'হোমশিখা'র (১৯০৭) 'সাম্য-সাম' কবিতায় সেই বঙ্গভঙ্গ-যুগের সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা, অন্তরে তাঁর ঘর ;
রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে ;

নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতার প্রেরণা ছিল 'হোমশিখার' এইসব ছত্রে। নজরুলের আগেই তিনি সেই 'হোমশিখা'তে লিখেছিলেন—

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী,
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তারি, তারি।

'তীর্থসলিল' (১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (১৯১০), এবং 'মণিমঞ্জুষার' (১৯১৫) মধ্যে তাঁর অসংখ্য অনুবাদ কবিতা সংগৃহীত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের রচনা সম্পর্কে আমি অন্যত্র যা বলেছি, এখানে সেইসব মন্তব্যের কিছু-কিছু তুলে দিলে উপস্থিত বক্তব্য সুপরিস্ফুট হবে। মননাতিরেক ও হৃদয়বিরলতা, সাধারণভাবে সত্যেন্দ্রকাব্যের এই দুই প্রধান প্রবণতার কথা সুবিদিত ; ১৮৮[illegible]তে প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথের 'ফুলবালা' বইখানির ফুল-সম্পর্কিত কবিতার প্রভাব পড়েছিল তাঁর মনে। তাঁর 'ফুলের ফসল'-এর (১৯১১) সমকালে দেবেন্দ্রনাথের আরো অনেকগুলি বই বেরিয়েছিল ; 'ফুলের ফসল' গ্রন্থনাম সেই সমকালীন ঘটনারই স্মারক। রবীন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথের কাছে ঋণী থেকেও সত্যেন্দ্রনাথ সে-বইখানির মধ্যে যথার্থ আন্তরিক কয়েকটি গুণের পরিচয় দিয়ে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথের মতন কল্পনার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসও তাতে নেই,—আবার সত্যেন্দ্রনাথের নিজের স্বভাবের মধ্যে অতিরিক্ত তথ্য-মনোযোগের যে দোষ ছিল, তা থেকেও সে লেখাগুলি মুক্ত। একদিকে ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গির সংযম,

অন্যদিকে রোম্যান্টিক ভঙ্গির ব্যাকুলতা, তাঁর কবি-স্বভাবের মধ্যে এই দু'য়েরই যৌগপদ্য দেখা যায়। তাঁর 'কুহু ও কেকা'-র (১৯১২) 'দুই সুর' কবিতায় তিনি জানিয়েছিলেন—

হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে,

গহন প্রাণ-কুহর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহ্বরে।

তাঁর কাব্যে,—বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উন্মেষ ও প্রাচুর্যের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল বসন্তের কোকিল এবং বর্ষার ময়ূর। তিনি আপন মনের গভীরে নামবার চেষ্টা যে করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির কবিতা, বিচ্ছেদ-বেদনা-মৃত্যুর কবিতা, মহাজন বা মহাপুরুষ প্রসঙ্গ, স্বজাতিপ্রীতি বা দেশাত্মবোধের কবিতা,—এবং এইসব বিষয়ের মধ্যে স্থানে-অস্থানে ইতিহাস-পুরাণ-জ্যোতিষ-উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞানের অবাঞ্ছিত বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে শব্দাতিরেক ও তথ্যাতিরেকের বহু নমুনা রেখে গেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। সুইনবার্ন সম্পর্কে ব্রাউনিঙের মন্তব্য 'a fuzz of words' সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ১৯০৭-১০ সালে তিনি যখন প্রচুর অনুবাদ কবিতা লিখতে মন দিয়েছিলেন, তাঁর 'তুলির লিখন'-এর (১৯১৪) কবিতাগুলি সেই সময়েই রচিত হয়। সংস্কৃত পুরাণ, বৌদ্ধ কাহিনী এবং ভারতবর্ষের উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যান অবলম্বনে সর্বসমেত সতেরোটি কবিতায় তাঁর 'তুলির লিখন'-এ তিনি সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মহিমা বর্ণনা করেছিলেন। এই বইখানির 'বিদ্যুৎপর্ণা' ও 'শেষ' কবিতা দুটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাবমগ্ন অবস্থার পরিচয় আছে। সৌন্দর্য-সচেতন কবি লিখেছিলেন—

সপ্ত লোকের সাত মহলে

তুলির লেখা লিখছে কে?

দাও গো মোরে অযুত আঁখি
কুলায় না যে দুই চোখে।

অতঃপর তাঁর 'অভ্র-আবীর-এর (১৯১৬) রূপ-ব্যাকুলতাময় লেখাগুলির মধ্যে সেই 'অযুত আঁখির' ব্যগ্রতাও যেমন দেখা গেছে, তেমনি 'আড়-বাড়,' 'রখেড়িয়া,' 'লব্‌লবি' প্রভৃতি অপরিচিত শব্দের প্রদর্শনী, এবং ইতিহাস, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রের অতিরেক,—তাছাড়া অন্যান্য উৎপাতও কিছু কম ঘটেনি। তারপর, ১৯১৭ সালে তাঁর ব্যঙ্গ-পরিহাসময় কাব্যগ্রন্থ 'হসন্তিকা' ছাপা হয়; এবং ১৯২২ সালে তাঁর অকাল-মৃত্যুর পরে যথাক্রমে 'বেলা শেষের গান' (১৯২৩) এবং 'বিদায় আরতি' (১৯২৪) প্রকাশিত হয়।

সংকীর্ণ আয়ুষ্কালের মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের কাজের পরিমাণ মোটেই কম ছিলনা। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, ধ্যান এবং আধ্যাত্মিকতার রঙে বাংলা কবিতার শব্দ, ছন্দ, ভঙ্গি এবং রীতি যখন কেমন-যেন একরঙা হয়ে উঠছিল, সেই সময়ে,—শব্দ, ছন্দ এবং তথ্য,—প্রধানত এই তিন উপকরণের অন্যতর চর্চা করে তিনি কতকটা নতুনত্বের আবেদন দি[illegible] গেছেন। তাছাড়া অনুবাদের দিকে তিনি যে আমাদের ব্যা[illegible]ক মনোযোগ ঘটিয়েছিলেন, সেকথাও আগেই বলা হয়েছে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল সঞ্চয়নিষ্ঠ মধুকরের ব্যস্ততা। তাই প্রমথ চৌধুরীর মতন স্বল্পভাষী স্বাতন্ত্র্যে তিনি, আত্মস্থ থাকতে পারেন নি—দ্বিজেন্দ্রলালের মতন কেবল দেশপ্রেম আর হাস্য-পরিহাস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাও তাঁর ধাতে সয়নি। প্রেরণার চেয়ে পটুত্ব দেখাবার দিকেই তাঁর কিছু বেশি মনোযোগ থাকার ফলে তিনি বহুকর্মা, অল্পধ্যানী কবি হিসেবেই ইতিহাসে জায়গা পাবেন। যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতি খ্যাতিমান সমকালীনদের ওপর তাঁর প্রভাব থেকেই বোঝা যায় যে, এক সময়ে

বাংলার কবিকুলের মনে তাঁর আবেদন কিছু কম ছিলেন। শব্দপ্রাচুর্য, ছন্দোবৈচিত্র্য, অনুবাদনিষ্ঠা, স্বাদেশিকতা এবং সর্ববিষয়ে জ্ঞান-বাহুল্য—এই নিয়েই সত্যেন্দ্র-কাব্যের বিশেষত্ব; এবং শুধু দোষই নয়,—তাঁর গুণের মধ্যে সবচেয়ে বড়োটি হলো তাঁর মধুকর-ব্যক্তিস্বভাবের অমিত অধ্যবসায়,—অশেষ অন্বেষণ! অধ্যবসায়ী কবির স্বভাব পালন করতে দ্বিধা করেননি তিনি। রবীন্দ্রনাথের দুর্বল অনুকরণকারীরা যখন মননলেশহীন, ঢিলে ভঙ্গিতেই আত্মসমর্পণ করে স্বপ্নাবেশ ভোগ করছিলেন, অকৃত্রিম রবীন্দ্রানুরাগ সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ তখন স্বতন্ত্র একটি পথ খুঁজছিলেন। দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগ লেখাতেই, কবি হিসেবে তিনি শুধু অব্যবস্থিতচিত্ত কর্মকর্তার পরিচয় রেখে গেছেন। কিন্তু তাঁর দু'একটি মাত্র সার্থক রচনার সার্থকতাতেই তাঁর চূড়ান্ত পরিচয় নয়; তাঁর সারা জীবনের পরিশ্রমই তাঁর জয়টীকা! নিরপেক্ষভাবে তাঁর সমস্ত দোষগুণের কথা মনে রাখলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ভাবই বিশেষভাবে জেগে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের কথা পুনরায় মনে পড়ে—'করেছি কর্তব্য যাহা সেইটুকুই আমার যাহা জমা'—উত্তরকালের কাছে সত্যেন্দ্রনাথেরও সেই একই নিবেদন!

ভিন্ন প্রসঙ্গে এগিয়ে যাবার আগে তাঁর বহুশ্রুত অনুবাদ-দক্ষতার অন্তর্নিহিত দোষের কথাটুকুও এখানে সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক্। অনুবাদ রচনাতেও তিনি তাঁর অতি-ত্বরার মনোভাবটি এড়িয়ে চলতে পারেন নি। কীট্‌সের বিখ্যাত কবিতা La Belle Dame Sans Merci-র অনুবাদের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন—

> কমলের মত ধবল ললাটে
> কেন বা ছুটিছে কাল ঘাম?

আবার—

> মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—
> সুন্দরী সে যে পরী-কুমারী···

মূলের ভাব বা প্রসঙ্গের যথাযথ না হোক্‌, যথাসাধ্য আনুগত্য মেনে চলা অনুবাদকের দায়িত্ব। সত্যেন্দ্রনাথ সে দায়িত্বের প্রতি যথোচিত অবহিত ছিলেন না। 'কমলের মত ধবল ললাট' কখনোই 'a lily on thy brow'-এর বঙ্গানুবাদ নয়—বরং 'কুমুদপাংশু ললাট' বলা যেতে পারে ; 'fever-dew', আর 'কাল-ঘাম' এক জিনিস নয়, —'বেদনা-শিশির' বা 'প্রদাহ-শিশির' বল্‌লে হয়তো মূলের কাছাকাছি যাওয়া যায়! তেমনি 'নারী সনে ভেট' কথাটা বড়োই বেমানান। সকলেই জানেন যে কীট্‌সের ঐ কবিতাটি এক অদ্ভুত অনুভূতির রোমাঞ্চময় রচনা,—বিশেষ এক আবহের স্বাদ আছে তাতে। কোল্‌রিজ ঐ কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন—'horror-stricken reticence and magical suggestion'। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের মধ্যে সেসব চিহ্ন নেই! তাঁর বেশির ভাগ অনুবাদেরই সাধারণ ত্রুটি এই অসতর্কতায়! বড়ো ত্বরাগ্রস্ত তিনি!

তাঁর 'মহাসরস্বতী'-র ওপর অনেক সমালোচকের উচ্ছ্বসিত মন্তব্য লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর অনুবাদ-কবিতাতে এবং অন্যান্য বহু মৌলিক কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, এই 'মহাসরস্বতী'-তেও তেমনি কবিকল্পনার যথোচিত স্থাপত্য-গুণের অভাব চোখে পড়ে। যথার্থ ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শের কবিরা শব্দাদির ব্যবহারে যে 'architectural conception'-এর পরিচয় দিয়ে থাকেন, সে-গুণ রবীন্দ্র-সমকালীন এই তথাকথিত ক্লাসিক্যাল-ভঙ্গির কবিদের মধ্যে নেই। একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করবার সংকোচ এতোদিনে অবশ্যই পরিহার্য। একমাত্র মোহিতলালের মধ্যেই সে বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশিত।

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা! চিন্ময়ী! অয়ি জ্যোতিষ্মতী
মহীয়সী মহাসরস্বতী!

শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি, মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী ! অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভা !

—এই বলে 'মহাকাব্য-ধাত্রী, মহাকবিকুলের জননী' মহাসরস্বতীকে তিনি আহ্বান করেছিলেন বটে, কিন্তু সে বন্দনার মধ্যে প্রাণের বিস্ময়ভাব অল্প। পণ্ডিত লেখকের মস্তিষ্কে জায়গা পেয়ে কবির আরাধ্যা মহাসরস্বতী ক্রমশ এইসব কথা শুনেছেন—

সিন্ধু হতে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুৎ-সম্বল,—
বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল।
তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার ;
গোত্রমাতা মুদ্গলানী ঋগ্বেদ ব্যাখ্যানে বীর্য যার,—
ইষ্ট তুমি তার।

এ শুধু ইঁটের পরে ইঁট! এতে তাজমহলের ঐশ্বর্যও নেই, পল্লীকুটীরের স্নিগ্ধতাও নেই।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৯-১৯৫২)

'স্মরগরল'-এর প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় ১৩৪৩-এর অগ্রহায়ণে। প্রায় এগারো বছর পরে ১৩৫৪-র চৈত্র মাসে সে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় মোহিতলাল লিখেছিলেন—'এই কবিতাগুলি তেমন সরল ও স্বচ্ছ নহে, এমন একটা ধারণা অনেকের আছে। 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণীর' পরে 'স্মর-গরল' ;—এই কালের মধ্যে আমার কবিতা যে ক্রমেই প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক, কারণ, কবিমানসেরও একটা বয়স আছে। তাই, এই কবিতাগুলিতে যে প্রৌঢ়ত্ব আছে তাহা চেষ্টাকৃত বা কৃচ্ছ্রসাধনার ফল নহে ; ইহারাও কষ্টকল্পনা-প্রসূত নয়, অতিশয় স্বচ্ছন্দ এবং অদম্য আনন্দের আবেগেই এগুলি জন্মলাভ করিয়াছে।' অতঃপর 'স্মরগরল'-এর

মধ্যে কবিতার 'form'-গত সাকল্যের কথা তুলে তাঁর সমালোচক-সত্তা যেন নিজেরই সৃজনী শক্তির গুণপনা ব্যাখ্যা করতে বসেছিলেন! মোহিতলাল একটু বেশিরকম আত্মপ্রচারব্রতী। তাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইখানির মধ্যেও তাঁর নিজের কবিতার নানাবিধ শ্রেয়ত্বের কথা তিনি একটু বেশি জোর দিয়েই প্রচার করে গেছেন। 'সনেট'-এর মধ্যে কবিতার যে রূপ-গত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, 'ফর্ম-এর উদাহরণসূত্রে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন—'সনেটের 'form' কতকটা কৃত্রিম—উহা একটা সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ণ। কিন্তু কাব্য সাধারণের ঐ 'রূপ', প্রত্যেক কবিতায় স্বতন্ত্রভাবে তাহারই মত হইয়া ফুটিয়া উঠে। ঐ রূপের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, অথচ গুণ হিসাবে সকল রচনায় উহা এক। উহাই ক্ল্যাসিক্যাল কবি-কর্মের একটা লক্ষণ বটে, কিন্তু সেইজন্য আমার কবিতা শুধু ক্ল্যাসিক্যাল নহে, অর্থাৎ ঐ একটি নাম দিয়া তাহাকে বিদায় করা যাইবে না।' রোম্যান্টিক কাব্যে এই 'ফর্ম' বা 'রূপ'গত বাঁধাবাঁধি যদিও পুরোপুরি বাঞ্ছনীয় নয়, তবু সেখানেও 'ফর্মের' প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য,—এই ঘোষণাসূত্রে তিনি বলেছিলেন—'যাঁহারা আবেগময় ভাবকেই কাব্যে অধিক মূল্য দেন, তাঁহারাও যদি সত্যই রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, তবে ভুলিয়া যান যে, ঐ নিছক আবেগটাই মুগ্ধ করেনা—মুগ্ধ করে ঐ 'form', এবং স্টাইলের অব্যর্থতা। কিন্তু সাধারণ কবিতা-পাঠক বা পদ্যপিপাসু যাঁহারা, তাঁহারা ঐ আবেগের দমকা উদ্দাম নৃত্য এবং দুই চারিটা রঙ্গীন শব্দ থাকিলেই কাব্যের চরম রসস্বাদ করিয়া সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করেন।'

সত্যেন্দ্রনাথের কীর্তির বিশৃঙ্খল প্রাচুর্যের ওপরেই মোহিতলাল যেন আপন সৌধ নির্মাণের আবশ্যিকতা অনুভব করেছিলেন। 'ফর্ম' এবং 'স্টাইল', এই দুটি শব্দ তাঁর অসংখ্য গদ্য-রচনার মধ্যে বার-বার

দেখা দিয়েছে। এই দুইটি ব্যাপারের বিশেষ চিন্তা তাঁর অন্যথা আবেগময় কবি-স্বভাবের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমালোচনার ক্ষেত্রে, তাঁর প্রতিষ্ঠার ধারাটি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা একথাও জানেন যে 'কল্লোল,' 'প্রবাসী,' 'শনিবারের চিঠি,' তাঁর সমকালীন বাংলা সাহিত্য-পত্রিকার এই তিনটি প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীতেই তাঁর সমাদর ছিল। 'কল্লোল'-এর নবীন শক্তিমানরা যখন প্রতিষ্ঠিত হলেন, মোহিতলাল তখন কিন্তু তাঁদের আদর্শে এবং অনুশীলনে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন! নজরুল ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের লগ্নে শিষ্যের উদ্দেশে গুরুর মতন তিনি তাঁকে সমাদর জানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরে উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল, তার ইশারা আছে ১৩৩১-এর কার্তিকের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত নজরুল ইসলামের 'সর্বনাশের ঘণ্টা' লেখাটির মধ্যে। নজরুল তাতে তাঁর গুরু দ্রোণাচার্য-কে বলেছিলেন—

> অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ
> ঘনায় আকাশে অসন্তোষের বিদ্রোহ-বারিবাহ।
> দোতলায় বসি উতলা হয়ো না শুনি বিদ্রোহ-বাণী
> এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম হানি।···
> অর্গল এঁটে সেথা হতে তুমি দাও অনর্গল গালি,
> গোপীনাথ ম'ল? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি।

চারদিকের অনস্বীকার্য সত্য সম্বন্ধে মোহিতলাল যথেষ্ট সজাগ ছিলেন না,—'ফর্ম' এবং 'স্টাইল'-এর বিষয়ে পণ্ডিত জনোচিত তর্ক-বিতর্ক প্রচার করে,—মোহিতলাল আর্ট-এর ঘরে 'সত্যসুন্দর দাস' হয়ে বড়ো বেশি পরিমাণে গুরুগিরি করছিলেন,—এই ছিলো নজরুলের বক্তব্য। সেকালের এসব ঘটনার সাক্ষী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর প্রসিদ্ধ 'কল্লোল যুগ' বইখানির মধ্যে সে ইতিহাস

বিশদভাবে লিখেছেন। নবীন বাংলার অন্তরাত্মার চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহের যথাযথ গুণগ্রাহিতা বা সত্যবোধ ছিলনা মোহিতলালের মধ্যে। তাই বিদ্রোহী নজরুল লিখেছিলেন—

কেমন করে যে রটায় এসব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখী গো আমায় ধর ধর! মাগো এত জানে এরা ছল!
এই শয়তানী করে দিন রাত বল আর্টের জয়,
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামী আর মুখ-ভ্যাঙচানো নয়।...
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবেনা এরা
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটশালা হবে নেড়া।...

এসব তিক্ত-কষায় ব্যঙ্গ-বচনের বেশি বিস্তার দরকার নেই। মোহিতলালও শক্তিমান, নজরুলও আন্তরিক। দুজনের মধ্যে সেকালের এই তির্যক বাদ-প্রতিবাদের উল্লেখ থেকে এই কথাটুকুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, মোহিতলালের পণ্ডিতম্মন্যতা বা 'প্রাজ্ঞতা'ই তাঁর সমকালীন কাব্য-প্রবাহের প্রতি সহিষ্ণু ছিল না,—যথোচিত আগ্রহপরায়ণ ছিল না। অথচ, সাধারণ ভাবে আধুনিক কবিতার সার্থকতার যে নিরিখের কথা তিনি তাঁর গদ্য-রচনাবলীর মধ্যে বলে গেছেন, তাতে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সুস্থ বিবেচনার পরিচয় আছে। কিন্তু নিজের কবিতায়, রোম্যান্টিক মন নিয়ে তথাকথিত ক্ল্যাসিক্যাল অঙ্গসজ্জারই চর্চা করে গেছেন তিনি। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' বইখানির মধ্যে 'অক্ষয়কুমার বড়াল' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'আধুনিক কবি-মানসের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই তাহার শক্তির ও অশক্তির কারণ। একদিকে তাহা যেমন একটা তেমনি অতিশয় বিশিষ্ট, কবি-দৃষ্টির সহায়—জগৎ ও জীবনকে একটা আত্ম-কেন্দ্রিক (ego-centric) সৃষ্টিরূপে নূতন করিয়া রচনা করে, অতিরিক্ত মন্ময়তার (subjectivity) ফলে কল্পনা আর একদিকে ক্ষুণ্ণ হয়; তন্ময়তা বা objectivity-র অভাবে, তাহার মধ্যে একটা

অতীন্দ্রিয় অবাস্তবতা অথবা অসুস্থতার আভাস থাকে। বাস্তবকে একেবারে তিরস্কার না করিয়া, মন্ময় কল্পনার দ্বারা তাহাকে আত্মসাৎ করিবার শক্তি যেখানে যত অধিক সেইখানেই একটা অনন্ত রস-সৃষ্টির পরিচয় তত সুলভ।' একথা সর্ববাদিসম্মত। অতঃপর তাঁর কবিতা পাঠের কাজে এগিয়ে প্রথমেই 'স্বপন-পসারী-র 'পাপ' থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে দেখা যাক্। আদিতে তিনি ছিলেন ভোগে বিশ্বাসী। সমালোচক 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনামে সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি অনেক জ্ঞানের কথা বলেছেন বটে,—কিন্তু মনে-মনে তিনি ছিলেন ফরাসী কবি ভিলোঁ-র ভক্ত,—হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'-র সন্দীপের গানই ছিলো তাঁর অন্তরের নিজস্ব গান—

এসো পাপ, এসো সুন্দরী
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চরি!

যাই হোক্ 'স্বপন-পসারী'-র 'পাপ' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—

ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি,' যেইজন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে এত বড় যার প্রাণ!
যেজন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণ-ধন
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ।

'স্মর-গরল'-এর নাম-কবিতার প্রথম স্তবকেই অতঃপর তিনি জানিয়েছিলেন—

আমি মদনের রচিনু দেউল—দেহের দেউল পরে
পঞ্চ শরের প্রিয় পাঁচ-ফুল সাজাইনু থরে থরে।
দুয়ারে প্রাণের পূর্ণ কুম্ভ—
পল্লবে তার অধীর চুম্ব,
রূপের আবীরে স্বস্তিক তায় আঁকিনু যতন-ভরে।

মদনের আরাধনার ভঙ্গিতে মোহিতলালের মননের স্বকীয়তার কথাও এই লেখাটিরই উপান্ত স্তবকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল—

আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ।
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা,
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না।
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত!

এই 'ক্রন্দন-সঙ্গীত'ই মোহিতলালের প্রৌঢ় পরিণতির ফসল। 'রূপ-মোহ' কবিতার মধ্যে তিনি লিখেছিলেন—

আমার অন্তর-লক্ষ্মী দেহ-আত্মা মানসের
শেষ তীর্থে শুচি স্নান করি'
দাঁড়াইল মুক্ত-লজ্জা, সজ্জা শুধু সিক্ত কেশ—
মুক্তাস্রাবী তিমির নির্ঝর!

তখন তাঁর মনে হয়েছে যে 'সর্বসুখ-বিনিময় পণে' যে সুন্দরীর কণ্ঠে তিনি 'কল্পনার পঞ্চনরী' পরিয়েছিলেন,—

যার গুরু উরুতটে একদা পূর্ণিমা-নিশি
পরায়েছে চারু চন্দ্রহার
সরায়ে শিথিল নীবি বধূ যবে সংজ্ঞাহারা
আদরের মধুর লগনে,—
সেই মোর প্রাণেশ্বরী আজ মোরে চিনিল না!
সর্ব স্মৃতি পরিচয় ভার
নিমেষে মোচন করি চাহিল সে আনমনে
অন্তরীক্ষে, সুদূর গগনে।

এবং এ-রকম অভিজ্ঞতার বেদনায় অভিভূত হয়ে—

সহসা স্মরিনু সেই গঙ্গাতীরে শান্তনুর
স্বপ্ন-শেষ প্রেম মরীচিকা—
দেবী সে, প্রেয়সী নয়!—এ যে তাই আরো রূপ!
একি মোহ স্নেহ অবসানে?

মোহিতলালের এই বেদনাই তাঁর 'স্মরগরল'-এর মূল বক্তব্য। কবিদের সংসারে রূপের তৃষ্ণা এবং প্রেমের পিপাসা সর্বজনীন সন্দেহ নেই, কিন্তু মোহিতলাল সেই সর্বসাধারণের অধিকারে নিজের বিশিষ্ট 'স্টাইল' সঞ্চার করে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে নারী-সৌন্দর্যের বা প্রেমের কবিতা দুর্লভ হলেও 'হোমশিখা'-র নারীবন্দনামূলক যে কবিতাটি এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে 'নারী'-কে 'গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা' ইত্যাদি নামে ভূষিত করা হয়েছিল। নজরুল সেই ধারাতেই আরো আবেগ দিয়ে আরো সব বন্দনার কথা শুনিয়ে গেছেন। মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র' বা সমশ্রেণীর অন্যান্য কবিতাতেও সেই ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম-বিস্ময়ের মনোভাব উচ্চারিত হয়েছে। প্রভেদ এই যে, অন্যান্যদের তুলনায় মোহিতলাল অনেক বেশি স্টাইল-সম্পন্ন কবি। 'নারীস্তোত্রের' মধ্যে নয় চরণের উনিশটি স্তবকের গম্ভীর প্রবাহ তাঁর কবিক্ষমতার স্থাপত্য শক্তির পরিচয়বাহক হয়ে আছে। 'বিস্মরণী'র 'পান্থ' কবিতাতে-নারী বিদ্বেষী দার্শনিক শোপেনহাবার-এর উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন—

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি,
অনন্তরহস্যময়ী স্বপ্ন-সখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী!

নেত্র তার মৃত্যু-নীল !—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী !
উরসের অগ্নিগিরি উত্তাপ-উৎস !—জানি তাহা জানি ।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের আমল থেকে অদ্যাবধি নানা কবি রমণীর দেহ-মনের নানা অবস্থা ও ভঙ্গির সপ্রশংস বন্দনা শুনিয়েছেন। কিন্তু মোহিতলালের নাম শুধু সেই ধারার সাধারণ প্রতিনিধিত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবেই স্মরণীয় নয়। তাঁর নারী-বন্দনার নিবিড়তা তাঁর ভোগবৈফল্যবাদের পরম দুঃখানুভূতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। শোপেনহাবার-কে আহ্বান করে তিনি জানিয়েছিলেন—

জীবনের দুঃখ-সুখ বার-বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো !
যাতনার হাহারবে গাই গান,—তৃষ্ণার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু ! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো !'
তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আর বার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো !

নারীবন্দনা, দুঃখবাদ এবং অলঙ্করণ-প্রীতি,—এই তিনটিই মোহিতলালের প্রধান বিশেষত্বের মধ্যে গণ্য। তাঁর 'হেমন্ত-গোধূলির' মধ্যে 'স্মর-গরল'-এর তীব্রতা নেই বটে, কিন্তু, অলঙ্কারধর্ম অক্ষুণ্ণ আছে। বরং তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দশী'-ই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং আভরণবাহুল্যহীন কবিতাসংগ্রহ। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিরন্তর যে বিপরীতের সংঘাত নিহিত ছিল, তার একটি হলো প্রেমে বিশ্বাস,—অন্যটি প্রেমের যাবতীয় পাত্রের বিষয়ে নশ্বরতাবোধ। তথাগত বুদ্ধের সাধনায় তিনি ভক্ত,—কিন্তু বৌদ্ধ শূন্যবাদের তিনি কঠোর সমালোচক। দুঃখ সত্য, —কিন্তু দুঃখমুক্তির বুদ্ধ-নির্দেশিত উপায়টি মোটেই সদুপায় নয়,—এই

তাঁর বক্তব্য। সমস্ত অভাব সত্ত্বেও প্রেমই গ্রাহ্য, প্রেমই স্বীকার্য,—এই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী ধারণা।

> অমৃত-বল্লরী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী-সুধা!—
> কামেরই সে ভিন্ন রূপ—নাম তার জানে বটে সবে;
> প্রাণের রহস্য তবু এক সেই!—জন্মান্ত অবধি
> তাহারি বিহনে কারো মিটে না যে মরণের ক্ষুধা!

'স্মর-গরল'-এর 'বৃদ্ধ' কবিতার এই উপান্ত স্তবকাংশটুকুতেই মোহিতলালের আপন-কথা নিহিত আছে।

সত্যেন্দ্র-মোহিতলালের পরে নজরুলের মধ্যে নতুন ভাবের এবং নতুন প্রকাশরীতির যে আকস্মিকতা দেখা গিয়েছিল, সে বিষয়ে এর আগেই অনেক কথা বলা হয়েছে। নজরুল আন্তরিকভাবে স্বভাব-কবি। তাঁর কাব্যকীর্তির বিচারে ভাবাবেগটাই তাঁর সর্বাধিক প্রধান কথা বলে মনে হয়। তাঁর সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আপাততঃ স্থগিত থাক্। সত্যেন্দ্র-মোহিতলালের সঙ্গে রবীন্দ্র-যুগের নবীন কবিদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাধিক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে মনে হয়, এইবার তাঁর কথা বলে নেওয়া যাক্। বুদ্ধদেব বসু সত্যেন্দ্রনাথের মতন নিরলস কর্মী, মোহিতলালের মতোই আবেগবান, এবং গদ্যে-পদ্যে সমদক্ষ, রবীন্দ্রানুরাগী কবি। সত্যেন্দ্রনাথের মতন তথ্যমুখী না হলেও, তাঁরই মতন কেমন যেন গভীরতাহীন তাঁর ভূরিপরিমাণ রচনা!

বুদ্ধদেব বসু (জন্ম ১৯০৮)

উনিশ-শ' চল্লিশ থেকে চুয়ান্নোর মধ্যে লেখা মোট তেত্রিশটি কবিতা তিনটি পৃথক বিভাগে সাজিয়ে ছাপা হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' বইখানিতে। এই চোদ্দ-পনেরো বছরের মধ্যে, এবং এর আগেও তিনি আরো অনেক কবিতা

লিখেছেন। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে লেখা কাব্যসংগ্রহ 'বন্দীর বন্দনা'-তে কোনো বন্ধুর উদ্দেশে তিনি জানিয়েছিলেন—

রবীন্দ্র ঠাকুর শুধু আজি হতে শতবর্ষ পরে
কবি-রূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবন ঋতু,
সকল লোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা,
শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।

শতকের প্রথম তিরিশ বছরের কবিদের মধ্যে একমাত্র 'রবীন্দ্র-ঠাকুর'-ই যে অমরত্বের অধিকারী হয়ে থাকবেন, এই স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন—'কালের কীটের দন্ত ততদিন করিছে দংশন মোদের রচনা।' তবু, প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় লেখা হয়েছিল—

(মোদের তপস্যা-ফলে
নূতন গগনাঙ্গনে নব জন্ম লভিবে পৃথিবী!)

'বন্দীর বন্দনা'র মোট দশটি কবিতায়,—তারপর, ১৯২৬-১৯২৮-এর মধ্যে লেখা এবং ১৯৩৩ সালে ছাপা 'পৃথিবীর পথে'-র মোট উনিশটি লেখাতে,—তারপর 'কঙ্কাবতীর' প্রথম সংস্করণের (১৯৩৭) পঁচিশটিতেই নারীদেহমদিরাগ্রহী, প্রেমস্পন্দমান, বিরুদ্ধপ্রতিবেশদ্বেষী, আবেগবান কবি বুদ্ধদেব বসুর উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। ১৯৩০-এর 'আমার কবিতা'তে তিনি তাঁর এক কবিতাপ্রার্থিনী পাঠিকাকে বলেছিলেন—

(লোকে যাকে ভালো বলে, তোমার তা ভালো লাগিবে না।
তোমার লাগিবে ভালো, এমন কবিতা
হয়তো লিখিতে পারি কোনোদিন—আশা করা যায়!
নিতান্ত মনের কথা, ছোটো কথা;—খুশি হবে পড়ে।)

তারপর—যে-যুবকে তখন বাসিবে তুমি ভালো,
অন্ধকারে তার কানে গুঞ্জরিবে সে-কবিতা মোর।

'কঙ্কাবতী'র প্রথম সংস্করণে কবিতা এটি। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের পরেই বাংলার দ্বিতীয় সর্বপ্রিয় জীবিত কবি ছিলেন নজরুল ইসলাম। ১৯৩২-এ বেরিয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'। 'প্রথমা'র কবি তখন জানিয়েছেন 'স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি মিছে সারারাতি পথ চায়, হায় সময় নাই।' এতৎসত্ত্বেও বুদ্ধদেব তাঁর বিশ্বাস হারাননি, ব্যাকুল আবেগে নির্ভর রেখে তিনি তখনো বলেছেন—

(সব থেমে যায়—চিরকাল চলে প্রেমের গতি,
কঙ্কা, শোনো,
কঙ্কা গো!)

অতঃপর 'নতুন পাতা'য় নিজের কবিতা সম্বন্ধে পুনরায় কিছু বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন—

একদিন আমার রক্তের ঢেউ থেকে যে উঠে এসেছিলো শুভ্র
আফ্রোদিতের মতো
তাকে দেখে মন্ত্রের মতো ধ্বনিময় হয়ে উঠেছিলো আমার কথা,
সেই তো কবিতা।

সেই অবধি ছিল বুদ্ধদেব বসুর বসন্ত-উপলব্ধির প্রসার। তারপর 'দময়ন্তী'তে (১৯৪৩) দেখা গেল—

(জরার জটিল রেখা শরীরেরে
কঠিন পাথরে ঘেরে;)
এ-দুর্গম দুর্গে বন্দী, অনাক্রমণীয়,
নিশ্চিন্ত আমার সত্তা; অনর্গল, অক্লান্ত ইন্দ্রিয়
এতদিনে রুদ্ধ হলো।

১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করে ১৯৪৩-এর মধ্যেই, অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এই ত্বরাগত শীতের সম্মুখীন হলেন বুদ্ধদেব।

'শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর'-বইখানি পড়তে বসে তাঁর এই শীত-বসন্তের ভাবনা মনে জেগে ওঠা অনিবার্য। সেই সঙ্গে এও মনে হয় যে, 'নতুন পাতা'-য় তিনি ঐ-যে তাঁর কবিতার সঙ্গে 'মন্ত্রের' সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন, তাঁর এইসব কবিতার প্রসঙ্গে সেসব কথা সম্পূর্ণ অবান্তর। 'বন্দীর বন্দনা'-য় তিনি যে নতুন পৃথিবীর কথা তুলেছিলেন,—অন্তত, তাঁর নিজের কবিতায় সে পৃথিবীও অদ্যাবধি অনুপস্থিত। আবেগে প্রগল্‌ভ, ভঙ্গিতে অভিনবত্বপ্রয়াসী, অনুশীলনে অধ্যবসায়ী, অথচ, কেমন যেন শিথিলভাষী কবি তিনি! তাঁর রচনার তর্কাতীত শৈথিল্যের মধ্যেই মাঝে-মাঝে মনে রাখবার মতো কয়েকটি ছবি বা শব্দ,—সুর বা স্বপ্ন,—বিশ্বাস বা বিদ্রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো তীক্ষ্ণ নন তিনি, জীবনানন্দ দাশের মতো গভীরও নন; অজিত দত্তের মতো সহজ-বিস্ময়ে নিশ্চিত আবেদনময় নয় তাঁর অধিকাংশ কবিতা। এ-পর্যন্ত তিনি যা লিখেছেন, তাতে যতো ফেনা, ততো স্রোত নেই,—যতো অঙ্গীকার, ততো সামর্থ্য নেই। তবু তাঁরই 'কবিতা' পত্রিকার প্রয়াসে,—তাঁরই অক্লান্ত পরিচর্যার ফলে পাঠকের রুচি যে একালের 'আধুনিকতা'র প্রতি কিছু সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৯৪৩-এ 'দময়ন্তী'-র নানা কবিতায় যৌবনান্তের যে অনুশোচনা শোনা গিয়েছিল, ১৯৪৭-এর 'মৃত্যুর পরে ঃ জন্মের আগে' কবিতাটিতে তারই পুনরুক্তি ঘটলো। 'শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর'-এর সেইটিই হলো প্রথম কবিতা। শুধু বেদনারই পুনরুক্তি নয়, প্রার্থনারও পুনরুক্তি শোনা গেল। জৈব জাদুসর্বস্ব প্রণয়েরও মৃত্যু নেই,—'আয়ুর সর্পিল সোপানে সোপানে' তার নবজীবন দেখা দেয়, তার

আবার বসন্তের হুলুস্থুল

ব্রহ্মচারী তুমি ? সব্যসাচী ?

১৯৫০ সালের কবিতা এটি। অতঃপর মনস্তত্ত্ব-ঘেঁষা দূরান্বিত অনুষঙ্গ পরিবেষণের এমন প্রয়াস দেখা গেল, যা দেখে অমিয় চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে। 'দময়ন্তী'র 'চলচ্চিত্র' কবিতাটিতেও অমিয় বাবুর এমনি প্রভাব দেখা গেছে। ট্রাম থেকে নেমে, ঘাস মাড়িয়ে, পিচের পথ পেরিয়ে লেখক তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে ঢুকছেন,—চলার সঙ্গে জুতোর আওয়াজ বদলাচ্ছে,—ঘাসে একরকম শব্দ, অ্যাসফল্টে বা কংক্রিটে অন্যরকম। ব্যাপারটা এই। তিনি লিখেছেন—

চাপা কাঁপা কড়া শব্দে জুতো

মগজেরে প্রভেদ জানায়।

মগজেই ঘাস

তারপর,—

স্পর্শময় এ-বিশ্বেরে

রেখেছে আড়াল ক'রে বাটা। ব্যর্থ হাঁটা।

এই একটি কবিতা ছাড়া বইখানির দ্বিতীয় পর্বের মোট এগারোটি কবিতার প্রায় সবগুলিতেই অনুভূতির সততা আছে। তবে, পড়তে-পড়তে মনে হয়, যেন গোটা বাংলাদেশের নয়,—রবীন্দ্রনাথের অন্তহীন প্রভাবের বশীভূত, কলকাতায় চিরবন্দী, কলকাতারই এক কবি কথা বলছেন,—তাঁরই কথা শোনা যাচ্ছে,—সংকীর্ণ জীবনের কথা সে-সব ! তারই মধ্যে মাঝে-মাঝে বেজেছে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ প্রতিধ্বনি—

মানুষেরে বন্দী করার পরম পাপের ক্ষমা

ভালোবাসার ভাণ্ডারেতেও নেই তো জমা।

অথবা 'নববর্ষের জল্পনা' মধ্যে তিনি যেমন বলেছেন—

যে মুহূর্তে বাঁধতে তাকে চাই
আমার মলিন অভিমানের খুঁটে
সে-মুহূর্তে অমৃতরস বস্তু হয়ে ওঠে।

'রবীন্দ্রনাথের প্রভাব' কথাটার মধ্যে অণুমাত্র অনুযোগের খোঁচা নেই। কোনো বিশেষ বিশ্বাসে কোনো বিশেষ কবিরই চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকার কিন্তু শিল্পক্রিয়ার বিশেষত্বের ওপর এক-একজনের বিশেষ নামাঙ্ক থেকে যায়। 'নববর্ষের কল্পনা'-তে রবীন্দ্রনাথের শিল্পক্রিয়ারই যেন অনুকরণ ঘটেছে। 'প্রণয়-গাথা'তেও কতকটা তাই হয়েছে। 'নেপথ্য-নাটক' কিন্তু সেরকম নয়। নাটকীয় নৈরাত্ম-ভঙ্গির সঙ্গে নগরান্তরীণ জীবনানুভূতির গীতল (lyrical) ঝঙ্কার মিশে গিয়ে 'প্রাত্যহিকের বাধ্য বাঁচায়, বন্দী দেহের ক্ষুব্ধ খাঁচায়'-পাওয়া রমণীয় এক অভিজ্ঞতার সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে সেখানে। এই পর্বের আর দুটি কবিতা উল্লেখযোগ্য,—একটি হলো 'উপলব্ধি', অন্যটির নাম '৩০ জানুয়ারী, ১৯৪৮'। প্রথমটিতে ১৯৪৮-এর বাংলা দেশের, এবং দ্বিতীয়টিতে মহাত্মাজীর মৃত্যুর কথা আছে। বাংলা দেশের সেই বিয়াল্লিশের মূর্তি দেখে তিনি বলেছিলেন :—

হে বাংলা, আমার বাংলা,
কী যে অনির্বচনীয়
হৃদয়-মন্থন-করা তোমার অমিয়।
যেখানে দুর্বল তুমি সেখানে দুঃখের শেষ নেই,
যেখানে তোমার শক্তি, সেথা তুমি অনাক্রমণীয়।

গান্ধীজীর মৃত্যুবিষয়ে শোকাচ্ছন্ন জগতের কথা ভেবে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—'অসম্ভব আজীবন শোক করা।···'কান্না থামে।··· তারপর'? অর্থাৎ, ক্ষণকালের আবেগমাত্র হলেই চলবে না,—শোক

জীবনের গভীর ভিত্তি স্পর্শ করুক,—মানুষের বিশ্বাস, আচরণ, অভিব্যক্তি সুস্থ হোক্।

তারপর বইয়ের তৃতীয় পর্বের শুরু।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে 'দময়ন্তী'-র মধ্যে তিনি যখন জরার কাঠিন্য-বোধ প্রকাশ করেছিলেন, 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-এর তৃতীয়-পর্বের প্রথম কবিতা 'মধ্য-তিরিশ' তারই কাছাকাছি সময়ের লেখা। 'দময়ন্তী'-র প্রকাশ-কাল ১৯৪৩; আর, এই কবিতাটির রচনাকাল ১৯৪৪। 'মধ্য-তিরিশ'-এ বলা হয়েছে—

মধ্যতিরিশের ইস্টেশনে গাড়ি এসে থামলো।
বড় জংশন, লাইন বদল হবে, গাড়ি দাঁড়াবে কিছুক্ষণ।
কালো কাপড় পরা প্রহরী এসে বললে,
'যৌবন রাজ্যের সীমান্ত আমরা পেরিয়ে এলাম
এবার যাত্রা হবে বার্ধক্যভূমির দিকে।'

'কালো কাপড় পরা প্রহরী'-র কথা শুনে শুরু হলো কবির স্মৃতি-রোমন্থন। মনে পড়লো 'শ্যামল সমতল শৈশবদেশ',—'ছোটো, ঈষৎ রুক্ষ, বন্ধুর' কৈশোর-দেশ। স্মৃতির সুখাবেশে—

দেখতে দেখতে যৌবনরাজ্যে এসে পড়লাম,
যেদিকে তাকাই, চোখ আর ফেরেনা।
আকাশে-বাতাসে অনর্গল অপরিমিত উচ্ছ্বাস।
দিন রাত্রি দুই বোন আবার সপত্নী,
কেন না দুজনেই আমার প্রেয়সী।

কিন্তু যৌবনের সব কিছুই তাঁর যে ভালো লেগেছিল, তা নয়। তিনি বলেছেন—

অনেকগুলো সুড়ঙ্গ পার হতে হলো,
কোনোটা লম্বা, কোনোটা আঁকাবাঁকা, কোনোটা দুর্গন্ধে আবিল।

সে অন্ধকারে কখনো ভয় পেয়েছি, কখনো রুদ্ধ হয়ে এসেছে নিশ্বাস, তারপরেই খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে মনে হয়েছে নবজন্ম হলো।

তারপর গাড়ি চলেছে আরো দ্রুতবেগে,—তাঁর সব সুখ-দুঃখ ছাপিয়ে উঠেছে অবাধ গতির সুখ। এইভাবে কিছুক্ষণ চলতে-চলতে গাড়ি পৌঁছেচে মধ্যতিরিশের ইস্টেশনে। সেখানে প্রহরী বলেছে—'যাত্রীকে এবার মালের বোঝা কমাতে হবে'। বেঞ্চির ওপর শুয়ে ছিল স্বপ্নকুহকগ্রস্ত কবির কুকুর—সে হলো 'সাফ্ল্য উচ্চাশা'-র প্রতীক। গম্ভীর স্বরে প্রহরী বলেছে—'ওকে আর রাখা চলবে না।' অনেক দিনের পোষা কুকুরকে কিন্তু ছাড়তে মায়া হয়—

এই দীর্ঘ পথে ওকে নিয়ে কষ্ট পেয়েছি অনেক,
ওর ক্ষুধার আন্দাজ খাদ্য কোথায় জুটবে, সে এক ভাবনা।
কখনো মনে হয়েছে ওকে সঙ্গে এনে ভালো করিনি,
ও যে প্রভুর উপরেই প্রভুত্ব করে।

কিন্তু—

আজ যখন ওকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো,
কষ্ট তো হলোই, কিন্তু সেই সঙ্গে শান্তিও যেন পেলুম।

আবার চলতে লাগলো গাড়ি। এবার বার্ধক্যের দিকে যাত্রা। বার্ধক্য রিক্ত, শুভ্র, অকিঞ্চন,—

তার গৌরব গিরিচূড়ার স্তব্ধতায়
ঠাণ্ডা আকাশের কঠিন নির্লিপ্ত নীলিমায় তার মহিমা।

বার্ধক্য অনেক উঁচু। সেখান থেকে জীবনের সবটা দেখতে হবে। চোখে পড়া চাই সব কিছু। সেখানে আসক্তির আবেশ যাবে, অর্জনের ক্ষুধা যাবে, অধিকারের ব্যাকুলতাও ছেড়ে যাবে। প্রহরী সহজ কথায়, অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়েছে,—সহজ এবং মর্মান্তিকভাবে—

যা চেয়ে পেয়েছো তা ভুলে যাবে,

যা চেয়ে পাওনি তা আর চাইবে না।

রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকে বেদবাক্যের গম্ভীর স্পন্দনের মধ্য দিয়ে মনকে যেমন নিজকৃত কর্ম স্মরণ করবার আহ্বান জানানো হয়েছিল, বুদ্ধদেবের 'মধ্যতিরিশ'-এর প্রহরীও যেন সেই পূর্ব দৃষ্টান্তের স্মারক।

প্রহরী বললে, জিজ্ঞাসা কর নিজের মনকে

কেন না চোখ কিছুই ছাখে না, মন সব ছাখে।

তখন যাত্রী বললেন—

যদি দেখতে না পাই তাহলে কী হবে ?

এই ভ্রমণ কি ব্যর্থ হলো, বাড়ি ফিরে কিছুই কি বলতে পারবো না ?

তার উত্তরে প্রহরীর কথা—

বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার মাকে পাবে,

তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না,

শুধু কোলে টেনে নেন।

এইসব কথার মধ্যে একলা মানুষের গভীর বেদনা বেজেছে। 'শীতের আকাশে চাঁদের মতো'—নিঃসঙ্গতার এই রোম্যান্টিক উপমা ব্যবহার করে সে একাকিত্বের আভাসমাত্র দেওয়া যায়। শিল্পীর নিঃসঙ্গতার বেদনা বুদ্ধদেব একটু বেশি জোর দিয়েই বোঝাতে চান। এক হিসেবে সব মানুষই তো সঙ্গীহীন। ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সেই সমুদ্রলীন দ্বীপের উপমা মনে পড়ে। ১৯৫২ সালেও বুদ্ধদেব তাঁর গদ্য-রচনার মধ্যে শিল্পীর এই নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন। তাঁর স্বাধীনতা আর নিঃসঙ্গতা যেন একই চৈতন্যের দুটি নাম। তাঁর নিজের গদ্য-রচনা থেকেই এ-বিষয়ে আরো কথা তোলা যায়, যেমন—

'যাঁকে শিল্পী বলি, তাঁর বুদ্ধি পূর্ণজাগ্রত, সংবেদনশীলতা চরম, জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অবিরলভাবে বেড়ে ওঠেন তিনি, কোনো একটা জায়গায় এসে আটকে যান না।'—এবং 'মানুষ হিসেবে সাধারণ সুখদুঃখ সকলের সঙ্গে সমানভাবেই তিনি ভোগ করবেন,—কিন্তু যখন শিল্পী তখন ঐ মানব-ভাগ্যের অন্তর্গত হয়েও তাঁকে দেখতে হবে যেন বাইরে থেকে,—বল্‌তে হবে এমনভাবে যেন তিনি অংশভাগী নন, দর্শক এবং দর্শয়িতা বা সূত্রধর। ঘটনার উতরোল বিশৃঙ্খলায় বিহ্বল হলে তাঁর চলবে না; অর্থ বোঝার জন্য, অন্বয় সাধনের জন্য তাঁকে তখনকার মতো হতে হবে মনের দিক থেকে আত্মস্থ, আত্মসম্পূর্ণ।'

এ মন্তব্য সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু এর ভেতরেই বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত বিশেষ প্রবণতার চিহ্ন আছে। 'দময়ন্তী-র মধ্যেও দেখা গেছে,—এর আগে আর একটি রচনা থেকেও ক'লাইন তুলে দেখানো হয়েছে যে কী সে প্রবণতা! আবার সেই লাইনগুলি স্মরণ করা যাক্‌—'মনে হয়—আর কারে নয়—ভালবাসি ভালবাসারেই'। এবং—

> যে-ভালোবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু—
> তীব্র, মত্ত আমার হৃদয়! আত্মহারা আমার হৃদয়!

একদিকে, শিল্পীর সুস্থ স্বাধীনতাবোধ—অন্যদিকে, তাঁর নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা—এই দুটো দিক আরো তলিয়ে দেখা দরকার। নিঃসঙ্গ এবং আত্মস্থ হয়ে শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করবেন, সে তো খুবই প্রত্যাশিত সত্য। কিন্তু বিশেষ কালের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাষ্ট্র-ব্যবস্থাগত বিভিন্ন সুখ-সুবিধার মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালী সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করে পারিপার্শ্বিক জগতের যে সহজ, স্বাভাবিক আরাম পাওয়া গেছে, সেই আরাম কি শুধুই স্বপ্নময়, স্মৃতিময়, দূর-নিরীক্ষাময় ভাবালুতার প্রেরণা হয়ে থাকবে?—কেবলই বিষাদ-চিন্তায় অবকাশ যাপন?—

বসে বসে ভাবতে লাগলাম।

আমি তো কোনো কাজেই লাগি না, পারি না পান সাজতে,

কুটনো কুটতে, পেরেক ঠুকতে,...

—শুধু এই ভাবনাই? এই ভাবনার মধ্যে স্বাধীন শিল্পীর আত্মা-বিষ্কারের জয়যাত্রার গান নেই, বাজনা নেই, প্রসন্নতা নেই। এ হলো নিরুৎসাহ মনের ব্যসন। মনের নিতান্তই প্রাকৃতিক মাধ্যাকর্ষণের নমুনা এসব জিনিষ। শিল্পী শুধু কি এই অর্থে আত্মবিভোর? শিল্পী কি কেবলই অলস-ভাবুক? বাড়ির চাকর দেশে গেলে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীবাড়িতে স্ত্রীর খাটুনি বাড়ে, আর স্বামী সেই দুঃখের দৃশ্য দেখতে থাকেন! স্বামী যেমন সক্রিয় অংশভাগী নন, কেবল গৃহকর্মব্যস্ত স্ত্রীর পরিশ্রমের সমবেদনাময় দর্শক মাত্র,—বুদ্ধদেব বসুও তেমনি দর্শকের ভূমিকায় আসীন। কিন্তু তিনি 'দর্শয়িতা'-র ভূমিকা নিয়েছেন বলেই তাঁর ঐ বইখানির তৃতীয়-পর্বের দ্বিতীয় কবিতা 'শুধু দৃষ্টি' থেকে ওপরের উদ্ধৃতিটুকু ব্যবহার করতে হলো। এবং আরো একটু উদ্ধৃতি না দিলে কথাটার জের মিটবে না। পরিচারক কালীচরণের দারিদ্র্য, সারল্য,—তার সহজ এবং তুচ্ছ সুখের অমূল্যতা ইত্যাদি ভাবনা ভেবে অবশেষে তিনি বললেন—

তার কাজটাই শুধু দেখি, মানুষটাকে চোখে পড়ে না।

এখন সে দেশে গেছে, ঘোলা জলের স্রোতের মতো

থেমে-থেমে চলছে আমাদের দিন,

তাইত ভাবতে হচ্ছে তার কথা।

সেটা অস্বস্তিকর।

হঠাৎ দেখে মনে হতে পারে যে, এসব ব্যাপার রবীন্দ্রনাথও হয়তো একই ভাবে ভাবতেন, এবং একই ভাবে বলতেন। রবীন্দ্র-শিষ্য বুদ্ধদেব সাধ্যানুসারে গুরুদেবের অনুসরণ করেছেন। কৃত্তিবাসের

মধ্যে কবিচন্দ্রের লাইন খুঁজে বার করতে পণ্ডিতরাও কষ্ট বোধ করেন। চণ্ডীদাসের সাঙ্গ জ্ঞানদাসের অনেক লাইন মিশে গেছে। বড় কবিদের মধ্যেও অনায়াসে অনুকরণসাধ্য কতকগুলি প্রদেশ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণসাধ্য এলাকাটা বুদ্ধদেব আয়ত্ত করেছেন। খুঁটিয়ে দেখলে অবিশ্যি দু'একটি শব্দে, কোনো-কোনো ভঙ্গিতে,—চিন্তার গভীরতায় এবং শব্দের ধ্বন্যর্থসমন্বিত ঐশ্বর্যের মাত্রায় বুদ্ধদেবের আপেক্ষিক লঘুতা চোখে পড়বে। কিন্তু সে কথা নয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং কালগত যেসব অবস্থার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বিশেষ শিল্পিকৃত্য পালন করে গেছেন,—ভিন্ন অবস্থায় আসীন পৃথক ব্যক্তিত্বময় ভিন্ন শিল্পীও কি ঠিক তাই করবেন? তাঁর নিঃসঙ্গ আত্মস্থতা কি তাঁকে ভিন্ন পথের পথিক এবং ভিন্ন অবস্থার অধিবাসী হিসেবে আত্মপ্রকাশের সত্য রক্ষার প্রেরণা দেবে না? তৃতীয় কবিতা 'ব্যক্ত' বড়ো জোর কলেজ ষ্ট্রীট এলাকার একটি বইয়ের দোকান মনে করিয়ে দেবে। কোনো এক সাহিত্যামোদী, সাহিত্যিক-প্রিয়, প্রবীণ পরিচিত ব্যক্তিকে হয়তো একটু বেশি স্পষ্টভাবে মনে পড়বে। কিন্তু এরই নাম শিল্পীর আত্মস্থতা? কালীচরণের অভাবে যা মনে হয়েছিল,—দোকানের মালিক অবন্তীবাবুকে উপলক্ষ্য করে,—তিনি ঠিক সেই কথাই পুনরায় বললেন—

অন্ধ আমি, মনে আমার অন্ধকার,
রোজ যাকে দেখি তাকেও দেখিনা—
আমি আবার দৃষ্টি দেবো কাকে,
আমি আবার আলো জ্বালবো কার ঘরে।

এসব মন্তব্য কবিতা হয়নি বললে অন্যায় হবে। কিন্তু এ যেন এক-জনের কণ্ঠে আর একজনের অজ্ঞানকৃত অনুকরণ! যাকে ভালো লাগে, তার নকল চলতে থাকে মনের অদৃশ্য নানান্ অঞ্চলে। জীবনানন্দ তাঁর

লেখাতে ঘাস, হরিণ, উজ্জয়িনী, বিদিশা, ইত্যাদি শোনাবার পরে বাংলার অনুকরণপ্রবণ কবিরা দলে-দলে সেই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'নগ্ন হাত' প্রয়োগটি তাঁর 'ঝরা পালক'-এর মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। তার অনেক পরে 'মহাপৃথিবী'-তে তিনি সেই ছবিই আবার নতুন রঙে, নতুন উৎসাহে এঁকেছিলেন। নিজের অপরিস্ফুট, অসমাপ্ত কথা স্ফুটতর হোক্—এ বাসনা দোষের নয়। জীবনের ঢেউ খেতে-খেতে তিরিশ বছর আগেকার কথা হঠাৎ সার্থকতম প্রকাশের লগ্নে এসে পৌঁছতে পারে। জীবনানন্দের জীবনে তাই-ই ঘটেছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথেরই ভক্ত পাঠক। রবীন্দ্রনাথের কথা, সুর, ভঙ্গি তাঁকে বড়ো বেশি নাড়া দেয়। যতীন্দ্রনাথ বা নজরুলের মতন পৃথক মর্জিবান মানুষ নন্ তিনি। 'ব্যক্ত' থেকে যে দুটি লাইন তোলা হয়েছে, তাতে কেমন-যেন 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট'-এর ক্ষীণ অনুকরণ শোনা যাচ্ছে। তফাৎ অবিশ্যি ঠিকই ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ কখনোই মন-মরা মানুষ ছিলেন না। বুদ্ধদেব বড়ো বিষণ্ণ! তিনি শহর কলকাতার ভক্ত। তাঁর প্রথম যৌবনের কলকাতা,—এবং উত্তরকালের সমকালীন কলকাতা এই দুয়েরই তুলনা ফুটেছে তাঁর লেখার মধ্যে—আর, তিনি বলেছেন—

> ফিরে এসো, আমার স্বপ্নের কলকাতা—
> আজ-ও তো এই কথাই বলি।

বুদ্ধদেব এই মর্জির মানুষ। ইতিমধ্যে গঙ্গায় অনেক জোয়ার-ভাঁটা খেলে গেছে। সময় বদলাচ্ছে। নতুন মানুষ নতুন কলকাতায় এসে জমা হয়েছে। তাদের শ্রম, স্বেদ,—কিংবা তাদের ন্যায়, অন্যায়, ক্ষুধা বা ক্ষুধামান্দ্যের দর্শক নন বুদ্ধদেব,—দর্শয়িতাও নন। ১৯৫৩ সালেও কলকাতাকে তিনি বোধ হয় তিরিশের দশকে ফিরে যেতে বলেছেন! ১৯৩০-এর আমলে তারুণ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথের

নানা শব্দ তিনি দ্বিধাহীন ঔদার্যে আত্মসাৎ করেছিলেন। 'অজানিত আকাশ', 'পরম সুন্দর', 'অমৃতের পিপাসা', 'ধরণীতে যত গান গেয়েছিনু', 'মহান দুঃখের বর'—এই সব শব্দ-সমাবেশ অবিশ্যি কোনো একজন বিশেষ কবির সম্পত্তি নয়, কিন্তু অন্যেরা যখন এই শ্রেণীর শব্দ ব্যবহারে আগ্রহ বোধ করেন, তখন তারই মধ্যে এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবির প্রভাবের ব্যাপ্তি বোঝা যায়। 'বন্দীর বন্দনা' থেকেই এই নমুনাগুলি তোলা হলো। সে বইখানির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'গেনু', 'পারিনে' প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ, এবং 'সনে' (সহিত অর্থে), 'পানে' (অভিমুখে অর্থে), 'তরে' (নিমিত্ত অর্থে), 'সেথা' ইত্যাদি পদ্যে-প্রযোজ্য শব্দের দৃষ্টান্ত আছে। সে সময়ে তিনি ছিলেন 'যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধু-তটভূমে'! বুদ্ধদেবের নিঃসঙ্গতাবোধ সেই সেকালেরই পুরোনো জিনিস। 'বন্দীর বন্দনা'-তেই তিনি (১৯৩০) বলেছিলেন—

আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে।

ঐ একই কবিতায় (শাপভ্রষ্ট) মানব-জীবনের 'নিত্য-নব অমঙ্গল' লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন—

দৈন্য-ভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার।
—যৌবন আমার অভিশাপ।

সেদিনের নবীন কবি-কল্পনার বলে জগদ্ব্যাপী অমঙ্গলের মধ্যে 'গগনের স্নিগ্ধ আলো'র স্পর্শ লাভ করে নিজেকে তিনি ভেবেছিলেন 'শাপভ্রষ্ট দেবতা'।

শাপভ্রষ্ট দেব আমি।
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মত
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি শূন্যতায় উড়ি যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।

সময়ের ঘোলা-জলের স্রোতকে তিনি যথাসাধ্য এড়িয়েই চলেছেন। কিনারায় দাঁড়িয়ে স্রোতের অনিত্যতা সম্বন্ধে যা-কিছু তিনি ভেবেছেন, সে সবই তাঁর আত্মচিন্তা,—তাঁর নিজের সম্বন্ধে চিন্তা,—নিজের নিঃসঙ্গতার চিন্তা! 'বন্দীর বন্দনা'র 'কালস্রোত' কবিতার ক'টি লাইন তিনি বোধ হয় ১৯৫০-এর পরেও কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত করে আবার কোনোদিন লিখতে পারেন। আবার বলতে পারেন—

কালের অধীরা নদী অসঙ্কিত যেতেছে বহিয়া…

*   *   *

আমি শুধু স্তব্ধ চিত্তে বসে থাকি স্রোতস্বিনী-তীরে।

বুদ্ধদেব কৈশোরে উচ্ছ্বসিত, যৌবনে সংশয়াচ্ছন্ন এবং ত্বরাগত প্রৌঢ়-বয়সে তাঁর অতি-লালিত নিঃসঙ্গতায় বিশেষ বিষাদভারাক্রান্ত কবি। কিন্তু একালের বাংলা কবিতার নানামুখী অনুশীলনে তাঁর উৎসাহের কথা সর্ববাদিসম্মত।

একালের মর্জি : অবক্ষয় ও অবিশ্বাস : কবিতার রীতিভেদ

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রবণতার প্রভাবে সেকালের করুণানিধান প্রভৃতি কবিরা স্বপ্নাবেশময় সৌন্দর্য-সন্ধানের যে ব্যগ্রতা উপলব্ধি করেছিলেন, একালের বুদ্ধদেব বসু অবধি তারই বিস্তার লক্ষ্য করা গেল। কুমুদরঞ্জনের পল্লী-প্রীতি, মোহিতলালের ভোগবাদ এবং ভোগবৈফল্য সম্বন্ধে শোচনার ভাব, বুদ্ধদেবের নিঃসঙ্গতাবোধ ইত্যাদি ব্যাপার সেই মূল মনোভাবেরই ভিন্নমুখী সম্প্রসারণ মাত্র! কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিনিষ্ঠা এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, যতীন্দ্রনাথের মরুচৈতন্য বা দুঃখবাদ অন্য দৃষ্টির পরিচায়ক। প্রথম দল রবীন্দ্র-বরণের মধ্য দিয়ে রাবীন্দ্রিক অবক্ষয়-অবস্থার প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন;

দ্বিতীয় দল রবীন্দ্র-যুগের যুগপ্রভাব আত্মসাৎ করেও রবীন্দ্রনাথের জগৎ-সংসার সম্বন্ধে ছিলেন প্রবল অবিশ্বাসী। প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় এই অবিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছিলো স্মিতহাস্যের সমবায়ে। আর, যতীন্দ্রনাথ একদিকে দ্বিজেন্দ্রলালের গঙ্গা-বন্দনার 'বিগলিত-করুণা'-ধারণার প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন—

'হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী
যুগে যুগে নরনারী-অফুরান-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী,

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'-র চেনা-অচেনার রহস্য-পরিবেশ নস্যাৎ করে দিয়ে তিনিই লিখেছিলেন—

ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা উপঝর্ঝরণ,
গগন ধরণী মেঘে ধূসর বরণ ;
দাতুরী প্রভৃতি সব
নিভৃতে করিছে রব,
পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ।

যতীন্দ্রনাথের 'মরুমায়া'-র 'দুঃখের পার' থেকে এই যে ক'টি ছত্র এখানে তুলে দেওয়া হলো, এরকম প্রবল অবিশ্বাস তাঁর শেষ দিকের কবিতায় সর্বত্র পাওয়া যায় না, বটে, কিন্তু তাহলেও এই ছিল তাঁর আসল মনোভাব। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কাব্যের প্রথম পর্যায়' (১৩৬২) বইখানির মধ্যে 'জড়বাদী' যতীন্দ্রনাথের এই অবিশ্বাসের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন—'যতীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম হইল মানুষের দুর্বলতা—পরম পরাজয়,'···'তাঁহার জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়া পুণ্য ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বদলে পাইয়াছেন 'জীবন-মরুক্ষেত্র', আর তিনি

সারতত্ত্ব যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা হইল 'জীবন-মরুক্ষেত্রে শ্রীমদ্ দুর্ভাগবদ্গীতা। এই 'দুর্ভাগবদ্-গীতা'য় তিনি যে সত্য, যে তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাইয়াছেন তাহা তাঁহাকে প্রেরণা জোগাইয়াছে শুধু 'বদ্নাম সংকীর্তন'-এর'।

এ-যুগের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্র-ভাবনার বিরুদ্ধে এইরকম বিরোধের দৃষ্টান্ত খুব বেশি ঘটেছে যে, তা নয়। যাই হোক, এ-পর্বে ১৯১০-এর মধ্যেই যাঁদের জন্মবর্ষ, প্রধানত সেইসব কবিদেব দিকে নজর রাখলে, অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে এখানে যাঁদের কথা বলা হলো, তাঁরা ছাড়া সুকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৭-১৯২৩), মণীশ ঘটক (১৯০১), প্রমথনাথ বিশী (১৯০২), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩), জসীমউদ্দীন (১৯০৪), হেমচন্দ্র বাগচী (১৯০৪), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪), হুমায়ুন কবীর (১৯০৬), বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬), সুনীলচন্দ্র সরকার (১৯০৭), নিশিকান্ত (১৯০৯), অরুণ মিত্র (১৯০৯), সঞ্জয় ভট্টাচর্য, অশোকবিজয় রাহা এবং বিমলচন্দ্র ঘোষ (তিন জনেরই জন্মবর্ষ ১৯১০) প্রভৃতি কবিদের নাম স্মরণীয়। অচিন্ত্যকুমার প্রমথনাথ, অন্নদাশঙ্কর, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি লেখকদের গদ্য-রচনার বিস্তার তাঁদের কবিতার তুলনায় অনেক বেশি। সুকুমার রায়চৌধুরী কিশোরপাঠ্য গদ্য-পদ্যের প্রতিভাধর লেখক হিসেবে অশেষ খ্যাতি পেয়েছেন; জসীমউদ্দীন পল্লী-কবি হিসেবে যশস্বী। রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ থেকে এই দুজনের দূরত্ব বা নৈকট্য, কোনোটাই প্রাসঙ্গিক নয়। তাই তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তবু সুকুমার রায়চৌধুরীর কথা একটু বিশেষভাবেই বলা দরকার। বাংলা জোড়কলম শব্দের অভাবিত-পূর্ব সম্ভাবনা তাঁরই কলমে বিশেষভাবে আবিষ্কৃত হলো। তাঁর কবিতা ছোটদের জন্যে হলেও বড়োদের এবং সর্বসাধারণের সেব্য। তাছাড়া তাঁর ছন্দের হাত এবং কৌতুকের মর্জি তুলনাহীন বললে

অন্যায় হয় না। প্রমথনাথ এবং অচিন্ত্যকুমার উভয়েই রবীন্দ্র-বরণের দলে; তাঁদেরও নিজস্ব দৃষ্টি আছে বৈ কি; কিন্তু বাংলা কবিতার সমকালীন প্রায় অর্ধশতকের সক্রিয় আন্দোলনের মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিগত সাধনাই স্মরণীয়,—জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবিদের যেমন নেতৃত্বের দাবি আছে, তাঁদের সেরকম কোনো ব্যাপক নেতৃত্ব নেই। অন্নদাশঙ্করের ছড়া, নিশিকান্তের অলঙ্কারময় ছবি (বুদ্ধদেব বলেছেন 'অদ্ভুত, সুন্দর, অতিপ্রাকৃত ছবি'), হেমচন্দ্র বাগচীর স্নিগ্ধ স্বভাবোক্তির ঐশ্বর্য, সুনীলচন্দ্র এবং অশোকবিজয়ের নিসর্গ-সুখ ইত্যাদি লক্ষণগুলি এক শ্রেণীতে রাখলে,—অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ('সাগর'-এর পরবর্তী রচনায়) সমাজ-মনোযোগী, অন্য ধরনের কাব্যপ্রয়াস নিঃসন্দেহে অন্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলতে হবে। রাজনৈতিক ভাবনা, শ্রেণী-বৈষম্যের চিন্তা, অন্তরহীন নতুনত্বের প্রয়াস ইত্যাদি বাহ্য ব্যাপারের উৎপাত থেকে যথোচিত দূরত্ব রক্ষা করে, কেবল সার্থকতার নিরিখ ধরে সমকালীন কাব্যবিচারে অভ্রান্ত থাকা সহজ নয়। সজনীকান্ত দাসও কয়েকটি ভালো কবিতা লিখেছেন; 'বনফুল'-এর 'গোরু', মশা, 'ছারপোকা' বা 'মন্থরা' পড়েও তৃপ্তি পেয়েছি বলতে দ্বিধা নেই—যদিও রবীন্দ্র-যুগের ঐতিহ্য এবং আন্দোলন সম্বন্ধে সমুচিত সজাগ কবি এঁরা নন। বনফুল তাঁর স্বাভাবিক কৌতুকের সুরে অন্তরোত্তাপহীন, অনুকরণকারী কবিদের 'শকুনি' নাম দিয়েছিলেন—

> দর্জির মত বসে আছে কবি কাব্য-কলে
> ফরমাস-মত কবিতা-ফতুয়া বানায়ে চলে।

শকুনির উৎপাত সব যুগেই সমান সত্য। কিন্তু অল্প-মৌলিকতার প্রাচুর্য দেখা দেয় যেসব যুগে, সেসব ক্ষেত্রে সকলকে 'শকুনি' কিংবা

'দর্জি' বলে বাতিল করাও সঙ্গত নয়। বরং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কবিতার ক্ষেত্রে সে দেশেও যেমন 'Composite Poet' নাম দিয়ে সম-অনুশীলনময় কবিদের সংখ্যাবহুলতা সম্বন্ধে সমালোচকরা মন্তব্য জানিয়েছেন, আমাদের ক্ষেত্রেও সেই কথা বলা যেতে পারে। 'প্রগতি' এবং 'প্রতিক্রিয়া' নাম দিয়ে কবিতার শ্রেণী-বিভাগ করা আমার তো মনে হয় সুরুচির বিরোধী।

নজরুল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অচিন্ত্যকুমার, অন্নদাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত প্রভৃতি খ্যাতিমানদের এবং তরুণতরদের মধ্যে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির প্রেরণায় বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভাবাদর্শ থেকে অনেকটা সরে এসেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তীর নব্যতার অভিযান সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। প্রথম পর্যায়ে যাঁদের নাম করা হলো তাঁদের নিজেদের মধ্যেও যে স্বভাবের অসংখ্য ভেদ ছিল, সে বিষয়ে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবু তাঁদের নৈকট্য এই যে, কবিতায় ভাবক্রমের বোধগম্য নিশানা রাখতে তাঁদের একজনেরও কার্পণ্য নেই। জীবনানন্দকে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিপরীতধর্মী মনে হতে পারে বটে,—কিন্তু সে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিরই আনুষঙ্গিক বিশেষত্ব! তিনি আমাদের এই যন্ত্র-যুগের বৈশ্য-জগতে বাস করেও প্রাচীন প্রাকৃতিক দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্বাদ এবং স্পর্শে আবিষ্ট ছিলেন। তিনি শুনেছেন—'বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে'। তাঁর চোখে রেস্তোরাঁর চায়ের পেয়ালা দেখা দিয়েছে 'বেড়াল ছানার মত' ['সাতটি তারার তিমির' (১৩৫৫); 'ঘোড়া' স্মরণীয়],—তাঁর 'সুরঞ্জনা' 'পৃথিবীর বয়সিনী' ('বনলতা সেন' দ্রষ্টব্য)! তাঁর চোখ দিয়ে দেখলে 'নেউলধূসর নদী' ('আবহমান'), 'ধানসিড়ি নদী' ('হায় চিল'), —এমন কি 'নারীনর্দামার কাথ' ('মানুষের মৃত্যু হলে') দেখতেও

অসুবিধা হয় না। তাঁর কান দিয়ে শুনলে ছুলে বৌয়েদের 'ডাকশাঁখ' তো শোনাই যায় ('১৯৪৬-৪৭' দ্রষ্টব্য),—এবং শুনে তৃপ্তি হয় যে, জগতের 'সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়' ('সৃষ্টির তীরে')! তাঁর নাটোরের বনলতা সেনের 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' আমাদের বহু চালাকি-বিক্ষুব্ধ, নীড়-প্রত্যাশী মনকে অভূতপূর্ব আরাম দেয়! জীবনানন্দ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু পাণ্ডিত্যময়ভাবে তিনি আমাদের সঙ্গত্যাগী নন। 'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে'—তাঁর 'সৃষ্টির তীরে'-র প্রথম দিকের এইরকম কয়েকটি লাইন একটু উদ্ভট মনে হতে পারে, কিন্তু আরো কয়েক লাইন এগিয়ে গেলেই তাঁর মানসিক অবস্থার স্বরূপ বোঝা যায়। হিট্‌লার, কুইস্‌লিং, যুদ্ধের মারণাস্ত্র 'ব্রেড্‌বাস্কেট' ইত্যাদি সমকালের উৎপাতে ক্ষুব্ধচিত্ত, নিসর্গানুরাগী কবি তাঁর বহু আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধতা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—'তাজা ন্যাকড়ার কালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।' রবীন্দ্রনাথের মহাদেশে এরকম ভাষা ছিল অব্যবহৃত, অনাস্বাদিত, অশ্রুত! তবু সে রাজ্য থেকেও এ-ধিক্কারের ভাষাটা কিংবা দুঃখটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অমিয় চক্রবর্তী অবিশ্যি এক সময়ে রবীন্দ্র-নাথের খুবই কাছে ছিলেন, শুধু রবীন্দ্র-নাথের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কে নয়, কবিতার অনুশীলনেও বটে। পরে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'খসড়া' (১৩৪৫) থেকেই তাঁর পথ বদলেছে; বিষ্ণু দে কিন্তু শুরু থেকেই অন্যপন্থী, বরং পরিণত বয়সেই তিনি মিনার থেকে চত্বরে নেমেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের ভক্ত তিনি,—তাঁর লৌকিকতা কতকটা সেই ধারাতেই, কিন্তু তাঁর বৈদগ্ধ্য মাইকেলী। নিন্দার্থে নয়,—বিষ্ণু দে-র স্বাভাবিক বিদ্যা-প্রাধান্যের কথা বোঝাবার জন্যেই একথা বলা দরকার। সুধীন্দ্রনাথ কখনো গম্ভীরভাবে, কখনো বা ললিতভাবে অবক্ষয়-দশার

কথা বলেন ; বিষ্ণু দে সেই কথাই ব্যঙ্গ এবং বিদ্যার জৌলুস মিশিয়ে অন্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। অমিয় চক্রবর্তীর পথ আর-একরকম। তিনি যেন বাংলা ভাষাতেই একালের ইংরেজি বা মার্কিন কবিতা লেখেন। এবং একথাও নিন্দার্থে নয়, আন্তরিকভাবে সত্য।

কবিতার আদর্শ সম্বন্ধে প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব এক-একরকম বিশ্বাস থাকে। পূর্বযুগের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের সঙ্গে তার কিছু যোগ অবিশ্যি মানতেই হবে। ঐতিহ্যের দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ইংরেজি সাহিত্যে আগেকার রোম্যান্টিক কবিদের বিশ্বাস বা আদর্শ একালে কি আদৌ কোনো কাজ করেনি? মিল্টনের 'simple, sensuous and passionate'—এই নিরিখ সে-সাহিত্যে অনেকদিন সম্মানিত হয়েছে। একজন প্রতিষ্ঠিত সমালোচক সেকথা মনে করে বলেছেন যে, ম্যাথ্যু আর্নল্ড তাঁর সমালোচনামূলক নিবন্ধ-মালার দ্বিতীয় পর্যায়ে যেখানে লিখেছিলেন যে, ড্রাইডেন এবং পোপ যদিও পদ্যে প্রসিদ্ধ এবং যদিও ছন্দে তাঁদের হাত খুবই ভালো, তবু কবিতার ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বজনমান্য নন,—তাঁরা গদ্যেই বরেণ্য,—সেখানে মিল্টনের ঐ কাব্য-নিরিখেই আর্নল্ডের আনুগত্য দেখা যাচ্ছে। সে আদর্শে বুদ্ধির কারিকুরির মোটেই জায়গা ছিলনা। 'Wit, play of intellect, stress of cerebral muscle had no place: they could only hinder the reader's being 'moved'—the correct poetical response.'।[১] 'জন ড্রাইডেনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ' নামে একটি লেখার মধ্যে এলিয়ট স্পষ্টভাবে বলেছেন যে উনিশের শতকে ইংরেজি সাহিত্যের কবিরা এক স্বপ্ন-জগৎ বানিয়ে তুলতেই অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। সে কথার উল্লেখ করে একজন সাধারণ কবির রচনা থেকে সমালোচক সেই প্রথানুগত্যের চমৎকার একটি নমুনা তুলে দিয়েছেন। আমাদের 'ভারতী'-পর্বের

তথাকথিত স্বপ্নরসের কবিদের প্রসঙ্গে সেই বিদেশী নমুনাটুকু ভেবে দেখা যেতে পারে। সেই কবির নাম O'Shaughnessy ; তাঁর লেখার নমুনা এই—

We are the music-makers,
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams ;
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams.…

১৯৪০-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নবজাতক'-এর ভূমিকায় জানিয়ে গেছেন যে 'নবজাতক'-এর কবিতাগুলি বসন্তের ফুল নয়, প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। 'বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকে মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' বাংলা কবিতার রবীন্দ্র-কালীন নানা আন্দোলনের শেষ আন্দোলনটি বিশেষভাবে এই মনন-স্বীকৃতির আন্দোলন বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতায় মননহীন প্রবেশ অবিশ্যি আদৌ নেই। 'ক্ষণিকা'র ক্ষণিকের গানও মননসমৃদ্ধ, 'মহুয়া'র প্রেমের কবিতাও মননরঞ্জিত। কিন্তু 'মানসী' থেকে 'পূরবী',—'পূরবী' থেকে 'মহুয়া'—অর্থাৎ ১৮৯০ থেকে প্রায় ১৯৩০ পর্যন্ত তাঁর যে সব কবিতা লেখা হয়েছে, সেসবের মধ্যে মননের সঙ্গে-সঙ্গে অলঙ্করণেরও একরকম আপেক্ষিক তীব্রতা ছিল ; তাছাড়া, কোথাও কাহিনী,—কোথাও কল্পনার লীলা বা লাস্য ছিল। 'বলাকা'র ভাবনাটা দেখা দিয়েছিল অসমমাত্রিক অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঐশ্বর্যময় শব্দ এবং চিত্রমালার নিপুণ সমবায় আশ্রয় করে ; 'পলাতকা'-র নতুন রীতি দেখা দিয়েছিল ছোটোগল্পের মতন সুখপাঠ্য কয়েকটি কাহিনীর আকর্ষণ সঙ্গে নিয়ে। 'মহুয়া'র প্রেমের

কবিতাও উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোড্রেনগুচ্ছের মতন বড়োই সুখকরভাবে বসন্তশোভাময়! ভেতরের অনুভূতি, মনন, স্বপ্ন ইত্যাদি ব্যাপারে যেমন, বাইরের প্রসাধনেও তেমনি ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত তাঁর যেসব কবিতার বই বেরিয়েছে, তাতে পার্থক্য চোখে পড়ে। তখন শব্দের দিকে তাঁর অন্যরকম মনোযোগ দেখা গেছে। ভিন্ন মননের দাবি থেকেই শিল্পকর্মে এরকম ভিন্ন ভঙ্গি দেখা দিয়ে থাকে—সে ভঙ্গিকে প্রসাধনহীনতা বলাও সঙ্গত নয়,—আবার 'বলাকা' বা 'মহুয়া'-র মতন তাকে সজ্জারাগে উচ্চকিত বলাও চলে না। 'লিপিকা'-র রীতি আর 'শেষ সপ্তক' বা 'পুনশ্চ' বইয়ের রীতি এক নয়, রবীন্দ্রনাথের মনের মর্জিভেদের সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পরূপের অবশ্যম্ভাবী বিবর্তনই ঘটেছিল। সে ইতিহাস অল্পকথায় শেষ হবার নয়! এখানে তার বিশদ বিশ্লেষণও নিষ্প্রয়োজন,—কারণ, সেসব কথা রবীন্দ্রনাথেরই একান্ত স্বকীয়তায় চিহ্নিত, রবীন্দ্র-যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম অন্তরের পর্বান্তর-সূচনা বা প্রৌঢ়তা অর্জনের সঙ্গে ততো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নন। তাঁরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে,—নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি-[illegible]ত্তগত অবস্থান, আর, প্রবৃত্তিভেদ অনুসারে সংস্কৃতির অন্য স্তর থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চা নিরীক্ষণ করেছেন মাত্র।

উনিশ শ' কুড়ির দশকের গোড়া থেকেই চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। তিরিশের দশকে নবীনরা বল্‌লেন—রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে-কথায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সে উষ্মার মনোভাব সেকালের নানান্ প্রবন্ধে এবং চিঠি-পত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। আধুনিকদের নতুনত্বের দাবি ছিল অস্পষ্ট। বিষয়ের দিক থেকে তাঁরা সংসারের বস্তুচৈতন্য বেশি ফোটাতে চেয়েছিলেন; রীতির দিক থেকে গদ্য-কবিতা, য়ুরোপীয় কবিদের কোনো-কোনো

ভঙ্গির অনুকরণ এবং শব্দের অন্য জাতি বা অন্য স্বাদ খুঁজছিলেন তাঁরা। তারই ফলে সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আভিধানিক শব্দের ঝোঁক এবং অন্যান্য কবিদের মধ্যে অন্যান্য শব্দায়োজনের প্রয়াস দেখা গেছে। শব্দের কথা এর আগেই বলা হয়েছে। এখানে গদ্য-কবিতার বিষয়ে দু'একটি কথা বলে নেওয়া যাক্। তারপর কবিদের পৃথক-পৃথক বিশেষত্বের কথায় এগোনো যাবে।

পদ্যই যে কাব্যের একমাত্র বাহন নয়, সেকথা নতুন নয়। ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকাতে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'কুসুম ও কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। লেখক ঠাকুরদাস তখন স্বর্গত। তাঁর সেই প্রবন্ধটির প্রথম দিকে কবিতার মূল বিশেষত্ব সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন, সেকথা আরো অনেকে বলেছেন,—'সুন্দর সাদৃশ্যের সংযোজনাই কবিতা'; সেই মন্তব্যের সঙ্গে প্রবন্ধের পাদটীকাতে তিনি আরো জানিয়েছিলেন—'বলা আবশ্যক যে তুলনা মাত্রই কবিতা নয়; সুন্দর ও সমুন্নত ভাবোদ্দীপক এবং সরল ও সম্যক সাদৃশ্যপরিজ্ঞাপক তুলনাই কবিতা। এ নিয়মে, গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ কেবল ছন্দে, যতি-স্থাপনে, ভাষা-সংগঠনে বা লিপি-শরীরে; কবিত্বে ও কবিতায় নহে। গদ্য ও পদ্য উভয়ই, এ নিয়মে কবিতা বা কাব্য হইতে পারে। প্রত্যুত পদ্যে এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে কবিতা হইতে পারে না। গদ্য এ নিয়মানুরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্যজ্ঞাপক ও সমুন্নত ভাবোদ্দীপক হইলে কাব্য হয়।'

প্রথম যে-বছর 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়, এ হলো সেই ১৯১৪-র ঘটনা। ঠাকুরদাস তাঁর এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন আরো আগে কোনো সময়ে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যবাহিত কাব্যও তিরিশের দশকের আগের ঘটনা।

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বগত' (১৩৪৫-এ প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়) বইখানির মধ্যে 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন

তাতে বলা হয়েছিল—'গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ আমি আজ অবধি ধরতে পারিনি, বরং অনেক সময়ে ভেবেছি যে ওই দুই ধারার সঙ্গমই সাহিত্য-তীর্থ নামে সুপরিচিত'। 'কিন্তু গদ্য ও পদ্য সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব চাপে, তখন আর এই···সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, তখন তারা তাদের স্বকীয় মূলধন একত্র করে যে-যৌথ কারবার পাতে, তাই [illegible] পায় কাব্য-আখ্যা।' কাব্যে গদ্য এবং পদ্য, এই দুই রীতির পৃথক-পৃথক দায়িত্ব যেন সমন্বিত হয়—সুধীন্দ্রনাথ সে কথা এই ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন—'কাব্যের গদ্যময় অংশ···প্রাঞ্জল বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যাপৃত থাকে, পদ্য নেয়···সমাধি উৎপাদনের ভার।' তারপর, পদ্য এবং গদ্য উভয় বাহনেই যে ধ্বনিগত বা ব্যঞ্জনাগত চমৎকারিত্ব কাম্য, সেকথা স্বীকার করে তিনি লিখেছিলেন—'পদ্যের ধ্বনি সাধারণত সমমাত্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু গদ্য সর্বত্রই বৈচিত্র্যময়, তার উত্থান-পতন অর্থ ভিন্ন অন্য কোনো বিধি-নিষেধ মানে না।' গদ্য এবং পদ্যের প্রয়োজনভেদ বা ক্ষেত্রগত পার্থক্য সম্বন্ধে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি এই কথাই বলেছেন যে, 'বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্ক যেখানে শুধু তথ্য বা তত্ত্ব বা তর্কের আদান-প্রদান মাত্র, সেখানে গদ্যেরই প্রতিপত্তি বেশি ; গদ্য এবং পদ্যের স্বভাব যদি সত্যই বিভিন্নধর্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ পদ্য দিয়ে···জীবননিষ্ঠ কাব্য কোনোমতেই গড়া যাবে না। তার জন্যে প্রয়োজন এমন এক বাহকের যার মধ্যে কোনো বাদ-বিচার নেই, যাতে খুশি মতো গদ্য থেকে পদ্যে এবং পদ্য থেকে গদ্যে যাতায়াতের পথ রয়েছে।' গদ্য ও পদ্যের এই পরস্পর-সহায়ক, পরস্পর-সাপেক্ষ সমাবেশের ঔচিত্যের কথা বলে নিয়ে তিনি অবশেষে জানিয়েছিলেন—'কাব্যের এই ধাতুসংকরে নির্মিত আধারটির নামই মুক্ত ছন্দ—free verse'।

গদ্য-কবিতার গদ্যরীতি সম্বন্ধে—তথা 'ফ্রীভর্স' সম্বন্ধে বাংলায় সুধীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটিই বোধহয় সর্বাধিক সহজ ও সুখবোধ্য। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় কোথাও অলঙ্কার-আভরণের বেশি সমৃদ্ধি, কোথাও বা ঘরোয়া সারল্যের ভঙ্গি,—এই দুরকম বৈশিষ্ট্যই যে বিদ্যমান, সেকথা মনে রেখে তিনি কিন্তু খুবই স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিলেন যে, গদ্যকবিতার গদ্য ঠিক সাংসারিক গদ্য নয়।

'ফ্রীভর্স' এবং গদ্য-ছন্দের সম্বন্ধে তবু কিঞ্চিৎ সংশয় থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা ফ্রীভর্স নয়। বুদ্ধদেব কথাটি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—'কোনো ইংরেজ বা ফরাশির কাছে ফ্রীভর্সের যা অর্থ, *তা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নি। ওদের ফ্রীভর্স প্রবোধচন্দ্রের মুক্তক নয়, গদ্যছন্দও নয়, ওদের ফ্রীভর্স হলো মিশ্রছন্দ, যাতে একই* কবিতায় একাধিক রকম ছন্দ স্থান পায়, কিংবা গদ্য-পদ্য মেশানো থাকে।'[২] বুদ্ধদেবের 'নেপথ্য-নাটক' (৯৯-১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) হয়তো তারই উদাহরণ। যাই হোক্, অতঃপর নজরুল ইস্‌লামের কথা।

নজরুল ইসলামের (জন্ম ১৮৯৯) বিদ্রোহের আবেগ

বাংলার কবিসমাজে নজরুল ইসলামের অভ্যুদয় যে কী রকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, ৩০৯-১০পৃষ্ঠায় সে কথা বলা হয়েছে। আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দের বাড়াবাড়িটাই তাঁর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। সত্যেন্দ্রনাথের শব্দভাণ্ডারে তাঁর অনেক শব্দই পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গের দিক থেকেও সত্যেন্দ্রনাথের 'সাম্য-সাম' প্রভৃতি কবিতার কতকটা সাক্ষাৎ প্রভাব,—এবং সাধারণভাবে, সাময়িক ঘটনাদি ব্যাপারে তাঁর লেখাগুলির সঙ্গে নজরুলের যোগ অনুভব করা যায়। ১৮৫-১৮৯ পৃষ্ঠায় সত্যেন্দ্র-মোহিতলাল-নজরুলের শব্দপ্রকৃতি সম্বন্ধে

১। New Bearings in English Poetry (1932)—F. R. Leavis ; p. 9.
২। সাহিত্যচর্চা (১৩৬১)—বুদ্ধদেব বসু ; পৃঃ ১৩২।

কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। নজরুল যে আন্তরিকভাবে স্বভাবকবি,—এবং তাঁর কীর্তির বিচারে তাঁর তীব্র ভাবাবেগটাই যে প্রধানত ধর্তব্য, ৩৪৫ পৃষ্ঠায় সে কথাও বলা হয়েছে। নজরুলের মধ্যে সেকালের অনেকগুলি উপাদানের সমন্বয় ঘটেছিল। অন্যত্র আমি সংক্ষেপে লিখেছি—'সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্বান, শান্তস্বভাব, মস্তিষ্কপ্রধান ;—নজরুল বিদ্যানুরাগী, চঞ্চল, হৃদয়প্রধান। একাধিক উৎপ্রেক্ষার অনুগমন, পুরাণের বহুল উল্লেখ, নিপীড়িত গণচিত্তের প্রতি সহানুভূতি,—এইসব লক্ষণ উভয়ের কবিতাতেই বর্তমান। সত্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তক। নজরুল অনুসরণকারী।' বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল'-এ জানিয়েছেন—'নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একই সঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি,—তাঁর পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই পলকের জন্য এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো।…নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ-চৈ অত্যন্ত বেশি—এই কারণেই তিনি লোকপ্রিয়। যেখানে তিনি ভালো লিখেছেন, সেখানে হৈ-চৈ টাকেই কবিত্বমণ্ডিত করেছেন ; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় দেখা যায়, কিপ্‌লিঙের মতো তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন।' বুদ্ধদেব আরো বলেছেন—'অদম্য স্বতস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ—এবং প্রধান দোষ। নজরুলের 'চিন্তাহীন অনর্গলতা' সম্বন্ধে বায়রনের বিষয়ে গ্যেটের মন্তব্য স্মরণ করে বুদ্ধদেব পুনরুক্তি করেছেন—'The moment he thinks, he is a child'। শান্ত মনে ভেবে দেখলে এসব মন্তব্যের সারবত্তা মানতেই হবে। 'ফণিমনসা'-তে সত্যেন্দ্রনাথের ওপর নজরুলের দুটি কবিতা ('সত্যকবি' এবং 'সত্যেন্দ্রপ্রয়াণ গীতি') আছে,—সে দুটি ঠিক আনুষ্ঠানিক শোককৃত্য নয়,—তাতে তাঁর আন্তরিক সত্যেন্দ্র-প্রীতিরই পরিচয় আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি গান্ধীজীর অধ্যাত্মবাদী

কর্ম-আন্দোলনের ভক্ত ছিলেন না; তাঁর 'সব্যসাচী'-তে তার প্রমাণ আছে—

> সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি!
> জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

'সর্বহারা'-র 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ তিনি বলেছিলেন—'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'…।' তাঁর 'দারিদ্র্য', 'ফরিয়াদ' প্রভৃতি লেখার মধ্যে অন্নহীনের দুঃখের কথা খুবই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। নিজের কবিযশের কথাসূত্রে 'আমার কৈফিয়ৎ'-এর মধ্যেই তিনি জানিয়েছিলেন—

> পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
> মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
> প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
> যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।

'জিঞ্জীর-এর 'অগ্র-পথিক'-এর মধ্যে নবযৌবনের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন—

> নাগিনী-দশনা, রণরঙ্গিনী—শস্ত্রকর,
> তোর দেশ-মাতা, তাহারি পতাকা তুলিয়া ধর্।

তাঁর স্বাদেশিকতা, বিদ্রোহ, মানবপ্রীতি ইত্যাদি সমস্ত মনোভাবের মধ্যেই অকৃত্রিম আবেগের জোর দেখা গেছে। আবেগ দিয়েই চিত্তরঞ্জনের বিষয়ে তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন,—'অগ্নিবীণা' সেই আবেগধর্মেরই আর-এক অভিব্যক্তি। খিলাফৎ-আন্দোলনের আমলে লেখা তাঁর 'কামাল পাশা' এবং 'শাত-ইল-আরব'-এর মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান-মৈত্রী সাধনের আবেগ লক্ষ্য করা গেছে। আবেগের আবেদনই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের গভীরতার পরে নজরুলের তাক-লাগানো চাঞ্চল্যের ধাক্কায় নগরান্তরীণ সত্যেন্দ্রনাথের

পাণ্ডিত্য আর ছন্দ-কৌশলের ভক্তেরা কিছু অন্যমনস্ক হতে বাধ্য হয়েছিলেন। ছোটোদের কবিতাতে এবং গানে নজরুলের দক্ষতা সবাই জানেন। তিনি না এলে হয়তো যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ কেবল 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর তরুণ গদ্য-লেখকদের দুঃখবিলাসে উৎসাহী করেই ক্ষান্ত হতো! যতীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং প্রেমেন্দ্র—তিনজনেই ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী, এবং তিনজনেই স্থূল সংসারের অকপট সমালোচক। যতীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গপরায়ণ,—নজরুলের ভঙ্গিটা উচ্ছ্বসিত,—প্রেমেন্দ্র ইতিহাস-ভূগোল-অর্থনীতি-জড়বিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রচেতন, অথচ স্বপ্নময়! তাছাড়া বিশেষ অর্থে, কবিতার শিল্পকর্মে তিনি-ই রবীন্দ্র-যুগের প্রথম আধুনিক কবি, যাঁর সঙ্গে আধুনিকতম বাংলা কাব্যরীতির প্রেরণাগত যোগ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ এবং মোহিতলাল তো বটেই, এমন কি যতীন্দ্রনাথও পুরোনো হয়ে গেছেন, কিন্তু প্রেমেন্দ্রের প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা'-ও আজকের তরুণতম একাধিক শক্তিমানের কাছে আন্তরিকভাবে স্বীকার্য প্রেরণা!

প্রেমেন্দ্র মিত্রের (জন্ম ১৯০৪) প্রশ্ন-মনস্কতা এবং ঈশ্বরবাদ

এক কথায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনোধর্মের পরিচয় দিতে হলে 'প্রশ্ন-মনস্কতা' কথাটাই সহজে দেখা দেয়। 'প্রথমা'-র একটি প্রসিদ্ধ কবিতা থেকে কিঞ্চিৎ নমুনা তুলে ১৯৬ পৃষ্ঠায় তাঁর কোনো-কোনো অংশের শ্রান্তিহারক রমণীয়তার কথা বলা হয়েছে। তাঁর কথা হলো—

যদিও সকল হাস্য-ফেনপুঞ্জতলে
জানি ক্ষুব্ধ ব্যথা-সিন্ধু দোলে;
যদিও অশ্রুর মূল্যে কোন স্বর্গ মিলিবে না জানি,
হাসি-অশ্রু-উচ্ছলিত তবুও রঙীন
এ বিস্বাদ জীবনের বিষপাত্রখানি

ওষ্ঠে তুলি ধরি,
নিঃশেষিয়া যাব পান করি,—
শুধু তার সযতন অনুরাগ স্মরি
জীবন-শিয়রে বসি দোলা দেয় যে স্বপ্ন-সুন্দরী।

'প্রথমা'-র দ্বিতীয় সংস্করণের 'স্বপ্নদোল' থেকে এই যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হলো, এরই মধ্যে প্রেমেন্দ্রের জীবনানুরাগের বিশেষত্ব দেখা যাচ্ছে। 'দেবতার জন্ম হল' নামে 'প্রথমা'র আর-একটি লেখাতে তিনি বলেছিলেন—'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে'!

অন্নে যে ভরে না বুক,
তৃষ্ণা যে অতৃপ্ত থেকে যায়,
প্রাণ আলো চায়!

—'দ্বার খোল' নামে আর-একটি কবিতার মধ্যে 'প্রথমা'-র কবির এই আত্মকথা শোনা গিয়েছিল। সেই কবিতাতেই তিনি বলেছিলেন—'মোর মাঝে কোন্ প্রাণ-মহানদ ছুটিয়াছে অন্তহীন অসীমের লাগি'। জীবন দুঃখময়। কান্না একদিকে 'প্রেয়সীর, শ্রেয়সীর লাগি',—অন্যদিকে, 'সংশয়ে, দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে, বঞ্চনায়, আঘাতে ও হতাশায় কাঁদা নানা ছলে'। তবু—

যত কান্না ধরণীতে
তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি—
আর ধন্য আপনারে মানি!

'প্রথমা'-র 'অপূর্ণ' থেকে তাঁর মনোভঙ্গির এই আশাবাদ ও দুঃখবাদের সমন্বয়গত বিশেষত্বের নমুনা তোলা যেতে পারে। সব দুঃখের পরেও একটি 'তবু' থেকে যায়। তাঁর মনোভঙ্গির এই বিশেষত্বই তাঁর আঙ্গিকের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই 'তবু' শব্দটি তিনি

বার-বার ব্যবহার করেছেন। এই 'তবু'-র জোরে জীবনের সমস্ত নশ্বরতা তিনি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত!

মৃত্যু শাসায় শুনতে কি পাস্?
দেখতে কি পাস্, শ্মশান পাতা সকল ঠাঁই,
বিশ্বজুড়ে চিরটা কাল কালের হাতের নেই কামাই!
ওরে অন্ধ, ওরে হতাশ
লুট করে নে যেথায় যা পাস;
আকাশ বাতাস
প্রেমের প্রকাশ,
নারীর দেহে রূপের বিকাশ
যেথায় যা পাস্।

এই কবিতার নাম 'ইহবাদী'। কোনোরকম প্রথাগত অর্থে তিনি স্বপ্নাঞ্জনলোভী নন! 'ভারতী'-দলের স্বপ্ন নয়,—মোহিতলালের প্রজ্ঞাপীড়াময় স্বপ্ন নয়,—বুদ্ধদেবের বিষাদময় স্বপ্নালুতা নয়,—জীবনানন্দের মতন প্রাকৃতিক শান্তির স্বপ্নে চিরমগ্নতাও তাঁর স্বভাব নয়; তাঁর স্বপ্নপ্রবণতা বরং কিঞ্চিৎ ওমরখৈয়ামী প্রতিধ্বনির সঙ্গে জড়িত; মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎ যোগ অনুভব করা যায় এই সূত্রে—

দুখ যে চায়, দুখ যে পায়,
আর যে সুখের পিছনে ধায়,
দিনের শেষে সব সমান. সব সমান!
পুঁথির পাতায় ধাপ্পাবাজি, পরকালের সব প্রমাণ।

'প্রথমা'-র 'কবি', 'মাটির ঢেলা', 'নেপথ্যে', 'বিস্মৃতি' প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়, সন্দেহ নেই। তাঁর ছন্দের হাত, শব্দের গুণ, স্টাইলের মৌলিকতা ইত্যাদি এসব কবিতাতেও সুপ্রকাশিত; কিন্তু 'সেতু', 'ইহবাদী', 'ফিরে আসি যদি', 'মানে', 'সংশয়', 'শাঁওদল', এবং আরো

কয়েকটি লেখার মধ্যেই তাঁর আন্তরিক অনুভূতি আর বিশ্বাসের বিশেষ ভঙ্গিটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

মানবীর গর্ভ হতেই তৈমুরের জন্ম, বুদ্ধ খ্রীষ্ট দেবতা ছিলেন না।
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা ?

মানুষের 'মানে' খুঁজে-খুঁজে লেখক এই আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। ভালোবাসার সহজ অঙ্গীকার নিয়ে মানুষ জীবনের পথে প্রথম পা বাড়ায়, কিন্তু চল্‌তে চল্‌তে আকাশ অন্ধ হয়ে যায়, ঘাস শুকিয়ে হলুদ হয়ে যায়! 'সৃষ্টির মূলেই যে নির্বিকার নির্মমতা।' তাঁর সংশয় ক্রমে এক চূড়ান্ত প্রশ্নের রূপ নেয়। তিনি বলেন—'জীবনকে কি ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ?'

অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র এবং বুদ্ধদেব—সাহিত্য-সাধনায় তিনজনেই সমকালীন; তিনজনের সেকালের পরিবেশের মধ্যে সাদৃশ্যের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য নয়। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'বিজলী', 'প্রগতি', প্রভৃতি তৃতীয় দশকের নবীন পত্র-পত্রিকার উৎসাহী লেখক-সম্পাদক-পরিচালকদের মধ্যে গণ্য এঁরা; তিনজনেরই মনে ছিল কলকাতার টান! বুদ্ধদেবের কলকাতা-প্রীতি এবং তৎপ্রসূত বিষাদের কথা এর আগেই বলা হয়েছে। প্রেমেন্দ্রের নগর-বীক্ষা গদ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলি ছোটোগল্পের মধ্যে,—কবিতায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও 'প্রথমা'র 'রাস্তা'-তে,—'সম্রাট'-এর 'পথ' এবং 'কাঠের সিঁড়ি'তে তারই চিহ্ন আছে। শহরের চেনা পথ তাঁর মনে এনে দেয় অন্য সব পথের চিন্তা। ইতিহাস-ভূগোল-জীববিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যান তিনি। অথবা ঐসব শাস্ত্রজ্ঞান থেকে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিশেষ অনুষঙ্গ আবিষ্কার করেন! মানুষের ভাঙা-গড়ার দূর দূর, অশেষ পথের আশাবাদী, ইহবাদী পথিক তিনি!

আমি যুগ থেকে যুগান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে
মনের সড়ক তৈরী করলাম।
আমার তবু থামা হবে না।
পথই যে আমার প্রাণ—আমার অসীম পথের পিপাসা!

'প্রথমার' 'রাস্তা'-কবিতাটিতেই তাঁর এই বিশেষ দিকটি প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা গিয়েছিল। 'সম্রাট'-এর 'কাঠের সিঁড়ি'তে টুলে ঝিমুনো প্রহরীর পাশে টবের পামের চারার অরণ্য-সম্ভাবনাই তিনি হয়তো বেশি দেখেছেন। কারণ, মানুষকে তিনি স্থাণু দেখতে চান্ না। নগরের সুশৃঙ্খল নাগপাশে সভ্যতার শান্তি কি চিরকাল স্থায়ী আমানত হয়ে থাকবে? এই শিষ্ট, সভ্য, যান্ত্রিক স্থৈর্য কি কতকটা নৈরাশ্যময় নয়? এইসব ভাবনার অবসাদ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর প্রিয় 'তবু' শব্দটির মোড়-ফেরানো ভঙ্গি দেখিয়েছেন—

যে বিশাল সিঁড়ি আকাশের দিকে
চেয়েছে উঠতে,
তার তলায় তারা বসে থাকে ;—
কাঠের টবে 'পামের' চারা
আর কাঠের টুলে সশস্ত্র প্রহরী।
তবু হতাশ আমি হই না।

কারণ, 'পামের চারার মধ্যে সঙ্গোপন আছে অরণ্য'—আর, শান্ত প্রহরীর স্থাণুত্বও একদিন ঘুচে যাবে! 'শুধু কাঠের সিঁড়ি কোনদিন পৌঁছবে না আকাশে'।

'প্রথমা' থেকে 'সম্রাট' (১৯৪০), এবং সেখান থেকে 'ফেরারী ফৌজ' (বৈশাখ, ১৩৫৫) তাঁর জীবন-দর্শনের তেমন গুরুতর কোনো পরিবর্তনের চিহ্নবাহী নয়। তাঁর শেষতম কবিতাগুচ্ছ 'সাগর থেকে ফেরা' বেরিয়েছে ১৯৫৬-তে। 'প্রথমা'-র 'রাস্তা'-র রেশ আছে

'ফেরারী ফৌজ'-এর 'নীলনদী-তট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা' প্রভৃতি লাইনে,—যদিও তার আয়োজন অন্য রকম; 'সম্রাট'-এর 'পথ'-এর মধ্যে ভৌগোলিক কবির তথ্যজ্ঞান সেই পুরোনো প্রবণতাকেই পুনর্ধ্বনিত করেছিল। পথ চলেছে—'কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে, খোরাসান থেকে বাদক্শান, পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান'! 'প্রথমা'-তে সত্যেন্দ্রীয় শব্দঝংকারের ঝোঁক হয়তো একটু বেশি ছিল,—পরের লেখাগুলিতে সে ঝোঁক কমে এসেছে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব জীবনানন্দও কাটিয়ে উঠেছেন, প্রেমেন্দ্রও। প্রেমেন্দ্রের সম্বন্ধে এইসূত্রে আরো বলা দরকার যে, নানা বিদ্যাকে কাজে লাগাবার যে সজ্ঞান আয়োজন ছিল সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে, প্রেমেন্দ্রের মধ্যে সে বিশেষত্ব দোষমুক্তভাবে সহজ স্বভাবে পরিণত হয়েছে। 'পথ' কবিতাটিতে ভূগোলের বিদ্যা,—'নীলকণ্ঠ'-তেও তাই,—'তামাসা'-তে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানাভাস,—বইয়ের নাম-কবিতা 'সম্রাট'-এর মধ্যে রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতির প্রসঙ্গ,—'ফৌজ'-এর 'আদিকালের বুড়ি'তে জীবপর্যায়জ্ঞানের সদ্ব্যবহার দেখে তাঁকে পণ্ডিতম্মন্য অকবি মনে করা কল্পনাতীত ব্যাপার। তিনি যে একালের নতুন বাগ্বিধি আয়ত্ত করেছেন এবং কাব্যোচিতভাবেই তা ব্যবহার করেছেন, সেই গুণের কথাই সর্বদা মনে পড়ে। কবিতার শিল্পব্যাপারে তাঁর আধুনিকতার লক্ষণ এসব ক্ষেত্রেও স্বতঃস্ফূর্ত। চেস্টারটন, লরেন্স প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের ভক্ত তিনি। তিরিশের দশকে, এবং চল্লিশের দশকেরও কিছুদিন ধরে বাংলা কবিতায় যখন চেষ্টাকৃত দুর্বোধ্যতার উৎপাত চল্‌ছিলো, সেই সময়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন—'একটা কোনো ভাবধারার মাঝে চেষ্টা করে অনেকগুলো ফাঁক রেখে গেলে নতুনত্ব হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য হয় না। Cummings-এর কবিতা আমি যখন পড়েছিলাম, তখন আমার মন

ভালো ছিল না। সে-সব কবিতা তখন শুধু যে বুঝিনি তাই নয়, আমার কাছে বড়োই কৃত্রিম মনে হয়েছিল সেসব। কোনো জিনিস ভালো না লাগলে, স্পষ্ট করে সেকথা বলা ভালো। যা বুঝি না, তা হয়তো ভালো হতে পারে,—এই ভেবে প্রশ্রয় দেওয়াটা কিছু নয়।' 'কবিতা' থেকে সরে এসে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'নিরুক্ত' সম্পাদনার কাজে লেগেছিলেন তিনি। এই সূত্রে তাঁর সেই সময়ের আরো কয়েকটি কথা মনে পড়ছে। তাঁর প্রশ্নমনস্কতা, ইহবাদ এবং জীবনদর্শনের আলোচনাতে তাঁর সেই আত্মকথা কাজে লাগবে মনে করে এখানে কিঞ্চিৎ তুলে দেওয়া গেল—

'চেষ্টারটন্ ফ্রী-ভর্সের নিন্দা ক'রে গেছেন; সৎ এবং শক্তিমান্ লেখক ছিলেন তিনি। তাঁর কবিতার ইমেজরি অনেক জায়গায় চূড়ান্তভাবে আধুনিক। চেষ্টারটন্ আমার প্রিয় লেখক। আমার 'সম্রাট'-এর মধ্যে তাঁর গোটা কয়েক অনুবাদ আছে। ফ্রী-ভর্স সম্বন্ধে তিনি যে মত পোষণ করতেন, সে মত আমার নয়। তবু চেষ্টারটন্‌কে আমার খুব ভালো লাগে। কবিতায় কবির ভাবনার ধারা বা পর্যায়গত শৃঙ্খলাটা রাখা দরকার, তবে সব চেয়ে বড়ো আইনটা কি জানো? যদি বোঝো সত্যি কিছু বলবার কথা আছে, তা'হলে নির্ভয়ে ব'লে যাও। যৌবন নির্ভীক—এই কথাটা মনে রেখো।

'আমার সমস্ত জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, চিন্তা সমস্ত দিয়ে আমার একটা ধ্যান গ'ড়ে উঠেছে। সেই ধ্যানের খোঁজ পাবে 'সম্রাট'-এর 'নীলকণ্ঠ' কবিতায়। 'মৃত্যু মানুষের শেষ সার আবিষ্কার।' দেখো, জীবপর্যায়ের নিম্নতম স্তরে মৃত্যুর ভয় নেই। অ্যামিবা দীর্ঘজীবন নিশ্চিন্ত আরামে যাপন করে। যত ওপরদিকে উঠে আসা যায়, দেখা যায় মৃত্যুর ভয়াল, বিস্ময়কর রূপ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। মানুষকে জুয়া খেলতে দেখেছ তো?—কিংবা মদ খেয়ে

সর্বস্বান্ত হ'তে? যারা মদ খায়, তারা কি শুধু ব্যর্থতার তাড়নাতেই তা খায়? না। একটা তীব্র স্বাদ তারা চায়। তারা বোঝে না, কী তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। মদ খাওয়ার আনন্দ একটা crude আনন্দ। মৃত্যু মানে intense delight। এই যে adventure-এর কথা শোনা যায় মাঝে-মাঝে, উত্তরমেরুতেই যাও আর যুদ্ধে গিয়ে বিকলাঙ্গই হও—এ সবই তো মৃত্যুর মুখোমুখি হবার দুর্নিবার তাড়নায় ঘটে থাকে। Biology-র এ একটা আইন। মৃত্যু মানুষের অত্যন্ত প্রিয়। যতোদিন যৌবন, ততোদিনই মৃত্যুর স্বাদ পাবার সাধনা। তারপর ভয় পাবার দিন আসে। সেই তো বার্ধক্য! জীবনের তীব্রতম শারীরিক আনন্দ—সেও তো আত্মক্ষয়ের মূল্যে কেনা মুহূর্তের সুতীব্রতা! এই 'মৃত্যু ও রমণীতে ভেদ নাই' ব'লেই এগিয়ে চলেছি। Ecstasy of Death আমাকে প্রতিপদে টান্‌ছে।'[১]

এই কথাগুলির মধ্যেই তাঁর কবি-স্বভাবের মূলতত্ত্বের পরিচয় আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিমন স্বভাবতই আধ্যাত্মিক,—জড়-বিজ্ঞানের শেষ দেয়ালের ওপারে আরো কিছু আছে,—রবীন্দ্রনাথের যুগে, রবীন্দ্রভক্ত প্রেমেন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানপ্রীতি সত্ত্বেও সেই অনতি[illegible] অমৃতবাদে বিশ্বাসী। ১৯৪০-এর পরেও অদ্যাবধি তিনি আশাবাদী আধুনিক! তাঁর প্রেমের কবিতা, ছড়া ইত্যাদি অন্যান্য দিকের আকর্ষণ কম নয়। কিন্তু তাঁর মনোভঙ্গির আলোচনায় সেসব বিভাগের অন্তর্নিহিত বিশেষত্বও ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। ততোধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

জীবনানন্দের (১৮৯৯-১৯৫৪) নিসর্গবীক্ষা

১৯১ পৃষ্ঠায় জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেটি তো বটেই, তাছাড়া সেই কবিতারই আর একটু স্মরণীয়—

১। শ্রীকাঞ্চনকুমার দাশ সম্পাদিত 'দিনান্তিকা' পত্রিকা (১৩৬৪) দ্রষ্টব্য।

ভ্রমরীর মত চুপে সৃজনের ছায়াধূপে ঘুরে মরে মন
আমি নিদালির আঁখি,—নেশাখোর চোখের স্বপন !

আর, তাঁর জীবনের শেষ পর্বে তিনি লিখেছিলেন—

কেবলি আরেক পথ খোঁজ তুমি আমি আজ খুঁজিনাক আর
পেয়েছি অপার শূন্যে ধরবার মত কিছু শেষে
আমারি হৃদয়ে মনে ঃ বাংলার ত্রস্ত নীলিমার
নিচে ছোট খোড়ো ঘর—বনঝিরি নদী চলে ভেসে
তার পাশে ; ঘোলা ফর্সা ঘুর্ণিজল অবিরল
চেনা পরিজনের মতন
কখনো বা হয়ে আসে স্থির ;
মাঠ ধান পানবন মাছরাঙাদের আলোড়ন
আলিঙ্গন করে বিছিয়েছে তার নারীর শরীর।

এই শান্ত, স্নিগ্ধ মগ্নতাই জীবনানন্দের প্রকৃতি। বাইরের বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে এই তাঁর আত্মীয়তা ! কালিদাস প্রভৃতি প্রকৃতিপন্থীদের সঙ্গে এইখানে তাঁর নিবিড় সাদৃশ্য। বিভিন্ন মনোভঙ্গির বৈচিত্র্য নেই তাঁর কবিতায়। একালের অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের যুগে বাস করেও সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ এঁরা তিনজনেই স্বাতন্ত্র্যের সম্মান পেয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও একটি পৃথক পথ বেছে নিয়েছিলেন, যদিও তাঁর জীবনবেদ প্রধানত দুঃখাবর্তে অন্ধকার। জীবনের অনুকূল কোনো বিশ্বাসে পৌঁছোন নি তিনি। এতো যে শব্দ-ছন্দ-ভঙ্গির খ্যাতিমান সত্যেন্দ্র-নাথ,—তিনিও ছিলেন আশাবাদী। তাঁর রচনা জীবনের প্রতিকূল নয়। নজরুল একদিকে ভক্ত, অন্যদিকে অশান্ত ; তাঁর মন উদ্দীপনাময়, তীব্র উত্তেজনাধর্মী। অনেকে শিল্পকর্মে উত্তেজনা পছন্দ করেন না,—নজরুল সম্বন্ধে সেই গোষ্ঠীর মধ্যে কোনোদিনই বোধ হয় তেমন

উৎসাহ ছিল না। কিন্তু বছর পনের আগেও তিনি ছিলেন জনসাধারণের কবি। সত্যেন্দ্রনাথ রাষ্ট্র-সমাজ এবং আচার-ব্যবহার সম্পর্কে অনেক কবিতা লিখেও ঠিক নজরুলের মতো জনসাধারণের মন জয় করতে পারেন নি। জনসাধারণ কিসে যে খুশি হয়, তা কি ঠিক বিশ্লেষণ করে পাওয়া সম্ভব? তবু মনে হয়, জনসাধারণ চায় আশা করতে, ভালোবাসতে—উত্তেজিত হতে—এমন কি উদ্‌ভ্রান্ত হতেও তাদের বাধা নেই, যদি সেই উদ্‌ভ্রান্তকারী কবির নিজের অন্তরে থাকে প্রবল বেগ,—নেতার সামর্থ্য। সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ,—এঁরা কেউই জনসাধারণের কবি নন। এঁদের পরস্পরের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মার্জিত, বিদ্যাবিনীত, চিন্তাশীল সমাজের কবি। অতএব, জীবনানন্দ জনসাধারণের কবি হন নি, এ চিন্তা দুশ্চিন্তা নয়; কবি হিসেবে তাঁর সামর্থ্য সম্বন্ধে এতে কোনো নিন্দা বা প্রশংসার আলো পড়ে না। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ,—এঁরাও কি জনসাধারণের কবি হতে পেরেছেন? সে কথা যাক। জীবনানন্দের মনোভঙ্গির কথা এর আগেই বলা হয়েছে। তাঁর দুর্বোধ্যতার কথাও বলে নেওয়া গেছে। এবার তাঁর স্বভাবের কথা।

'ঝরা পালক'-এ জীবনানন্দ একটি পৃথক ভঙ্গি খুঁজছিলেন মাত্র। সেই একখানি বইয়ের পরে যদি তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে যেতো তা হলেও বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁর নাম অবশ্যই থাকতো কিন্তু কৈশোরের স্বপ্ন বলেই হয়তো তাঁরা একান্ত স্থায়ী বিশ্বাসটি উপেক্ষিত হতো। হতোই যে, তা নয়। তবে সে আশঙ্কা ছিল বৈকি!

'প্রগতি' এবং 'কল্লোল' কাগজের কর্তৃপক্ষ ছিলেন জীবনানন্দের অনুরাগী, সাহায্যকারী। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় পরের যুগে জীবনানন্দকে কবিতাপ্রিয় পাঠকদের সামনে এগিয়ে দিয়ে-

ছিলেন। সমজদার বন্ধুর অভাব তাঁকে ভোগ করতে হয় নি। সমজদার রসিকের সংখ্যা সব দেশে সব কালেই তথাকথিত জনসাধারণের তুলনায় নগণ্য। তবু তাঁরাই ভালোকে বাঁচতে দেন।

এই সমাজের আনুকূল্যে শান্তরসের কবি জীবনানন্দ প্রকৃতির রূপ-রস উপভোগ করে গেছেন। তাঁর কবিতায় প্রধানত ছবির কারিকুরিই বড়ো নয়—ছবির পটে কায়দা-কৌশলের প্রগল্‌ভতা নেই, —আছে চিত্রণের গভীর সমাধি-অবস্থা। এই সমাধি অবস্থার সঙ্গে দর্শক-শ্রোতার যোগ অক্ষুন্ন রাখবার জন্যেই সমালোচকের প্রয়োজন।

বাংলা দেশে মধুসূদন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-বিহারীলাল প্রভৃতি কবিরাও তাঁদের সমকালীন পাঠকের কাছে সমালোচনার পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু একালে সাহিত্য-পাঠকের মন বিমনা হয়ে উঠেছে। হয় তীব্র স্তুতি, নয়তো উগ্র তিরস্কার—তাও সকলের অদৃষ্টে জোটে না। জোটবার কথাও নয়। সে জন্যে দল থাকা চাই, বন্ধু বা শত্রু থাকা চাই। জীবনানন্দ কোনো দলের কৃপা ভিক্ষা না করেও মৃত্যুর পূর্বে কিছু যে সমাদর পেয়েছিলেন, জীবিত সাহিত্যিকদের কাছে সেইটাই সান্ত্বনা। আর এ থেকে একথাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, একালের লুপ্তপ্রভ কবিতার রাজ্যে জীবনানন্দ দাশ রসিকবেদ্য বিশিষ্টতারই গৌরব পেয়েছিলেন।

তাঁর উপমা কেমন, রূপক কেমন,—অনুপ্রাসেই তাঁর দীপ্তি, না কি সমাসোক্তিতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য—এসব কথা গৌণ। বড়ো কবি অনেক মানুষের মন অনেক কাল ধরে অধিকার করতে পারেন। প্রকৃতির হাতল দিয়েই তিনি তা ধরেছিলেন। কথাটা হাল্‌কা শোনায় বটে, কিন্তু গভীর অর্থে সত্য। তাঁর অনুভূতির মধ্যে প্রকৃতির বর্ণমালা আর জীবনের শাশ্বত সত্য এক হয়ে দেখা দিয়েছিল। জীবনানন্দের কাব্যে সেই নিত্যরসলোকের সমর্থন পাওয়া গেলো—

নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা,—
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা… ।

এলিয়টের প্রভাব ও বিষ্ণু দে (জন্ম ১৯০৯)

১৯২৬ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে প্রকাশিত মোট সাতখানি বই থেকে এবং তার বাইরে থেকেও সংকলিত মৌলিক ও অনুবাদ-কবিতায় মিলিয়ে মোট ৮৭টি কবিতা আছে 'বিষ্ণুদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র (১৯৫৬) মধ্যে।

বুদ্ধিনিষ্ঠ, পাণ্ডিত্যকণ্টকিত, দুর্বোধ্য 'আধুনিকতা'র অন্যতম বাহক হিসেবে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'-পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রতিষ্ঠার পর্বে বিষ্ণু দে ছিলেন অতি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর কবি ; 'চোরাবালি'-র (১৩৪৪) সমাদর-উচ্ছ্বসিত ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা', এই দু'টি কঠিন রচনার প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে দু'টিই 'যেহেতু উৎকৃষ্ট কাব্য, তাই সে দুটির মর্মোদ্‌ঘাটন আমার অভিপ্রেত নয়।' 'অপস্মার' কবিতাটিতে সুধীন্দ্রনাথ 'অপরিপাক' লক্ষ্য করেছিলেন ; 'চোরাবালি' এবং 'ঘোড়সওয়ার' সম্বন্ধে বলে-ছিলেন যে সে দুটি শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন। বিষ্ণু দে-র ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বাংলা কবিতার পাঠক-সমাজে তখন থেকেই সুপরিচিত। 'চোরাবালি'র আগে ছাপা হয়েছিলো 'উর্বশী ও আর্টেমিস', পরে ছাপা হয় 'পূর্বলেখ'। '১৯৩৫-৪০ সালে সামাজিক উপলক্ষ্যে বা ফরমায়েসে' শেষের বইখানি লেখা হয়। দেশে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তেজনা প্রবেশ করেছে। যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতময় পর্বের, এবং তার অব্যবহিত পরের মনন ফুটেছে তাঁর 'সাত ভাই চম্পা'-তে এবং 'সন্দ্বীপের চর'-এ। 'পূর্বলেখ'-এর ধনতন্ত্রবিরোধী, গাঁয়ের-মাটি-অভিমুখী নব-

ঘোষণার জের টেনে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে তিনি তথাকথিত বিদগ্ধ-পাঠকের তারিফ বজায় রেখেও বৃহত্তর পাঠকসমাজের কৌতূহল উদ্রেক করেছিলেন শেষোক্ত দু'খানি বইয়ে। 'পূর্বলেখ'-এর আগে 'প্রবাসী'-পত্রিকায় তাঁর রচনার দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্য ছাপা হয়েছিল, বিষ্ণু দে-র এই অনুশীলিত সুবোধ্যতার ফলে তাঁর সম্বন্ধে সেই মন্তব্যের তিরস্কার ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়। কিন্তু ছন্দে, ব্যঙ্গে,—বই-পড়া জ্ঞানে, পুরাণোল্লেখে তাঁর এই সহজ-লেখার (?) প্রবাহেও তাঁর কৈশোরক পর্বের পণ্ডিত-স্বভাব ক্ষান্ত হয়নি।

বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করে আল্‌কেমির নব বিশ্ব
ভুঁইফোঁড় গায়ত্রীর বরে।
ইরার প্রণবছন্দে পুরোডাসে লালায়িত
তাপসের সোমরস ঝরে।

—এ উক্তি এই 'সহজ' পর্বের ব্যাপার। 'কাসাণ্ড্রা', 'আইসায়ার খেদ',—এবং সেই সঙ্গে 'সাঁওতাল কবিতা', 'উরাওঁ গান' পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে 'সন্দ্বীপের চর'-এ (১৩৫৪)।

সমকালীন 'ফ্যাশান'-এর প্রশ্রয়ে বিশেষ কিছু-কিছু বাড়াবাড়ি ঘটে থাকে,—এও যেমন সত্য, অপর পক্ষে, যথার্থ কবিপ্রাণের প্রেরণায় কবিতার ধারায় নতুন রীতি, নতুন মনন, নতুন ভঙ্গির অভ্যুদয় যে অবশ্যম্ভাবী, সেও তেমনি সত্য। যে কারণেই হোক, বিষ্ণু দে-র বেশির ভাগ লেখাই সাধারণ পাঠকের পক্ষে কতকটা দুষ্প্রবেশ এবং কষ্টভেদ্য। সুতরাং তাঁর কবিতা পড়ে সাধারণ পাঠকের অভিজ্ঞতায় যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, সে হলো সৎ প্রয়াসের সততা রক্ষার তৃপ্তি। গত তিরিশ বছরের মধ্যে তাঁর মন একাধিকবার বদলেছে, কিন্তু তাঁর স্বভাবের ঈষৎ পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো তাঁর মন যত বিদ্যাময়, ঠিক সেই পরিমাণে অনুভূতিময় নয়। এই বিনীত মন্তব্যের বিতর্কসম্ভাবনা-

ময় ক্ষুরধার সীমাতে দাঁড়িয়ে সুধীন্দ্রনাথের বিজ্ঞবচন মনে পড়া অনিবার্য। 'কোমর বেঁধে ছিদ্রান্বেষণে নামলে শুধু বিষ্ণু দে কেন, যে কোনো সাহিত্যিকের ত্রুটির তালিকা মহাভারত ছাপিয়ে উঠবে।'

অতএব নিন্দার কথা থাক। যেটা ভাববার কথা সে হলো বিষ্ণু দে-র প্রাপ্তি ও প্রকাশ, সিদ্ধি ও সাধনার বিশেষত্ব। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ধারায় পণ্ডিত বা পণ্ডিতম্মন্য কবির সংখ্যা কম নয়। দূর অতীতে না গিয়ে নিকট কালের ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা যাক। নিজেদের আয়ুষ্কালে, অথবা অভ্যুদয়ের লগ্নে তাঁরা যতো প্রশংসা পেয়েছেন, পরের যুগে তাঁদের সমাদর যে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের বর্তমানতম 'আধুনিকতা'র সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করার আগে পূর্ব-অভিজ্ঞতা স্মরণ করা দরকার। কিন্তু সমালোচকের কর্তব্য এখানেই শেষ হয় না। সমকালীন কবি বৃহৎ, বিপুল মানব-জীবনের সমস্ত খণ্ডতার মধ্যেও সর্বান্বয়ের সাক্ষী হবেন,—তাঁর কীর্তি তাঁর জ্ঞানের বিপুলতায় নয়,—আনন্দের সৃষ্টিতেই—এইটেই আমাদের কাম্য। তবে আনন্দের ভাষা পাঠকের পক্ষেও শিক্ষণীয়। চিত্র-শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ভাষার অশেষ পার্থক্য আছে। যিনি কবিতা পড়ে আনন্দ পান, তিনি ছবির সূক্ষ্ম কলাকৌশলে অনভিজ্ঞ থাকতেও পারেন। কিন্তু অন্য শিল্পের প্রসঙ্গ এড়িয়ে শুধু কবিতার কথা মনে রেখেই 'একালের পাণ্ডিত্যময় (?) এক শ্রেণীর তির্যক, 'আধুনিক' কবিতা সম্বন্ধে আত্মসীমাচেতন, বিনয়ী সমালোচককে তাঁর অচরিতার্থ তৃপ্তির বেদনা স্বীকার করতেই হয়।

স্রষ্টা নিরঙ্কুশ নন, পাঠকও প্রয়াসহীন নন। উভয়ে আত্মীয়তা চাই, 'সত্য-আত্মীয়তা' চাই। আধুনিক কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে যে একজন দুর্বোধ্য কবি, এ মন্তব্য অগ্রাহ্য নয়। সুতরাং 'ওফেলিয়া'

বা 'ক্রেসিডা'র মতো কবিতাগুলির সম্পর্কে তো বটেই, এমন কি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-সংগ্রহের আরো কোনো-কোনো রচনার সঙ্গে অর্থ-সঙ্কেত ছাপা হলে আরো শিক্ষাপ্রদ ভাবে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যেতো।

'ঘোড়সওয়ার', 'ওফেলিয়া', 'মহাশ্বেতা', 'ক্রেসিডা', 'পদধ্বনি', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি বহুশ্রুত কবিতায় তাঁর ভাবের প্রবাহ জটিল; 'গার্হস্থ্যাশ্রমের' লেখাগুলি আরো অনেক লেখার মতোই হঠাৎ ভালো লেগে যায়। মনে হয়, তাঁর ব্যঙ্গ-ভঙ্গির সবটাই নিছক ঠাট্টা নয়। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—ঠাট্টা করে শোনাই সখি আপন কথাটাই! '৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৮', 'কোনার্ক', 'বৃষ্টি চলে বৃষ্টি অবিরাম' প্রভৃতি লেখায় আছে পাঠকের প্রতি অনুকূলতর মনোভাব, —এসব লেখা বুঝতে অসুবিধা হয় না। '২৫এ বৈশাখ'-এ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বলা হয়েছিল—

আমরা তো জানি তুমি আকস্মিক গরম বাজারে
রুদ্ধগতি, তাই গড়ি জীবনের ঝরণা, রচি, কবি,
প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে-লাখে হাজারে হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দ-ভৈরবী॥

'২২শে শ্রাবণ' কবিতায় তাঁর নিজের দেশ-কালের স্পষ্ট সমালোচনা ছিল—

নেকড়ের হন্যেয় দেশ ছিন্নভিন্ন সন্দেহ ও ভয়
কলুষ ছড়ায় দুই হাতে গায় শৃগালে বাহবা!
তবুও আকাশ ছায়, আমাদের মুক্তি উচ্চৈঃশ্রবা,
মানুষ দুর্জয়॥

বিষ্ণু দে প্রথম যখন লেখা শুরু করেন, বুদ্ধদেব বসু এবং অজিত দত্ত তখন ঢাকা থেকে 'প্রগতি' পত্রিকা চালাচ্ছিলেন; সেটা 'কল্লোল' উঠে যাবার আগেকার ঘটনা। সে সময়ে 'প্রগতি'-তে তাঁর

অনেক লেখা বেরিয়েছে,—বুদ্ধদেব বলেছেন—'বেশির ভাগই তার লঘুরসের পদ্য'। 'চোরাবালি'-র মুখবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ যেসব কথা লিখেছিলেন, সেসব শুধু বিষ্ণু দে-র সম্বন্ধেই নয়, সাধারণভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার কতকগুলি বিশেষত্বের দিক্‌দর্শনী। তাই বিষ্ণু দে-র কাব্যকথার সূত্রে সেই মুখবন্ধের কথা একটু বিস্তারিতভাবেই স্মরণ করা দরকার। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

১] 'তাঁর মনীষা যেহেতু প্রতিভা ও পণ্ডিত্যের যোগফল, তাই ব্যাসকূটের চর্বিতচর্বণ তাঁর কাছে নূতন লাগে না, পূর্বাচার্যদের দেখে তিনি বোঝেন যে, প্রবহমাণ ঐতিহ্যের ব্যক্তিগত বিকাশেই বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। অবশ্য এই ঐতিহ্য কেবল বঙ্গদেশীয় নয়, বিশ্বমানবিক; এবং সেই জন্যে উনিশ শতকী ইংরেজদের যে আদর্শ রবীন্দ্রসাহিত্য তথা আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা, শুধু তার নির্দেশ মনে রাখলে বিষ্ণুদের প্রসাদগুণ হয়তো আমাদের এড়িয়ে যাবে।···ফলত বিষ্ণুদের তুল্য নিরাভরণ লেখক এদেশে বিরল;···বিষ্ণু দে জানেন যে প্রসঙ্গ নির্বাচনে সমভাব কবিচিত্তের প্রধান লক্ষণ' (অর্থাৎ ছোটো, বড়ো, সস্তা, দামী সব রকম প্রসঙ্গেই বিষ্ণুদের সমানুরাগের কথা বলা হলো)। ২] কাব্যের উপাদান ভাবনা নয়, ভাষা, এবং সাহিত্যিক ভাষার স্বাবলম্বন যদিচ রিচার্ডসেরই আবিষ্কার, তবু তাঁর পূর্ববর্তীরাও মানতেন যে কবিতার অর্থ অভিধানসাপেক্ষ নয়, সার্থকতার নামান্তর।' (কাব্যের উপাদান নির্ণয়ে ভাষার প্রাধান্য বিষয়ে মালার্মের অভিমতের সমর্থন আছে সুধীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের সঙ্গে)। অতঃপর তিনি বলেছেন—'অবশ্য এ অভিমতে অতিশয়োক্তির আভাস আছে;···বাগর্থ আর যাথার্থ্যের সম্পূর্ণ সমীকরণ অসাধ্য।' ৩] 'ভাষা অভিধা ও অভিপ্রায়ের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত; এবং প্রথমের পরাকাষ্ঠা যেমন গণিতে, দ্বিতীয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তেমনি কবিতায়।'

৪] তারপর, কবি তাঁর ইন্দ্রিয়াদি এবং ব্যক্তিমনের সাহায্যেই জগতের বিভিন্ন সংবেদন পেয়ে থাকেন। জগৎ ও কবিমনের পরস্পরের অন্তঃপ্রবেশজাত সেই সব অভিজ্ঞতাকে সত্যের ব্যক্তিলভ্য প্রতিভাস বলা চলে। সুতরাং 'কবিতার সঙ্গে সত্যাসত্যের আদান-প্রদান নেই, তার সম্বল সম্ভাব্য'। গতানুগতিক পরিস্থিতির আশ্রয়েও কবিরা 'প্রাক্তন অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করেন না, প্রাচীন ও সর্বজনীন প্রতীক-গুলোকে অর্বাচীন আত্মোপলব্ধির কাজে লাগান।' কবিতার ভাবচ্ছবি ইত্যাদির বিচারে 'অন্তঃসঙ্গতি ও অন্যোন্য সম্পর্ক' ঠিক আছে কিনা সেটাই দেখা দরকার। ৫] বার্ডস্বার্থের 'emotion recollected in tranquillity'-মতবাদে অভ্যস্ত বাংলার কাব্য-বিবেচকের অতিরিক্ত তত্ত্বমনোযোগের নিন্দা করে সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, তাঁরা 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র বলে তাঁদের কাছে 'বলাকা'র মূল্য 'ক্ষণিকা'র চেয়ে বেশি।' 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু ন্যায়বুদ্ধির নির্দেশ' যে কাব্যবিচারে অচল, সেকথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন। আর, 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্'-মতবাদের সঙ্গে যথার্থ আত্মসন্ধানী আধুনিকের পার্থক্যের দিকে আমাদের মনোযোগ দাবি করে তিনি বলেছিলেন—৬] 'আত্মসন্ধানী কবিরা কলাকৈবল্যের প্রয়াসী নন ; তাঁরা বিষয়বিমুখ শুধু এইজন্যে যে বস্তুবিলাসের আধিক্য বিশ্ববীক্ষার পরিপন্থী, এবং সাহিত্য আর সমাচারদর্পণের সাদৃশ্য নগণ্য।' ৭] এই সূত্রেই আধুনিক কবিতার দুরূহ অনুষঙ্গ-জনিত দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গও তিনি ছুঁয়ে গেছেন। তাঁর সে মন্তব্যও স্মরণ-যোগ্য—'কবি বরঞ্চ প্রত্নাস্থিবিদের সঙ্গে তুলনীয়, যিনি এক টুকরো শিলীভূত কপালে কল্পবিশেষের সমগ্র জীবনেতিহাস দেখেন ; এবং একথা স্মরণে রাখলে আধুনিক কাব্যের আপাতবিলগ্ন প্রকাশপদ্ধতি আর প্রলাপের মতো শোনায় না, বোঝা যায় যে স্বয়ংসিদ্ধ বিকল্পনা

সুদ্ধ পাকে প্রকারে সাধারণ্যেরই অংশভাক।' মনে পড়ে বুদ্ধদেব তাঁকে বলেছিলেন বুদ্ধিজীবী সন্ন্যাসী, পৃথিবীর মায়ায় বিমুখ, পরমের সন্ধানী। বিষ্ণু দের সম্বন্ধে সেই 'সন্ন্যাসী' সুধীন্দ্রনাথ অতঃপর খুবই সত্যিকথা বলেছেন—'চিত্তবৃত্তি নিরোধেই যেমন আত্মসমাহিতি আসে, তেমনি সাময়িক নির্ভর ঘুচিয়ে স্বগত আবেগে পৌঁছতে পারলেই কবিতা সার্থক হয়। আমার বিশ্বাস, বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহে এই আর্য সত্যের অমর্যাদা ঘটেনি।'

সাধারণভাবে, তিরিশের দশকের বাংলা কবিতার মনস্তত্ত্বসাপেক্ষতা, শব্দ-দুরূহতা, চিত্রকল্প, দূরান্বয় ও ক্লিষ্টান্বয়, কবিদের আত্মমনোযোগ ইত্যাদি বিশেষত্বের দিকে সুধীন্দ্রনাথের এই মূল্যবান 'মুখবন্ধে'র দলিলটি ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুর খুবই কাজে লাগে। বিষ্ণু দের কোনো-কোনো দুর্বলতার কথাও তিনি বলেছেন, যেমন—'কাব্যকে তিনিও কালে-ভদ্রে আত্মবিজ্ঞাপনের কাজে লাগান, সুলভ করতালির লোভ তাঁর ধ্যান-ধারণাতেও কচিৎ-কদাচিৎ বিঘ্ন আনে, অধীত বিদ্যা, অর্জিত অভিজ্ঞতা ও অভীষ্ট সংকল্পের সংমিশ্রণ শ্রমসাপেক্ষ জেনে তিনিও মাঝে-মাঝে চকিত চাতুরীর শরণ নেন';—বিষ্ণু দের ব্যঙ্গময় নাগরিক শিষ্টতার ইশারা দিয়ে তিনি ঠিকই বলেছেন—'তাঁর কাব্যে প্রেমের মতো একনিষ্ঠ হৃদয়াবেগ সুদ্ধ সমাজ ও সভ্যতার রঙ্গভূমি'; তবু, বিষ্ণু দের 'ওফেলিয়া' এবং ঐরকম আরো কয়েকটি দুর্বোধ্য কবিতা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যই আমার কাছে বেশি গ্রাহ্য মনে হয়! বুদ্ধদেব সঙ্গত ভাবেই তাঁর কবিতার ধ্বনিগত ঐশ্বর্যের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু একথা ঠিকই বলেছেন যে, 'বিদ্বজ্জনের মুখে 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'র নানারকম দুরূহ ব্যাখ্যা শুনে আরো বেশি বিচলিত বোধ করি—ও-দুটি কবিতায় কেন যে এক স্তবকের পর আর এক স্তবক আসছে, সেটাই আমার কাছে রহস্য। তবু, ও-দুটি কবিতাই

আমি পড়তে ভালোবাসি ; মাঝে-মাঝে চমক লাগানো রূপকের দেখা পাই ; মনের মধ্যে বিচিত্র ছবি ফোটে, আর ছন্দের কৌশল ধ্বনিমর্মরের মোহ ছড়ায়।' ১৯৩৮ সালে বুদ্ধদেব এসব লিখেছিলেন। এবং সেই প্রবন্ধেই তিনি আরো একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছিলেন—'আর একটা জিজ্ঞাস্য। 'ক্রতুকৃতম', 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির' 'সোৎপ্রাসপাশ' (এমন আরো আছে) এই সব শব্দ ব্যবহার করে সত্যি লাভটা কোথায়' ?

বুদ্ধদেবের সে প্রবন্ধটি ছিল পত্রাশ্রয়ী ; চিঠির শেষদিকে তিনি লিখেছিলেন 'পরিশেষে আপনার বন্ধু সুধীন্দ্রবাবুর মারফৎ জানলুম যে আপনার মতো 'এলিয়ট ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না। তবে কিসের তাড়নায় লেখেন ?' সুধীন্দ্রনাথ অবিশ্যি সে প্রশ্নের জবাব তাঁর সেই মুখবন্ধেই দিয়েছিলেন। তারপর এলিয়টের ষষ্টিতম জন্মদিনে প্রকাশিত 'T. S. Eliot' নামে একখানি বইয়ের মধ্যে ১৯৪৮ সালে বিষ্ণু দে লিখেছিলেন 'Mr. Eliot Among the Arjunas'। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে এলিয়টের বিখ্যাত 'ক্রাইটেরিয়ন' পত্রিকার আদর্শেই সুধীন্দ্রনাথের ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' বেরিয়েছিল—এবং 'Tagore brought us by his almost elemental genius, out of the walls of··· sometimes dull and sometimes deadening conventionality. Eliot taught us how to recognize their necessity and utilize the resulting freedom.' (ঐ বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৩৬০-এর আষাঢ়ে 'এলিঅটের কবিতা' নামে গ্রন্থাকারে বিষ্ণু দের সতেরোটি অনুবাদ বেরিয়েছে। বাঙালী লেখক-পাঠক-সমালোচকদের মহলে সাম্প্রতিক অর্ধশতকের য়ুরোপীয় সংস্কৃতির চেহারাটা যে প্রায় অচেনা রয়ে গেছে, সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে ভূমিকাতে তিনি

লিখেছিলেন—'আশ্চর্যের কথা, আমাদের যে গুরুজন ফরাসী সংস্কৃতির বাংলা স্তম্ভপ্রায়, সেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশ্বেও এই উনিশ-শতকের শেষ অর্ধেকের এবং এ শতকের ফ্রান্স প্রায় নেই। বদ্‌লেয়র ও তাঁর অনুবর্তী ফরাসী কাব্যসাধনা, গতিয়ে, র‍্যাঁবো, মালার্মে, লাফর্গ, ভালেরি অবধি কাব্যাদর্শের যে বিপ্লবপ্রয়াস—তার প্রভাব এদিকে এমেরিকার পাউণ্ড এলিঅট থেকে ওদিকে প্রথম বিপ্লবী কবি মায়াকফস্কি ও পাস্টেরনাক পর্যন্ত প্রসারিত। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মহাজনরা এঁদের বার্তা আনেন নি, রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের ডে প্রফুণ্ডিসের বাণী এনেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী অস্কার ওয়াইল্ডের ফ্রান্সের।' আগে যে ইংরেজি প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে, তাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, এলিয়ট প্রভৃতি কবির মধ্যে কবিতার কলাবিধি পরিণতির প্রায় শেষ সীমান্তে এসে পৌঁছেচে। এই সূত্রে আরো মনে পড়ে, ১৩৩৯-এর বৈশাখের 'পরিচয়' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—'উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হোলো আধুনিকতা। কিন্তু আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্য-ভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে, একালের নব্য আধুনিকতা 'মোহ' জিনিসটার বিরোধী। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে রূপ-মোহটাই ছিল সেকালের কবিদের দর্শনীয়। কিন্তু একালে,—কবিরা কেবলই উপকরণ-সচেতন, কেবলই মায়া-বিরোধী! এই 'বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য-ব্যবস্থায়···সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে।' অর্থাৎ তাঁরই গানের ভাষা ধার করে বলা যেতে পারে যে, আগে ছিল 'তোমায় সাজাব যতনে ভূষণে রতনে'-র মর্জি ; আর, এখন দেখা যাচ্ছে

'যেমন আছ তেমনি এসো আর কোরো না সাজ-'এর ত্বরা (বলা বাহুল্য, এই ত্বরা-র ভাবটাও কলাবর্জিত নয়)! তিনি বলেছিলেন 'আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব।' একালের দোষের দিকটাতে তিনি অতুলনীয় খোঁচা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু একালের আসল কথাটাও অতুলনীয়ভাবে তিনিই ব্যক্ত করেছিলেন— 'এখনকার কাব্যের যা বিষয়, তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তাহলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়? তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার।' লাল চটিজুতোর বিষয়ে এমি লোয়েলের একটি কবিতার উদাহরণ দিয়ে তিনি আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় লক্ষণের কথা বলেছিলেন—সে হলো নৈর্ব্যক্তিকতা। 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলঙ্কারের উপরে নয়। কেননা অলঙ্কারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।' রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছিলেন, 'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো—বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহোলে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা।' এবং এক নিঃশ্বাসে তিনি তার পরেই বলেছিলেন —'কিন্তু একে আধুনিকতা বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারি।' নৈর্ব্যক্তিকতার নামে আধুনিকরা উদ্ধত অবিশ্বাস দেখাচ্ছিলেন মাত্র, —তর্কের খাতিরে, এই ছিলো তাঁর 'কল্পিত' অভিযোগ। 'বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার।' অভিযোগটা 'কল্পিত' বলেছি এই কারণে,

যে, সে-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন—'অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ী তাল ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করিনে।' উগ্রতা শিল্পীর শত্রু। অসামঞ্জস্যের রসিক যিনি, তিনি যতো কীর্তিমানই হোন্,—কবিপল্লীতে তাঁর বাসযোগ্য বাসস্থান নেই। অতএব অনুভূতিহীন নকলের স্বভাব থাকলে কবিখ্যাতির উচ্চাশা বর্জনীয়। 'ভারতী'পর্বে যাঁরা ছিলেন নকলদক্ষ, তাঁরা স্বপ্ন-রসিকতা, সৌন্দর্যস্পৃহা, খাঁটি বাঙালীয়ানা ইত্যাদি নামের আড়ালে নকলের বৈচিত্র্য দেখিয়ে গেছেন; যাঁরা এ-কালের নকলবিলাসী, তাঁরাও তথাকথিত বস্তুচেতনা, মনোবিজ্ঞানবৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি ধূম্রা-বরণের সাহায্যে নিজেদের নশ্বরতা ঢেকে রাখছেন; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সেকেলে কাব্যের বাবুগিরি ছিল সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা পচা মাংসের বিলাসে।' অতএব সাম্প্রতিকতর পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের আরো ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিষ্ণু দের সঙ্গে আমিও একমত; নৈর্ব্যক্তিকতা-র আদর্শ সম্বন্ধেও কোনো বিরোধ নেই; পাঠকের ধৈর্য চাই, কবির সততা চাই—এ দুটিও দিন-রাত্রের অবিচ্ছেদের মতন অনস্বীকার্য,—এবং এই প্রস্তুতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণীই আজকের দিনে বার-বার স্মরণীয়—তিনি বলেছিলেন, 'সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায়নি।' প্রশ্নমনস্কতা, ইহবাদ, নিসর্গানুরাগ, বস্তুস্বীকৃতি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য অথবা অতীত-বর্তমানের সকল সাধনার দিকে সজাগ আগ্রহ,—এ সবই দরকার,—কিন্তু ততোধিক সমাদরণীয় যে লক্ষ্যটি, তার কথা আছে বিষ্ণু দে-অনূদিত মারিআন মূর-এর এই মন্তব্যে—

…যখন আধা কবিদের টানা হেঁচড়ায় এসব জিনিস মুখ্য হয়ে ওঠে
তখন ফলটা হয়না কবিতা,

এবং—

ইতিমধ্যে, যদি তুমি একদিকে দাবি করো
কবিতার কাঁচা মালমশলা তার
আঁকাড়া উগ্রতায় আর
অন্যদিকে যদি চাও যা অকৃত্রিম
তবেই তো তুমি কবিতায় অনুরাগী।

বিষ্ণু দের 'হে বিদেশী ফুল' (১৩৬৩) থেকে লাইনগুলি নেওয়া হলো। মারিআন মূর যথা কথাই বলেছেন। ইতিমধ্যে পরীক্ষা চলুক। অনেকদিন আগে সত্যেন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন পল ভার্লেন-এর কথা—

কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা প্রবেশ যদি করে,
বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি মোচড় লাগায়ো ভাল মতে
অনুশীলনের লাগি সাধু শ্লোক এনো ভাষান্তরে,—
সে কাজ বরঞ্চ ভালো কবিতারে মাঠে মারা হতে।

অনুবাদের কাজে বিষ্ণু দে সত্যেন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক, অনেক বেশি সার্থক। তাঁর যে ইংরেজি প্রবন্ধটির কথা বলা হয়েছে, তাতে অনুবাদকর্মে দীর্ঘ নিদিধ্যাসের কথা তিনি নিজেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলার অতীত ঐতিহ্যের বিরোধের দিকটা তিনি একটু বাঁকা ভাবে দেখেছেন। তাঁর ঐ প্রবন্ধের মধ্যে, এবং তাছাড়া 'কেন লিখি' নামে একখানি বাংলা প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে তাঁর সে মন্তব্য অনেকেরই চোখে পড়েছে। ঐতিহ্যবাদ, আত্মবিচার, দার্শনিকতা এবং শব্দ-চিত্র-অনুবাদ-উল্লেখাদি ব্যাপারে বাংলার একালের কবিদের মধ্যে এলিয়টের দিকে বিশেষ মনোযোগী যাঁরা, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে একজন, দ্বিতীয় সুধীন্দ্রনাথ,

—অবিশ্যি সুধীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ ; বিষ্ণু দে নিজেই বলেছেন যে বিশের দশকের শেষদিকে, এলিয়ট সম্বন্ধে 'কলকাতার প্রথ আলোচনা বোধ হয় সেই ছাত্রসভার বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তে প্রবন্ধে, যা পরে ছাপা হল 'কাব্যের মুক্তি' নামে।...তখনো আমাদে পরোক্ষ ভাবনা স্বভুক্, ভালেরির সাপের মতো, আমাদের আত্মস্থত তখনো প্রায় হিন্‌ডেন্‌বর্গ জার্মেনিতে রিল্‌কের সুদূর-পিয়াসী টিউটনিব আত্মম্ভরী নৈঃসঙ্গ্য কিম্বা ইয়েট্‌সের মতো তন্ত্রমন্ত্রের রাজ রাজড়া কুহকজালের যন্ত্রণাসম্ভোগ।'

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (জন্ম ১৯০১) 'নির্বিরোধ-ন্যায়'-বাদ

আভিধানিক শব্দের দিকে একটু বেশি ঝোঁক, কবিকর্মের মহিমা আর দায়িত্ব সম্বন্ধে একটু বেশি মনোযোগ, পাঁচজনের ভিড় থেকে গা বাঁচিয়েও মানবজীবনের চিরসত্য সম্বন্ধে আগ্রহ পোষণ করা—বাংলা ভাষায় 'মাইকেল' শব্দটা কালে-কালে এইসব লক্ষণের দ্যোতক হয়ে উঠেছে বোধ হয়। সুধীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সেকালের 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গবচনে 'হাতিবাগানের মাইকেল' অভিধার প্রয়োগ তাই পূর্ণ মি... নয়, অর্ধ-সত্য মাত্র! কারণ, মাইকেলের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব ; তিরিশের দশকে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর হাতিবাগানের পৈতৃক বাড়িতেই বাস করতেন বটে, কিন্তু তাঁর শব্দসন্ধান মাইকেলের ধারাতে নয়, তাঁর বস্তুচিন্তাও অন্য প্রকৃতির,—এবং তাঁর ঐতিহ্যবিশ্বাস মধুসূদনের মতো নাটকীয়ভাবে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর নয়,—রবীন্দ্রনাথের মতোই দীর্ঘ উপলব্ধির ফল! 'স্বগত' বইখানির 'সূচনা'-তে সাহিত্য-সৃষ্টির আবশ্যিক শর্ত সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'সেখানেও ইতিহাস অব্যবহার্য, কবি খোঁজে বিশ্বাস্য সম্ভবপরতাকে। কিন্তু এই অঘটন-সংঘটন ভাববিলাসের কর্ম নয় ; এতে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই ;

নির্বিরোধ-ন্যায়ের নিত্য আদর্শই মহৎ কাব্যের প্রধান উপজীব্য।... হয়তো সেই জন্যেই টি-এস্ এলিয়ট্-এর মতে কাব্যের অক্ষয় উৎস ফিলজফি।' অতঃপর আরো কয়েক লাইন পরে তিনি লিখেছিলেন—'মনুষ্য সংসারের অধিকাংশ ব্যাপার যখন দেহাচারের কল্যাণেই চলে, তখন কেবল কলাকৌশলের মধ্যে পরমাত্মার লীলাকৈবল্য খুঁজতে আমি প্রস্তুত নই'। এবং—'দেহাত্মবাদ শুধু তত্ত্বসংক্ষেপের প্রয়োজনেই গ্রাহ্য নয়, মানুষের সমাজজীবন যে-সর্বসম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাও দেহেরই দান।' আরো কিছুদূর এগিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন—'ব্যক্তিস্বরূপ বাদ দিলে যখন সাহিত্য আর সংবাদপত্রের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না, তখন মন, প্রাণ বা আত্মিক সম্পদের জন্যে গৌরববোধ কবির কর্তব্য নয়, তার আরাধ্য মাত্রাজ্ঞান আর তন্ময়তা।' 'অতএব কাব্যরচনা ও কাব্যবিবেচনা একই অখণ্ডতার এ-পিঠ আর ও-পিঠ;...পরিণত কাব্য যে আশৈশব বিতর্ক-বিচারের মুখাপেক্ষী, তাতে আমার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নেই।' তাঁর নিজের বিশ্বাস খুবই সহজভাবে ব্যক্ত হয়েছিল ঐ লেখাটির শেষ দিকে, যেখানে তিনি বলেছিলেন—'কাব্যে তথা বৈদগ্ধ্যে উভয়ত্রই কীট্স্-প্রশংসিত নিরাশক্তি বা 'নেগেটিভ্ কেপেবিলিটি' ক্রিয়াশীল; এবং এই ঐক্য সত্ত্বেও, উক্ত শক্তি যেকালে নিষেধাত্মক, তখন হৃদয়বান কবি স্বকীয় ভাববিলাস হারিয়ে স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠায় পৌছন, আর বুদ্ধিমান সমালোচক নিজের বিদ্যাভিমান ভুলে সংক্রামক চিত্তপ্রসাদে তলান।' কুমুদরঞ্জনের সমালোচক-বর্জননীতির (২৯৯-৩০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সঙ্গে তিরিশের দশকের এই সমালোচক-বরণের বিপরীত অবস্থা মননধর্মী নতুন ভঙ্গিরই সূচক (ভালেরি কিন্তু কবিতার ব্যাখ্যানের বিরোধী!)। কবিতার মধ্যে কবির লেখা-পড়া, জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতা, পূর্বগামী সমব্রতীদের কীর্তি এবং স্বকালের ব্যক্তিগত ও সামাজিক যাবতীয় দাবির স্বীকৃতি

ঘটলো আগের চেয়ে আরো বেশি পরিমাণে। কবিতাতে এবং জীবনেও সামঞ্জস্যের ভাবনা বা দাবি দেখা দিয়েছে। তাই ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘটমানের বিরোধে,—অসঙ্গতি, অধীনতা এবং সংকীর্ণতার জ্বালায় জর্জর কবিমনের আবেশ-পিপাসা ধ্বনিত হয়েছে প্রেমেন্দ্রের ভৌগোলিক দূরচারিতায়,—আর, তার মননলব্ধ দার্শনিকতা এবং মনন-মিশ্রিত অবসাদের রূপ ফুটেছে 'নির্বিরোধ-ন্যায়'-বাদী সুধীন্দ্রনাথের 'জাতিস্মর' প্রভৃতি কবিতায়। কিন্তু 'জাতিস্মর' অনেক পরের ঘটনা,—সে কবিতাটি 'ক্রন্দসী'তে ছাপা হয়েছিল। 'ক্রন্দসী'-র আগে 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫),—তারও আগে বেরিয়েছিল তাঁর প্রথম বই 'তন্বী'। 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থনামের মধ্যেই সামঞ্জস্য ও সমন্বয়-অভিপ্রায়ী সুধীন্দ্রনাথের মনোধর্ম ধরা পড়েছিল। বুদ্ধদেব সেই ১৯৩৫-এ লিখে-ছিলেন—'অর্কেস্ট্রা' নাম-কবিতাটির সম্ভবত মস্ত উচ্চাশা ছিলো, সেটা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে কি না জানি না। একদিকে চলেছে সংগীতের বর্ণনা ; অন্য দিকে সেই সংগীত যে-সব স্মৃতির ঢেউ তুলেছে কবির মনে তারই প্রকাশ চলেছে লিরিকের পর লিরিকে। সেই লিরিকগুলো মিলে যেন কথা-ছাড়া সংগীতকে মূর্তি দিতে চাইছে ভাষায়।' 'অর্কেস্ট্রাতে'ই আঠারো মাত্রার পয়ারে তাঁর দক্ষতা দেখে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, 'পয়ারে যতি-পাতের কতকগুলো নির্দিষ্ট স্থান আছে, তার ব্যতিক্রম হলেই কানে খটকা লাগবার কথা, অথচ যেখানে তা লাগেনা, যেখানে নিয়ম ভঙ্গের ফলে নতুন সুখকর ধ্বনির সৃষ্টি হয়, সেখানেই আমরা স্বীকার করি কবির অসামান্য দক্ষতা। মধুসূদনের 'অকালে'-র পর যতিপাত যে-বিস্ময়ের আন্দোলন তুলেছিলো আজও তা সম্পূর্ণ থেমে যায়নি। সুধীন্দ্রনাথ পয়ারকে ভেঙে-চুরে মুচড়িয়ে যেমন খুশি চালিয়েছেন, চালিয়ে নিতে পেরেছেন একমাত্র 'আঁজাবমা'র জোরে—মধুসূদনেরও সেই জোরই ছিলো—আমার কানে তো কোথাও

খটকা লাগে না।' মাইকেলের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের এই ছন্দ-দক্ষতার সাদৃশ্য কিন্তু বেশি নয়। তাছাড়া দক্ষতা ব্যাপারটাই যথেষ্ট। তাতে তুলনার কথা না তোলাই ভালো। কবিতার ধ্বনিগত আবেদনের দিকে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় —তিনজনেরই বেশ আগ্রহ আছে। তবে, মাইকেল যে-অর্থে অধ্যবসায়ী আবিষ্কর্তা, সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে কিন্তু সে-অর্থে ছান্দসিক নন। মাইকেল সংগ্রহের রাজা, আহরণের নেতা,—তবু তাঁর জীবনের সঙ্গে অমিত্রাক্ষরের স্বাভাবিক যোগও মানতে হয়; সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-রসিকতা কিন্তু আরো কৃত্রিম,—সে যেন অধ্যবসায়ী বীরের বৈভব; এঁরা কিন্তু অন্যজাতীয়! কবিতার সংগীতধর্মে এঁদের অনুরাগ আরো যেন অনুভূতিমূলক,—সেটা মাইকেলের রাজসিকতা থেকে দূরের পথ! সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' এবং বিষ্ণু দে'র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩) এই গ্রন্থনাম দুটির মধ্যেই গভীর অর্থে ধ্বনি-রসিকের নিবেদন বেজেছে। সুধীন্দ্রনাথের 'মহাশ্বেতা'-র মধ্যে তিনি যেখানে নিম-বনে না বলে 'নিম্বের বিপিনে' বলেছেন, সেখানে তাঁকে মাইকেলের শব্দগাম্ভীর্যের বি॰ স্বত অনুসাধক মাত্র মনে হয় না,—বেশ বোঝা যায় যে, সংস্কৃতের দিকে তাঁর ঝোঁকটা তাঁর গভীর-অর্থে সংগীতচেতন কবি-মনেরই বিশেষত্ব। এই রকম ভাবনার সূত্রে বিষ্ণু দের 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০) বইখানির মধ্যে 'শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব' কবিতাটি আমার বড়োই চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। নানা জ্ঞানের উল্লেখ-জনিত দুর্বোধ্যতা থেকে সরে এসেও বিষ্ণু দে-র সত্যি স্বতন্ত্র মন তাতে অন্যরকম দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করেছে,—সেখানে তিনি দুরূহ শব্দ-ঘেঁষা সুধীন্দ্রনাথের পার্শ্বচর, অস্পষ্ট অন্তরালোড়নময় জীবনানন্দের সগোত্র,—এবং শব্দ-ছন্দ-রূপকাদি বাহনে আশ্রিত কবিতার গভীর মুহূর্তের ব্যাখ্যাতা! এলিয়ট যেমন গোল্ড স্মিথের লাইন নতুন

করে মেজে নিয়ে তাতে নতুন কালের ভাব ধরিয়ে দিয়েছেন, বিষ্ণু দে তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনেক শব্দবন্ধ, বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। তাঁর আগে ব্যঙ্গদৃষ্টিময় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও কতকটা তাই করেছিলেন—আর, সমকালে করেছেন সমর সেন। বিষ্ণু দে-র ঐ কবিতাটিতে তাঁর এইরকম অনেক বিশেষত্বের লক্ষণ ফুটেছে বটে,—কিন্তু ততোধিক যা পাওয়া যায়, সেটাই এখানকার আসল কথা। তিনি বলেছিলেন মানুষের সার্থকতা 'ক্লৈব্যে নয়—রচনায় সংগঠনে শিল্পে কর্মে সচেষ্ট সংযোগে।' কাব্যেও যেমন, জীবনেও তেমনি—

> শব্দের অর্থের ছন্দের স্বরের দ্বন্দ্বে রূপান্তর চাই
> শব্দে শব্দে আপতিক ভেদাভেদ অতিক্রমি
> কবিতায় কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের অনন্য ও অন্যোন্যের
> যোগাযোগ অর্থের বিন্যাস।

কবিতা হিসেবে এ লেখা আমার মনে যে তেমন নাড়া দেয়, তা নয়। তবু কবির আত্মানুসন্ধানের এই অস্পষ্ট মর্মোচ্ছ্বাস শুনে ধন্য বোধ করি। আর, বিশ্বাস করি যে বাংলা দেশের বহু-বৈচিত্র্যময় কবিতার পথে দার্শনিকতা একালে যতো বেশি ক্ষেত্রে আন্তরিক, এ আগে কখনোই সে রকম ছিলো না। প্রেমেন্দ্র যখন 'পথ', 'পাঁওদল', 'শস্যপ্রশস্তি' লিখেছিলেন, তখন বাংলাদেশের নবীন কবিমানসের বন্দনা পেয়েছেন মার্কিন হুইট্‌ম্যান। দ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের হুইটম্যান-বন্দনা আরো পরের ঘটনা। তারপর য়েট্‌স্‌, এলিয়ট্‌, মালার্মের ধারায় যথাক্রমে রূপকচর্চা, দার্শনিকতা এবং প্রতীকের প্রভাব শুরু হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ তো বটেই, বিষ্ণু দেও মাঝে-মাঝে এইরকম দর্শন-ঘেঁষা; শব্দ-ছন্দ-রূপকাদির বিষয়ে তাঁর ভাবনার মধ্যে হঠাৎ দেখা যায় কবি আর দার্শনিকের যুগল মিলন। অমিয় চক্রবর্তীও সেদিক থেকে এঁদেরই সহচর।

নজরুল থেকে সুধীন্দ্রনাথে দূরত্ব কম নয়। সময়ের একই আঙিনায় দাঁড়িয়ে দুজনকে বড়ো কাছাকাছি বা পাশাপাশি মনে হয় বটে, কিন্তু অন্তরের মানচিত্রে দেখতে পাই আজ এই পঞ্চাশের দশকে নজরুলের পৃথিবী আমরা দূরে ছেড়ে এসেছি। নজরুল বলেছিলেন 'শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!' সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'ক্রন্দসী'-তেও সেই শেয়ালের রূপকটাই ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু প্রবল দুঃখবাদী নজরুলের সুরে নয়,—শান্ত, অবসন্ন, বিদ্বান কবির সংগীতানুভূতি দিয়েই তিনি বলেছেন। 'ক্রন্দসী'-র 'নরক'-এর মধ্যে তাঁর সেই সার কথাটি বুদ্ধদেব ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন—

জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া
নির্বিকারে নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী ;

বুদ্ধদেবের নিঃসঙ্গতাও একই রকম! উত্তরকালের চোখে,—আজি হতে শতবর্ষ পরে,—একালের কবিদের এই composite সমচারিতাই হয়তো সবচেয়ে বেশি চোখে পড়বে। প্রধানত কলাকৌশলের অল্পবিস্তর ভেদ জাগিয়ে রাখা ছাড়া কবিদের এখন বোধ হয় আর অন্য কৃত্য নেই! কথাটা সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' বইয়ের (১৯৫৩) ভূমিকাতে কিঞ্চিৎ বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, তিনি নিজে রীতিগত সাধনাতেই বেশি নিযুক্ত—'আমার কাব্যজিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য'; 'সংবর্ত'-বইখানির ভূমিকাতে তিনি যা বলেছেন, তাঁর বিনয়ের হিসেব ধরেও তাতে সত্য-স্বীকৃতিই বেশি বলতে হবে—'এ বই-য়ে অসামান্য অনুভূতির অভাব শোচনীয়। এমন কি কোনও বিশিষ্ট রীতির ক্রমবিকাশ পর্যন্ত এ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই ; এবং বিশ

বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু, এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে।' আরো কয়েকটি কথার পরে সেই 'স্বগত'-পর্বের কথাই তিনি পুনরায় জানিয়েছেন—'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট ; আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ ;'…। তাঁর অনুবাদ কবিতা-সংগ্রহ 'প্রতিধ্বনি'র (১৩৬১) 'ভাষ্য'তেও মালার্মের 'প্রতীকী কাব্যের উল্লেখসূত্রে তিনি মালার্মের কাব্যকথা-প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, মালার্মের 'জটিল চিত্রকল্প অবিচ্ছেদ্য, তাঁর ভাষা ব্যঞ্জনামূলক শব্দের ধাতুগত প্রয়োগে দুরূহ, তাঁর অভিপ্রায়, ব্যাকরণ মানলেও, অন্বয়ের শাসনমুক্ত।' হ্যাজলিট বলেছিলেন—'Man is a poetical animal'। তাঁর সে ধারণা মিথ্যে নয়, কিন্তু এ-বইয়ের ৪৫ পৃষ্ঠাতে যে-কথা বলা হয়েছে, এই সূত্রে পুনরায় সেই কথাই মনে পড়ে,—এযুগে নানা কারণে, কবিতার সমাদর সত্যিই বিরল ঘটনা! সাহিত্য-সাধনায় মালার্মে খুবই প্রযত্ননিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। উনিশের শতকে, মনোবিকলন প্রবর্তিত হবার আগেই শব্দ, সুর, এবং সর্ব উপকরণ-সমাবেশের গূঢ় রহস্যটি নিজের কবিতার মধ্য দিয়ে মালার্মে হয়তো ফরাসী দেশের উপযোগী করেই ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁর কথা বলতে গিয়ে একজন জানিয়েছেন—'When he wrote, it was methodically; he constructed a skeleton, significant words deliberately scattered over his maiden sheet, prearranged schemes of rhyme…and within these limits the poem had only to build itself'। আমাদের সুধীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ তো বটেই, কবিতার শিল্পচর্চাতে আরো কেউ-কেউ এই অর্থে অতি-যত্নবান। মালার্মে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে—'Does he encourage obliquity?' এবং তার জবাবে বলা

হয়েছে—'Yet, at the same moment, he advises simplification'।

মালার্মের শিষ্য পল ভালেরি সেই রকম। 'Mallarme... declared that the conception of "pure poetry" must entail the virtual abdication of the poet; that the poet must henceforward submit his individual initiative to the initiative of his words'...।[১] সুধীন্দ্রনাথও সেই অর্থে শব্দবাদী; কথাটা চিরকালের কাব্যসত্য বা কাব্যরহস্যের বিরোধী নয়। আমি এর আগেও বলেছি, পুনরায় এই সূত্রে বলতে চাই—কবিতা একরকম সরল বক্রোক্তি! এবং বিশেষ শব্দসমাবেশই কাব্য!

অমিয় চক্রবর্তীর (জন্ম ১৯০১) দেশ, কাল, মন

১৯৪৪ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখের একটু ব্যক্তিগত আলাপ লেখা আছে আমার খাতাতে। অমিয়বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছিল তাঁর এল্‌গিন রোডের স্যুইট্‌-এ। তিনি বলেছিলেন 'দেখুন, শিল্পীর জীবনে অন্তত কিছু নির্লিপ্তি চাই। রবীন্দ্রনাথের তো বটেই, গান্ধীজীর জীবনেও তাই দেখি। প্রত্যাদেশ ব্যাপারটাই তো আত্মদর্শন!' একটু থেমে তিনি আবার বলেছিলেন, 'সামাজিকতা ভালো, কিন্তু দলের মাত্রা মেনে চলা উচিত। সজ্ঞানে সতর্ক হয়ে চলাটাই সত্যিকার গতি। সৃষ্টির কাজে সমাজের কোনো প্রভাব নেই, একথা বলিনা, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিচৈতন্যও তো আছে! তাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। মন আপনার কাজ করে যায়। কাব্যরচনার শক্তি এমনি অন্তঃশীলা।' সেই বছরের ২৪এ সেপ্টেম্বর তিনি আবার বলেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের 'ফ্যামিলি রিইউনিয়ন'-এর কথা

১। Baudelaire and the Symbolists (1929)—Peter Quennell p. 207

প্রায়ই বলতেন। সে বইখানির মধ্যে সাধারণ কথার সংযম ভারি সুন্দর।' এলিয়ট-এর কথা থেকেই বিভিন্ন কালের পারস্পারিক অন্তঃপ্রবেশ সম্বন্ধে এলিয়টের ধারণার কথা উঠেছিল। একটি ছবি মনে পড়েছিল। পথের ধারে বিশাল গাছের শাখা প্রায় মাটি ছুঁয়েছে, সেখানে বিকেলের আলো যেন পুরু পর্দা দিয়ে ঢাকা। হঠাৎ একটা মোটর গাড়ি চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। এদিকে প্রতি নিমেষেই অপরাহ্নের চেহারা বদ্‌লে যাচ্ছে; ওদিকে মোটরগাড়ি এক ভিন্নজাগতিক গতি; পাশেই পথের কিনারায় একটি টিউলিপ্ — পৃথিবী এবং সূর্যের চলা, মোটর গাড়ির চলা এবং টিউলিপের চ — তিনটি ছন্দ মিল্‌লো একজন দর্শকের চৈতন্যে! অমিয়বাবু বল , 'রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন। মাধবী এসেই বলে 'যাই'। র সময় তো আমার সময় নয়।' এলিয়ট আর রবীন্দ্রনাথ, দুজন মিলিয়ে দেখলেন তিনি।

'খসড়ার' (১৯৩৮) পরে 'একমুঠো' (১৯৪০), তারপর 'অভি বসন্ত' (১৯৪৩), এবং সেই মন্বন্তরের বছরে অন্নার্থীর সাহায্য প্রকাশিত 'অন্নদাতা', 'অন্ন দাও', 'নিমন্ত্রণ', 'দূরের ভাই' এবং '১৩৫০' —এই ক'টি ছোটো-ছোটো কবিতা বেরিয়েছিল। তাঁর চল্‌তি ছবির নৈপুণ্য, গদ্য-পদ্যের মসৃণ সমাবেশ, হঠাৎ মিলের মাধুর্য,—তাঁর সমন্বয়ে বিশ্বাস এবং শান্ত অন্তর্মুখিতা বা আত্মসচেতন ভাব,—সব থেকে বেশি তাঁর আন্তর্জাগতিক মনের বিশেষত্ব বাংলা কবিতার অনুরাগীদের মধ্যে সাড়া তুলেছিল তখন। তারপর তিনি হলেন মার্কিন-প্রবাসী। ১৯৫৫ সালের ২৯এ জুলাই আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলো—বিদেশ থেকে অল্প সময়ের জন্যে দেশে ফিরেছিলেন তিনি। 'পারাপার' এবং 'পালাবদল' বেরিয়ে গেছে তখন। অ্যামেরিকা থেকে এসে 'পালাবদল' উৎসর্গ করে গেলেন 'চিরন্তন বাংলা দেশকে'। এসব কবিতায়

নিউ-ইয়র্ক হাসপাতাল, ঈষ্ট্ নদী, ক্যান্‌সস,—এবং তারই সঙ্গে মণিকর্ণিকার ঘাট, অথর্ব বেদ, ইমন-কল্যাণ মিলেমিশে 'খসড়া'-র 'কালো জলে', 'কালান্তর' প্রভৃতির দেশ-কাল-বিস্তারের উপলব্ধিই এখনো অনুরণিত! ঘড়ি, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে,—অর্থাৎ সময় এবং গতি বোঝাবার জিনিসগুলিতে তাঁর আগ্রহ দেখা গেছে। 'সংগতি' কবিতাটিতেই তাঁর মনের প্রধান কথা ব্যক্ত হয়েছে—'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন'! তাঁকে আন্তর্জাতিক বাঙালী বলেই চিনি। বোধ হয় আজও বাইরে বাইরে ঘুরছেন বলেই দেশের নবীন-প্রবীণ কবিমাত্রেরই ইদানীন্তন অবসাদ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর মন চিত্রময়। শব্দে শব্দে আশ্চর্য সমাবেশ ঘটিয়ে কবিতায় দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শসুখ পর্যন্ত বাজিয়ে তুলতে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'আগুনি-বেগুনি বেলা হঠাৎ দারুণ জ্বলে উঠে ডোবে বহুগণ, গাঢ় ঢেউয়ে।' —এই হ্রদের ছবি তাঁরই আঁকা—তিনিই চিত্রকল্পময় আধুনিকতম বাঙালী কবি।

যুগ শেষ হলেও কবিতার স্রোত শেষ হয়না। গ্রাম ছেড়ে এসেও গ্রামের কথা মনে পড়ে। কালের এ-ঘাটে দাঁড়িয়েও ফেলে-আসা অতীতের জন্যে মন কেমন করে। তবু উত্তরণের পথ ধরে পথিককে এগিয়ে যেতে হয়। নজর রাখতে হয় নতুন প্রবণতার দিকে,—নতুন রীতি আর নতুন মর্জির ঢেউ দেখে-দেখে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তাই দু'এক জায়গায় আরো একটু দাঁড়াবার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ ছিল না। একালের কবিদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার এবং অজিত দত্ত সেইরকম। অচিন্ত্যকুমারের আশ্চর্য যৌবনাবেগ, অন্নদাশঙ্করের ছড়া, এবং অজিত দত্তের শব্দকৌশলের কথা বলা হয়েছে। তাঁর সনেটের মাধুর্য, বাংলা কবিতার অন্ত্যানুপ্রাস সম্বন্ধে

তাঁর ভাবনা, এবং সবচেয়ে বেশি তাঁর মালতী-সম্পর্কিত কবিতার ('কুসুমের মাস') আশ্চর্য আবেগ আমাকে আজও মুগ্ধ করে। মোহিতলাল এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে সেই আবেগভঙ্গিই পৃথকভাবে দেখা গেছে। তাই, পুনরুক্তির আশঙ্কায় তাঁর সম্বন্ধে আর কথা বাড়াইনি।

অলমতিবিস্তরেণ